এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

কাল নাগিনী

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

কাল নাগিনী

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

অনূদিত

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আমার কথা

'উন্দলুস কী নাগিন' এর রূপান্তরিত নাম 'কাল নাগিনী'। স্পেনে মুসলমানদের আটশ বছরের শাসনকাল বিশ্ব ইতিহাসে আনন্দ বেদনার স্মৃতি হয়ে আছে। আজো শত কোটি মুসলমানের মনের জিজ্ঞাসা অস্ফুট আর্তনাদ হয়ে উঠে– কেন স্পেনে মুসলমানরা এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেও ব্যর্থতার গ্লানিতে নিজেদের ভাগ্যকাশকে কালিমাযুক্ত করলো? অলৌকিকতার দীপ্তিতে পূর্ণ এক জয়কে কি করে পরাজয়ের বেদনা বিদূর অনাকাংখিত এক অধ্যায়ে রূপান্তরিত করলো? এ জন্য কারা দায়ী? কেনই বা দায়ী? আসল খলনায়ক কারা? তাদের পরিণতি হয়েছিলো কেমন?

এধরণের অসংখ্য ব্যক্ত-অব্যক্ত জিজ্ঞাসা ও রহস্যময়তার নাটকীয় সমাধান দিয়েছেন এনায়েতুল্লাহ আলতামাস এই 'কালনাগিনীতে'। শুধুই দুর্লভ নয়, ইতিহাসের অচেনা-অজানা দরজা খুলে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এর কলা-কুশলী, নায়ক-নায়িকাদের ঔপন্যাসীয় মনোমুগ্ধকার উপস্থাপনায়।

এটা ঠিক যে, স্পেনের ইতিহাস অবলম্বনে আরো ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে; তুলনা নয় এক শব্দে বলা যায়, এখানে যেসব চমক জাগানো তথ্যের সমাহার ঘটেছে এর সিকিভাগও সেগুলোতে অনূদিত হয়নি। পাঠক যখন এর প্রামাণ্যতার সজীবতায় আলোকিত হবেন তখন নিজেই এই সরল সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

সময়, পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং সমকালের উপলব্ধিকে বিবেচনা রেখে এর ভাষা আঙ্গিক কিছুটা পরিমার্জিত করতে হয়েছে। তাই 'কালনাগিনী' অনূদিত না হয়ে রূপান্তরিত বললেই বোধ করি আমাদের প্রতি সুবিচার করা হবে।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
০১৯১৬ ৫৭৩৩৩৭

আলহাজ্ব এম রবিউল ইসলাম সাহেব

ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইভেস্টমেন্ট-এর পরম শ্রদ্ধাস্পদ এম ডি।

প্রখর ব্যক্তিত্বপূর্ণ, কিন্তু নিরহংকার এবং দরদমাখা অভিব্যক্তি যাঁর সরল অবয়ব থেকে ঝরে পড়ে।

যাঁকে দেখলে পিতৃতুল্য পরম দায়িত্বশীল এক অভিভাবকের মমতাময়ীর ছায়ার কথা মনে পড়ে।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

মুসলমানদের আলো ঝলমলে একটি অতীত, প্রদীপ্ত গৌরবে প্রাঞ্জল একটি ইতিহাস, অপরাজেয় বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যে ভরা অনবদ্য এক অমরগাঁথা আজো জুড়ে আছে ইউরোপের অন্যতম শক্তিধর দেশ স্পেনের সঙ্গে।

৮২৫ খ্রিঃ। তখনকার যে স্পেনে মুসলমানদের শাসন ছিলো তাতে বর্তমানকালের পর্তুগালও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পুরো স্পেনকে তখন বলা হতো উন্দলুস।

ফ্রান্সের বাদশাহ্ লুই তার রাজমহলের এক খাস কামরায় বসা। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্র গোথাক মার্চের বাদশাহ ব্রেনহার্টও রয়েছেন সেখানে। আর উন্দুলুসের কর্ডোভা প্রদেশের ইউগেলিস নামের এক খ্রিষ্টানও রয়েছে সেখানে। অবশ্য এ লোক তেমন পদাধিকারের অধিকারী নয়।

সভাষদ হিসাবে সেখানে উপস্থিত আছেন শাহ্ লুই-এর দু'জন জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীও।

'ইউগেলিস!' শাহ্ লুই রাজকীয় গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে যখন বলা হলো তোমার কোন পদাধিকার নেই বা সরকারিভাবে তোমার উল্লেখযোগ্য পরিচিতি নেই তখন তোমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবো কি দেবো না—এটা ফায়সালা করা আমার জন্য মুশকিল হয়ে গেলো'.....

'কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার মতো লোককে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়াটা জরুরী। তবে আমার শুধু একটা সন্দেহ দূর করতে হবে, আমি কি করে নিশ্চিত হবো যে, তুমি মুসলমানদের গুপ্তচর নও?.......

'আরেকটি কথা হলো, তুমি আবেগে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছো। এখানে দরকার হলো কাজ করা ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া। যারা আবেগে অন্ধ হয়ে কথা বলে তারা কিন্তু প্রয়োজনের সময় লা-পাত্তা হয়ে যায়। যখন ত্যাগ দেয়ার মতো চরম বাস্তব অবস্থার সামনে দাঁড়াতে হয় তখন কিন্তু এদেরকে আর দেখা যায় না।'

'মহামান্য বাদশাহ! আমি আপনাকে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে বিশ্বাস করাতে পারবো না যে, আমি মুসলমানদের গুপ্তচর নই'। ইউগেলিস আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, 'আপনার গোয়েন্দা বিভাগ যদি মুসলমানদের মতো বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হয় তাহলে কর্ডোভার খ্রিষ্টান সমাজগুলো থেকে জেনে আসতে বলুন, আমি আপনার জন্য বিশ্বাসযোগ্য কিনা। আর আপনার দ্বিতীয় কথার জবাব তখনই পাবেন যখন ত্যাগ ও কুরবানী দেয়ার সময় উপস্থিত হবে।'

'আমি সাবধানতা ও সতর্কতার পক্ষে। তোমাকে নিয়ে না আমার ভয় আছে, না মুসলমানদের ব্যাপারে কোন ভয় আমাকে কাবু করতে পারবে!' শাহ্ লুই বললেন।

'আপনার পূর্বপুরুষরাও তো সতর্কতার পক্ষে ছিলেন।' ইউগেলিস মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখে বললো। 'এর পরিণামেই মুসলমানরা আজ একশ' বছরের বেশি সময় ধরে উন্দলুস শাসন করছে এবং দাপটের সঙ্গে। আপনিও তেমন সতর্কতা অবলম্বন করছেন। সেখানে আমরা আজ গোলাম হয়ে আছি। আমাদের পবিত্র ধর্ম গোলাম হয়ে আছে।.....

'আপনার অন্তরে যদি পবিত্র পিতা ঈসা মাসীহ্ ও চিরকুমারী মরিয়ামের ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ থাকতো, তাহলে আপনি এমন নিশ্চিন্ত মনে সিংহাসনে বসে থাকতে পারতেন না। আমি কি কেবলই একটি অকর্মা-আবেগী লোক, যে এতদূর থেকে আপনার দরবারে পৌঁছেছে? আমি এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।'...

'আর এটা আমার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য নয়। আমার কাছে যদি সেনাবাহিনী থাকতো, যেমন আপনার কাছে আছে তাহলে মুসলমানদেরকে আমি উন্দলুস থেকে বের করে দিতে না পারলেও তাদেরকে সেখানে শান্তিতে দেশ শাসন করতে দিতাম না। আর কিছু হোক না হোক, তাদের ওপর অনবরত গেরিলা ও নৈশ হামলা চালিয়ে যেতাম।'.....

'আমি তোমার এই জযবা ও আবেগকে অবশ্যই মূল্যায়ন করি ইউগেলিস!' শাহ্ লুই বললেন, 'কিন্তু তুমি সম্ভবতঃ জানো না, আরবের এই মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা অতি কঠিন কাজ।

'কঠিন এজন্য যে, মুসলমানরা ধর্মীয় আবেগকে উন্মাদনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে লড়াই করে। শাহ্ লুই বলতে লাগলেন, 'তাদের প্রবল বিশ্বাস হলো, তারা একমাত্র খোদার সন্তুষ্টির জন্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা বলে, লড়াইয়ের সময় খোদা তাদের সঙ্গে থাকেন।'

'ইউগেলিস! তুমি যদি উন্দুলুসে মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে না থাকো তাহলে আমার কাছ থেকে শুনে নাও। ওদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাত

হাজার। উন্দুলুসের উপকূলে পৌঁছে ওরা তাদের সবগুলো নৌযান জ্বালিয়ে দেয়। যাতে ফিরে যাওয়ার কল্পনাও ওদের মাথায় না আসে।'............

'তুমি তোমার ফৌজ বা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে, কিন্তু তাদের মধ্যে এই চিন্তা-চেতনা ও জযবা সৃষ্টি করতে পারবে না যে, তারা মন থেকে ঘরে ফিরে যাওয়ার চিন্তা দূর করে দেবে। পিছু না হটার মানসিকতা গড়ে তোলা অত সহজ কাজ নয়। এই জযবা ও অদম্য স্পৃহার কারণেই মুসলমানরা যেখানেই হামলা করেছে বিজয় লাভ করেছে। তাদের ওপর যারা হামলা করেছে তারা পিছু হটেছে।'.....

'আজ এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে, মুসলমানরা শুধু সামনে অগ্রসরই হচ্ছে। পিছু হটেনি। ফ্রান্সও তাদের হাত থেকে নিরাপদ নয় সম্ভবতঃ এটা তুমি জানো না। তারা সুযোগ পেলে ফ্রান্সে হামলা করে এই দেশটিও তাদের সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে।'

'তাহলে কি ওদের বিরুদ্ধে আপনি কিছুই করবেন না? আমি তো ওদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার চিন্তা করছি। আপনাকে শুরুতেই বলেছি, আমি এক গোপন সংগঠন ও জঙ্গি দল গড়ে তুলেছি। যারা উন্দুলুসের সাধারণ মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত করছে।'

'আমাদের অতিথি বন্ধু ইউগেলিস কি জানেন না এ পর্যন্ত কত হাজার হাজার খ্রিষ্টান মুসলমান হয়ে গেছে?' শাহ লুই এর প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে কেনিথ বললেন, ওরা পাক্কা মুসলমান হয়ে গেছে। ওরা সেই ধর্ম-শাসিত শাসকদের বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করতে রাজি হবে না যাদেরকে তারা মন-প্রাণ দিয়ে মেনে নিয়েছে।'

ইউগেলিসের ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো। তার দৃষ্টি সভার সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এলো। সবার নজরও তার দিকে। সে তার ঠোঁটের হাসি ধরে রেখে বললো,

'হ্যাঁ, এটা আমি জানি। কিন্তু আপনার এটা জানা নেই যে, এই খ্রিষ্টান যারা তাদের ধর্ম বদল করেছে তারা কিন্তু আমারও অনুসারী। ওরা নিঃসন্দেহে মুসলমান হয়েছে, মসজিদে গিয়ে নামাযও পড়ে। সময়মতো রোজাও রাখে। কিন্তু তাদের অন্তর থেকে এখনো ক্রুশের ভালোবাসা বের হয়নি। ওরা ভেতর ভেতর তেমন খ্রিষ্টানই রয়ে গেছে যেমন আগে ছিলো।'...........

'এর কারণ হলো, আরবের কিছু মুসলমান যারা সুশিক্ষিত নয়, তারা এসব নওমুসলিমকে খাটো চোখে দেখে এবং তাদেরকে নিজেদের প্রজা মনে করে। তাদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করে না। এরই ফায়দা এখন আমরা পাচ্ছি।'

'এই নওমুসলিমরা মুসলমানদের জন্য ধোকা হয়ে আছে। ওরা ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়ছে এবং তাদের আড়ালে গিয়ে তাদেরই শিকড় কাটার পরিকল্পনা আঁটছে। ওদের একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কোন খ্রিষ্টীয় বাদশাহর সাহায্যেরও প্রয়োজন। সাহায্য বলতে আমি বুঝাচ্ছি সেনা সাহায্য।'

ইউগেলিস এ বিষয়ে আরো বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বললো। এতে ফ্রান্সের বাদশাহ শাহ্ লুই নিশ্চিত হয়ে গেলেন এ লোক মুসলমানদের গুপ্তচর নয়। এলোক সে উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে, যা শাহ্ লুই এর অন্তরে লালিত হচ্ছে এবং তাকে তা অস্থির করে তুলছে। সেটা হলো, স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করা হবে। অন্যথায় ইসলাম পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বে এবং খ্রিষ্টজগতেও একসময় ইসলাম বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

'ইউগেলিস!' শাহ্ লুই এবার আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, 'নিজেকে নিজে তুমি একা ভেবো না। মুসলমানদের খোলা ময়দানে পরাজিত করা সম্ভব নয় আমি যে একথা বলছিলাম এর অর্থ এই নয় যে, আমি কিছুই করবো না। আমি গোথাকমার্চের বাদশাহ ব্রেন হার্টকে এজন্যই এখানে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ডেকেছি।'.....

'আমাদেরকে মুসলমানদের শিকড় মাটির নিচে গিয়ে কাটতে হবে। এখন উন্দুলুসের বাদশাহ আবদুর রহমান ছানী। আমি জেনে নিয়েছি সে কেমন স্বভাবের এবং তার চালচরিত্র কেমন! সে আক্ষরিক অর্থেই কঠিন যোদ্ধা। লড়তেও জানে। লড়াতেও জানে। নিজের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা তার মনে প্রাণে জুড়ে রয়েছে।'.....

'সঙ্গে সঙ্গে সে উন্দুলুসের সীমানা বিস্তৃত করার পরিকল্পনাও করছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোসকতায় তার ভূমিকা অনন্য। তার বাবা আবদুর রহমান আলহাকাম (প্রথম) উন্দুলুসের ক্ষতি কম করে যাননি। ভোগবিলাস প্রিয় ছিলেন তিনি। তোষামোদকারীদের দু'হাত ভরে এনআম ও নজরানা দিতেন। নিজেকে সারা দুনিয়ার বাদশাহ্ বলে দাবি করতেন।

'কিন্তু আবদুর রহমান ছানী তার বাপের মতো নয়। তার বাপ মুসলমানদের এই সালতানাত ও ইসলামের যে ক্ষতি করে গিয়েছেন আবদুর রহমান এর ক্ষতিপূরণ করছে। তবে তার এসব গুণ ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটি দুর্বলতাও তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সেটা হলো, সে গান-বাদ্য সংগীত ও নারীর প্রতি সীমাহীন আসক্ত। যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে রাখতে তার এই দুর্বলতাকে আরো স্থায়ী করে তুলতে হবে আমাদের।'....

‘ইউগেলিস! আবেগ ও উন্মাদনা থেকে বেরিয়ে এসো। আমি জেনে গিয়েছি তুমি এক একজন করে মুসলমানকে হত্যা করতে চাও। তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নামতে চাও। কিন্তু এভাবে চিন্তা করলে তুমি কখনো সফল হবে না। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মহান ধর্মের শত্রুরা যেন ইউরোপ ছেড়ে পালায়। তাই ওদেরকে মারতে হলে ওদের দুর্বল লোকদেরকে আগে টার্গেট করে এদেরকে ওদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করো।’

‘এটা কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হবে? আবদুর রহমানকে কেন হত্যা করা হবে না?’। ইউগেলিস জিজ্ঞেস করলো।

❋❋❋❋❋

শাহ লুই তার প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর দু’জনই হেসে উঠলেন।

‘আমাদের প্রিয় বন্ধু!’ শাহ লুই এর প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘তুমি এক আবদুর রহমানকে হত্যা করলে দেখবে আরেক আবদু রহমান সিংহাসনে বসেই কয়েক হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করেছে। কারণ, হত্যাকারী যে একজন খ্রিষ্টান এতে কারো সন্দেহ না থাকায় এতগুলো খ্রিষ্টানকে হতা করাও বৈধতা পেয়ে যাবে।’.....

‘তা ছাড়া তাকে হত্যার পর হতে পারে তার স্থলে এমন আরেক বাদশাহ আসবে যে সবদিক দিয়েই পাক্কা ও খাঁটি মুসলমান। আবদুর রহমানের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিলো সে দুর্বলতাও তার মধ্যে হয়তো থাকবে না। আমি তোমাকে যে কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে বলবো, সেটা হলো, আবদুর রহমান সুন্দরী নারীদের প্রতি এতই দুর্বল যে, সে তার এক সুন্দরী কানীয–পরিচারিকাকে বিয়ে করে নিয়েছে। তার হেরেমে এমন এমন মেয়ে আছে যাদেরকে দেখলে তুমি চকচকে ‘হীরা’ ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। তবে ওরা তার মতোই মুসলমান এবং তার ভক্তও।’.....

‘তাকে আসলে এমন এক নারীর জালে ফাঁসাতে হবে, যে তার ওপর নিজের রূপের কারিশমা বিস্তার করতে পারবে এবং তার বিবেক-বুদ্ধিকে নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নেবে। এমন একটি মেয়ের তালিকা আমাদের হাতে আছে।’

‘সে কি মুসলমান না খ্রিষ্টান?’ ইউগেলিস ও বাদশাহ ব্রেন হার্ট একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

‘নামে কেবল মুসলমান।’ প্রধানমন্ত্রী বললেন, ‘আসলে এ ধরনের মেয়েদের কোন ধর্ম হয় না। তোমরা কেউ কেউ হয়তো জানো, উন্দুলুসের এক জায়গায় ‘তরূব’ নামে একট জায়গীর আছে। জায়গীরদার মুসলমান ছিলো। মারা গেছে।

তার এক মেয়ে রেখে গেছে। নাম সুলতানা। নিজেকে সে মালিকায়ে তরূব বলে। অর্থাৎ তরূব-এর সম্রাজ্ঞী।'.......

'আমার গুপ্তচররা আমাকে জানিয়েছে, সে তার জায়গীরের পরিধি বাড়ানোর জন্য নিজের রূপের জাদু প্রয়োগ করে আসছে। অসম্ভব চতুর, ধূর্ত, তীক্ষ্ণ ছল-চাতুরীর অধিকারী। এতই বেশি যে, অঙ্গুলি হেলনে শাহজাদাদেরকে নাচিয়ে তারপর আস্তকুড়ে ফেলে দিতে পারে। সে নাকি এতই সুন্দরী এবং তার দৈহিক গঠন এতই আগুন ঝরানো যে, তাকে এ দুনিয়ার নয়, আসমানী কোন মাখলুক মনে হয়।'.....

'সম্ভবতঃ শাহ উন্দলুস আবদুর রহমান ছানী এখনও তাকে দেখেননি। তোমার বুদ্ধির জোর থাকলে তুমি তা প্রয়োগ করে সুলতানাকে হাত করে নাও। আর তাকে বলো, আমাদের কাজ করে দিলে শাহে ফ্রান্স তাকে একটি প্রদেশই দিয়ে দেবেন।'.........

'তুমি ওর দুর্বলতাও ব্যবহার করো। সেটা হলো, সে এক জায়গীরদারের কন্যা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ নিজেকে সে মালিকা বা সম্রাজ্ঞী বলে। অর্থাৎ সে সম্রাজ্ঞী হতে চায়। আমরা ওকে সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবো।....তুমি কি এ কাজ করতে পারবে?'

'ব্যবসায়িক চুক্তি?' ইউগেলিস হেসে বললো, 'আমি অবশ্যই করবো। ওর সঙ্গে আগে আলাপ করে নিই।'

'আমরা আরেকটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, আবদুর রহমান সঙ্গীতের প্রতি অন্ধ ভক্ত।' শাহ লুই বললেন, 'যারিয়াব নামক এক সঙ্গীতজ্ঞকে তার দরবারে রেখেছে। সুলতানা মালিকায়ে তরূব যদি এই যারিয়াবকে হাত করে নেয় তাহলে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।'

'আপনি যদি মনে করেন এমনটি করলে কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে তাহলে সে ব্যবস্থাও করবো আমি।' ইউগেলিস বললো, 'কিন্তু আমি একে কাপুরুষতা মনে করি যে, আমরা মুসলমানদের তলোয়ারের ভয়ে চোরের মতো পর্দার আড়ালে এভাবে তৎপরতা চালিয়ে যাবো।'

'আমাদের উদ্দেশ্য কি ইউগেলিস?' বাদশাহ ব্রেন হার্ট বললেন, 'ইউরোপ থেকে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে সারা দুনিয়ায় খ্রিষ্টীয় মতবাদকে ছড়িয়ে দেয়া। মুসলমানদের চিন্তা-চেতনাকে আমাদের পাল্টে দিতে হবে। যাতে তাদের অন্তর থেকে নিজেদের ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের আত্মসম্মানবোধ দূর হয়ে যায়।'..........

'আমাদের মেয়েরা গর্বের সঙ্গে মুসলমানদের শিকড় মাটির নিচ থেকে কাটতে থাকবে। ওরা সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করবে। দুশমনকে ধ্বংস করতে সব ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা বৈধ। আমরা যদি ইসলামের এই অপ্রতিরোধ্য গতির টুটি চেপে না ধরি তাহলে ইসলামের ঝাণ্ডা বিশ্বের প্রতিটি আনাচে কানাচে পতপত করে উড়তে থাকবে খুব শিগগিরই।'

'মনে রেখো, আমরা মুসলমানদেরকে মুসলিম বাদশাহদের হাতেই দুর্বল করে তুলবো। ইসলামকে ভিত্তিহীন ধর্ম বানিয়ে ছাড়বো।' শাহ লুই বললেন, 'আবদুর রহমানের ওপর যদি আমরা নারী ও সঙ্গীতের নেশা চাপিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের বন্ধু ব্রেন হার্ট উন্দুলুসের সীমান্ত এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা হামলাও চালাতে পারবে।

'ইউগেলিস! তুমি উন্দলুসে বিদ্রোহ সৃষ্টির সব ব্যবস্থা গড়ে তোলো। এই গোপন তৎপরতায় তুমি একা নও, আমাদের লোকজনও তোমার সঙ্গে থাকবে।

যখন ফ্রান্সের রাজদরবারে সালতানাতে উন্দুলুসের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছিলো; এরও এক শ' চৌদ্দ বছর আগে এক যুবক সালার তারিক ইবনে যিয়াদ সাত হাজার ঈমানদীপ্ত সৈনিককে নিয়ে উন্দুলুসের তীরে নৌযান থেকে নামেন। তারপর সবগুলো নৌযান আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেন। তারপর তার সৈনিকদের উদ্দেশ্য যে ভাষণ দেন ইতিহাসের পাতায় এর প্রতিটি শব্দ আজো অক্ষয় হয়ে আছে। তারিক ইবনে যিয়াদ বলেছিলেন,

'হে ইসলামের অকুতোভয় যুবকেরা। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর এখন আর কোন পথ খোলা নেই। তোমাদের সামনে শত্রুদল আর পেছনে সমুদ্র। পালানোর একমাত্র উপায়-অবলম্বন নৌযানগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পরম ধৈর্য, দৃঢ়তা, কঠিন সংকল্প ও অপরাজেয় আদর্শ ছাড়া তোমাদের কাছে এখন আর কোন কিছুই নেই।'

'তোমরা জেনে রাখো, এই দ্বীপের মতো মহাদেশে (উন্দলুস চারদিক সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের মতো) তোমাদের উদাহরণ এমন যেমন কৃপণের দস্তরখানায় অসহায় এতীমের অবস্থান। তোমাদের মনোবলে সামান্য ঘাটতি দেখা গেলেই তা মুহূর্তে ধ্বংস করে দেবে তোমাদেরকে। তোমাদের শত্রুদলের সৈন্যসংখ্যা অগণিত এবং অস্ত্রশস্ত্রও বিপুল পরিমাণ।'

'আর তোমাদের কাছে তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। শত্রুদলের রসদ সংগ্রহের হাজারো উপায় ও পথ খোলা আছে। তোমাদের সে তুলনায় কোন

উপায় ও পথ খোলা নেই। সে পথ তোমাদেরকেই করে নিতে হবে। তোমরা যদি দৃঢ় মনোবল ও অসীম বীরত্বের সঙ্গে কাজ না করো তাহলে তোমাদের পা উপড়ে যাবে। তখন মুসলিম জাতির নাম ধূলোয় লুটিয়ে যাবে। আর দুশমনের মনোবল বেড়ে যাবে।

'নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ ও ইসলামের ঝাণ্ডাকে উচ্চকিত রাখতে হলে একটি পথই খোলা আছে। সেটা হলো, যে শত্রুদল তোমাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসছে, ভয়াবহ আতংক হয়ে তাদের ওপর ছেয়ে যাও। তাদের শক্তি খতম করে দাও। আমি তোমাদেরকে এমন কোন ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছি না, যেটার ব্যাপারে আমি নিজেকে নিজে আক্রান্ত বোধ করছি না। তোমাদেরকে এমন কোন ময়দানে লড়তে বলছি না যেখানে আমি নিজে লড়াই করবো না।'.....

'আমীরুল মুমিনীন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক তোমাদের মতো বীর বাহাদুরকে এজন্য বেছে নিয়েছেন যাতে তোমরা এ দেশের রাজা বাদশাহ ও আমীর উমরাদের কন্যাদের জামাই হতে পারো। এখানকার যুদ্ধবাজ শাহসওয়ারদের যদি তোমরা খড়কুটার মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারো তাহলে এখানে আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। এ মাটির জমাটবাঁধা হাজার বছরের অন্ধকার দূর করে তাকে আলো ঝলমলে করে তুলতে হবে। এটা মনে রেখো, যে পথে আমি তোমাদেরকে ডাকছি সে পথের প্রথম পথিক আমিই হবো।.....

'দু'পক্ষের সৈন্যরা যখন লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে তখন সবার আগে আমিই থাকবো। সবার আগে যার তলোয়ার দুশমনের ওপর আঘাত হানবে সেটা হবে আমার তলোয়ার। আমি শহীদ হয়ে গেলে তোমরা তো বিবেক বুদ্ধি দিয়েই কাজ করবে এবং আমার স্থলে অন্য কাউকে নির্বাচিত করে নেবে। তারপরও খোদার রাহে প্রাণ উৎসর্গ করতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যে পর্যন্ত আদিগন্ত বিস্তৃত এ এলাকা বিজয় না হবে সে পর্যন্ত তোমরা তলোয়ার হাত থেকে ছাড়বে না।'

যেখানে দাঁড়িয়ে তারিক ইবনে যিয়াদ এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝলসানো শব্দগাঁথাগুলো উচ্চকিত করেছিলেন সেটা ছিলো একটি পাহাড়ের চূড়ার মতো জায়গা, ইতিহাস সে পাহাড়কে আজো স্মরণ করে 'জাবরাল্টা' নামে।

এর আগে এ এলাকা জার্মানরা জয় করেছিলো। তারা নাম দিয়েছিলো 'আন্দালাস'। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে যখন তারিক ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে আরবের সিংহরা এ দেশ জয় করলো তখন এর নাম দিলো 'উন্দলুস'। পাহাড়, পর্বত,

উপত্যকা, নদী, খাল বিল, ঝর্ণাধারা, বড় বড় শহর এমনকি অনেক গ্রামের নামও তারা পাল্টে ফেললো। সেখানকার পশ্চাদপদ ও বর্বরীয় সংস্কৃতি ধুয়ে মুছে পবিত্র করে এই দেশের অধিবাসীদেরকে এক আধুনিক ও সার্বজনীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি উপহার দিয়ে তাদেরকে আলোকিত করে তুললো।

❋❋❋❋❋

তারপর তারিক ইবনে যিয়াদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কেটে গেলো এরপর শতাব্দীকাল কিংবা আরো অধিক সময়। উন্দুলুসের সিংহাসনে তারা এসে বসলো, যারা তাকি ইবনে যিয়াদ ও তার সাত হাজার সঙ্গীর রক্ত ঝরানো ইতিহাস হৃদয় মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

মুজাহিদরা পবিত্র রক্ত দিয়ে ইতিহাসের যে সুবিশাল অধ্যায় রচনা করেছিলো, সিংহাসনের মোহগ্রস্তরা তার ওপর নিজেদের অসৎ কর্মের কালো পর্দা চড়িয়ে দিলো। যে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা ছিলো আল্লাহর, তা হয়ে গেলো দিকভ্রান্ত মানুষের। যে দরবার ন্যায়-নীতি ও সততার বিমূর্ত প্রতীক ছিলো তা হয়ে গেলো অশ্লীল নর্তকীদের নিরাপদ নৃত্যক্ষেত্র।

সে দরবার হয়ে উঠলো উলঙ্গপনার রঙমহল। শাসকরা বনে গলো বাদশাহ। আর তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রইলো তোষামোদকারীরা। শাসকরাও তোষামুদে কথা শুনে পুলকিত হতে লাগলো।

৮২২ খ্রিঃ (২২৭ হিঃ সনে) উন্দুলুসে এমনই একজন বাদশাহ মারা গেলেন। তার নাম আলহাকাম। 'তারীখে উন্দলুস' নামক গ্রন্থে আলহাকামকে এভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছেঃ

'আলহাকাম নিজের রাজ্যক্ষমতা ও ভোগবিলাসে মত্ত জীবন স্থায়ী করার স্বার্থে কুট-কৌশল, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতন নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছিলেন। না জনগণের ইযযত সম্মানের পরোয়া করেছেন, না তাদের জানমালের।'...

'নিজের বাদশাহী নিষ্কন্টক করার জন্য এক দু'জন নয়, হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিলো নিরপরাধ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছেন। ইচ্ছে হয়েছে তো হাজারো মানুষের ভিটে-বাড়ি, জায়গা জমি ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার জুরুম অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু যেমন সাধারণ জনমানুষ ছিলো তেমনি শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, আলেমে দ্বীন ও মুফতী সাহেবরাও ছিলেন।'.....

'রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কায়েম রাখার জন্য যে কোন অবৈধ কলাকৌশল, অজুহাত, চক্রান্তকে বৈধ করে নিয়েছিলেন আলহাকাম। আলহাকামের কাল ছিলো একনায়কতন্ত্রীয় স্বৈরশাসন ব্যবস্থার এক ঘৃণ্য উদাহরণ। 'যেমন ইচ্ছে তেমন ভোগ করো' এর কলংকজনক প্রতীক ছিলো আলহাকামের শাসনকাল।'

❋❋❋❋❋

আল হাকামের মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুর রহমান ছানী একত্রিশ বছর বয়সে উন্দুলুসের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তার ব্যাপারে ইতিহাসের মূল্যায়ন এরকম,

'সাহিত্য, কাব্য কবিতার যত রথী মহারথী, গানবাদ্য ও নৃত্যকলার যত অভিজ্ঞ মুখ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত বড় বড় পন্ডিত আবদুর রহমানের দরবারে সমবেত হয় সেটা আর কোন কালের ইতিহাসে দেখা যায়নি। তবে আবদুর রহমান যেমন শিল্প-সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন তেমনি সঙ্গীতের প্রতিও ছিলো তার তীব্র আকর্ষণ।

একদিকে তিনি ছিলেন অতি তীক্ষ্ণধারী তলোয়ার চালনাকারী, যুদ্ধ ও লড়াইয়ে ক্ষিপ্র ও অভিজ্ঞ, অন্যদিকে ছিলেন সুন্দরী নারীর প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত।

তার মহলের তিন পরমা সুন্দরী মেয়ের কাছে তার জীবন-যৌবন সঁপে রাখেন। এরা ছিলো তার মহলের পরিচারিকা। একসময় এরা হয়ে উঠে আবদুর রহমান ছানীর পরম প্রেমাস্পদ।

'মুদ্দাসসিরা' নামের পরিচারিকাটির রুপে মুগ্ধ হয়ে আবদুর রহমান তাকে বিয়ে করেন। আরেকজন ছিলো 'জারিয়া' নামের পরিচারিকা। এ যেমন সুন্দরী তেমনি ছিলো তার কণ্ঠে জাদুমুগ্ধকারী সুর। আবদুর রহমান তার গান শুনতে শুনতে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। আরেকজন পরিচারিকা হলো শিফা। এও ছিলো অতি রূপবতী। তার সিগ্ধ রূপ যে কোন পুরুষকে হতভম্ব করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

❋❋❋❋❋

উন্দুলুসের সে রাতটি অন্যান্য রাতের মতোই সন্ধ্যা নামার পর ঘনিয়ে এলো। আবদুর রহমান শাহী মহলে গায়ক যারিয়াবের জাদুময় সুর মাধুরী সবাইকে মাতাল করে তুললো। সুন্দরী জারিয়াও আবদুর রহমানের পাশে বসে যারিয়াবের সঙ্গে সুর মিলাচ্ছে। শাহে উন্দলুস আব্দুর রহমান ছানী গান ও তার সুর লহরীতে এমনভাবে বিমুগ্ধ ও মগ্ন যে, তার মাথা থেকে এটা নেমে গেছে,

তিনি সেই সালতানাতের সুলতান, সেই দেশের শাসক, যেখানে ক্রুশের পূজারীদের কালো ছায়া ক্রমেই চারদিক থেকে বিস্তার করে চলেছে।

এটা আর তার মনে রইলো না, ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে তাকে আরো অনেক দূর সফর করে যেতে হবে। এই শাহী মহলই তার শেষ গন্তব্য নয়। তাকে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা আরো দিগন্তপ্রসারী করে তুলতে হবে। যাতে পথহারা মানবজাতি আল্লাহর সত্যধর্মের আলোয় পথপ্রাপ্ত হয়।

সে রাতেই মালিকায়ে তরুব সুলতানার বাড়িতে এক দরবেশ পা রাখলো। সুলতানা এই দরবেশকে আগেও তার মহলের মতো বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। সুলতানা তার সাদা দুটি ঘোড়ায় জুড়ে রাখা গাড়িতে করে বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়ে এই দরবেশকে প্রথমে দেখতে পায়। দরবেশ তার গাড়ির পাশ দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যায়। সুলতানার পাশে বসে থাকা তার এক সঙ্গী বলে উঠে,

'এ লোকের মনে হয় মাথা খারাপ। পাগল। একে কয়েকবারই দেখেছি।'

'ভিখারীও হতে পারে।' আরেক সখি বলে উঠে।'

'না'। সুলতানা বললো, 'ভিখারী নয়। এর চোখেমুখে কি যেন একটা আছে। কথা শুনলে মনে হয় এ কোন সাধারণ দরবেশ নয়। আমি একে কাছ থেকেও দেখেছি। এর চোখে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি স্পষ্টতর হয়ে আছে। আমি কোন পুরুষের চেহারা চিনতে ভুল করিনি কোন দিন। এ আমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।'

'দরবেশ হোক আর সাত মহাদেশের শাহেনশাহ হোক, তোমার রূপের জাদু সবাইকে সমানভাবে ঘায়েল করে ফেলে।' সখির কণ্ঠে জলতরঙ্গ বেজে উঠলো যেন।

সুলতানা ঘুরে দেখলো, দরবেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি এই রূপের সম্রাজ্ঞীর শুভ্র অশ্বজোড়ার গাড়ির দিকে নিবদ্ধ। গাড়িটিকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চলছে। সুলতানার গাড়িও সামনে এগিয়ে চলছে। সুলতানা তার বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলো। সূর্যাস্ত তখনো হয়নি।

দেখলো দরবেশ সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়ানো। সুলতানার কৌতুহল বেড়ে গেলো। সে তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেললো। দরবেশকে চোখের ইশারা তার সামনে আসতে বললো। দরবেশ ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো।

'তোমাকে আরো কয়েকবার এখানে দেখেছি আমি'। সুলতানা জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি সব মেয়েকেই এমন গভীর দৃষ্টিতে দেখো যেমন আমাকে দেখছিলে?'

'দুনিয়ায় কিছু নারী আছে মালিকায়ে তরূব থেকেও আকর্ষণীয়া।' দরবেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু মালিকার রূপের আকর্ষণ মন-প্রাণ ও আত্মকেও ছাড়িয়ে যায়। আর যার রূপ আত্মাকে অতিক্রম করে যায় সে নারী মর্ত্যলোকের সেসব নারীর চেয়েও মহান যারা তার চেয়ে সুন্দরী।'

'তুমি কি আমাকে এভাবে দেখার জন্য আমার বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকবে।'

'হ্যাঁ', দরবেশ নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'এবং কিছু বলার জন্যও। মালিকার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্যও।'

'কি বলার জন্য?'

'এতগুলো মানুষের সামনে বলবো কি করে যাদের রাক্ষুসে চোখ মালিকার চেহারা চেটেপুটে খাচ্ছে। ওদের সামনে কি দরবেশ কিছু বরতে পারে?' দরবেশ সকৌতুকে বললো, 'দেখুন মালিকায়ে তরূব! পথচারীরা কেমন করে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে?'

'আমি মালিকাকে সে পথ দেখাতে চাই যে পথে চললে এসব লোক মালিকাকে এভাবে অভব্যের মতো নগ্ন চোখে দেখবে না, বরং তাদের দৃষ্টি থাকবে মাটির দিকে এবং মালিকার সম্মানে তাদের মাথা অবনত থাকবে। উন্দুলুসের সিংহাসনে মালিকার জন্য জায়গা খালি রয়েছে।'

'তুমি যদি কো-, গনক হও এবং ভবিষ্যতের পর্দা উঠাতে পারো তাহলে আজ রাতে আমার ওখানে চলে এসো। দারোয়ান তোমাকে বাঁধা দেবে না।'

❋❋❋❋❋

রাতে দরবেশকে দারোয়ান বাঁধা দেয়নি। বরং সসম্মানে সুলতানার কামরা নিয়ে গেলো। কামরায় সুলতানা ছাড়া আর কেউ ছিলো না।

সুলতানার গায়ে তখন রেশমী কাপড়ের পোষাক। যেটা তাকে আবৃত নয়, অনেকখানি নগ্নই করে রেখেছে। ওর খোলা চুল কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো। ঝুলানো ফানুসের আলোয় তার রূপ আরো কয়েকগুণ হয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে।

ইতিহাসে এসেছে, সুলতানার আওয়াজ ছিলো দারুণ সুরেলা, তার চালচলন, অঙ্গভঙ্গি জাদুর মুগ্ধতায় ভরা, তার হাসিতে মদের ক্রমআচ্ছন্নতা। খোদা যেমন তাকে রূপ দিয়েছেন, এর চেয়ে বেশি দিয়েছেন বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা ও চতুরতা। তার দৃষ্টিতে– চাহনিতে সবসময় প্রেম ও ভালোবাসার ঝলক লেপ্টে থাকে। কিন্তু স্বভাবে সে দারুণ প্রতারণা প্রিয়। সে তার রূপের ব্যবহার জানে। জানে কি করে পুরুষকে বশ করা যায়। এসব তার কাছে ছিলো পানি পানের মতো সহজ।

দরবেশ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও তার দৃষ্টি কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের কাঁপুনির মতো। তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে এলো তার মুখের দিকে।

'উন্দুলুসের সিংহাসনে আমার জন্য জায়গা খালি আছে এটা তুমি কি করে বললে?' সুলতানা মালিকায়ে তরূব জিজ্ঞেস করলো।

'এটা পরমাত্মার জগতের কথা মালিকা!' দরবেশ বললো, 'আমি জানি, আপনি কোন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হতে ব্যাকুল হয়ে আছেন। কিন্তু সে পথ আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না। আজ পর্যন্ত এমন কাউকে আপনি পাননি যে আপনাকে সে পথটা দেখাবে।'

'তুমি যদি আমাকে সে পথ দেখিয়ে দাও তোমাকে আমি অর্ধেক জায়গীর পুরস্কারস্বরূপ দিয়ে দেবো।'

'আমার কোন নজরানা–পুরস্কারের প্রয়োজন নেই মালিকায়ে তরূব! আমার পায়ের তলায় ধনভান্ডার পড়ে আছে। কিন্তু সেটা বেকার। এসব আমার জন্য নয়। আমি অন্য কোন জগতের মানুষ।—শাহে উন্দলুস আবদুর রহমান ছানী আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন।'

'কিন্তু তিনি আমাকে দেখেছেনই বা কবে?' সুলতানা লোভাতুর কণ্ঠে বললো, 'শুনেছি মহলের তিন পরিচারিকা বাদশাহকে তাদের জালে জড়িয়ে রেখেছে। এও শুনেছি, আবদুর রহমান নাকি পাক্কা মুসলমান ও অতি উঁচু চরিত্রের মানুষ। তিনি আবার ভীষণ লড়াকু বাদশাহও। সম্ভবতঃ এ কারণেই তার পর্যন্ত আমার নাম পৌঁছেনি।'

সুলতানার কথায় লোভ–মোহগ্রস্ততার নেশা ঝরে পড়ছিলো।

'আমি মালিকা বা সম্রাজ্ঞী হবো একথা বলা ছাড়া কি তুমি আমার কোন সাহায্য করতে পারবে না?' সুলতানা বললো, 'তুমি কি এমন কোন উপায় বলে দিতে পারবে না যেটা আমাকে সিংহাসন পর্যন্ত পৌছাবে। দরবেশ তো অনেক কিছুই করতে পারে।'

'আপনি আগে আমাকে বলুন, কোন মুসলিম বাদশাহর রানী হতে চান, নাকি'.....

কথার মাঝখানে মালিকায়ে তরূব হেসে উঠলো এবং বললো,

'আমার কোন স্বপ্ন কোন ধর্মের সঙ্গে জড়িত নয়। আমি যদি কোন ধর্মের আসল অনুসারী হতাম তাহলে এতদিনে কারো স্ত্রী হয়ে দুই সন্তানের মা হয়ে যেতাম।'

'তাহলে আমি আপনাকে যা বলবো তা আপনাকে করতে হবে। তা কি আপনি করতে পারবেন?' দরবেশ জিজ্ঞেস করলো, 'একটি দেশের অঙ্গরাজ্য আপনার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সে রাজ্য কোন মুসলমানের হবে না। সেটা আপনি এর বিনিময়ে পাবেন যে, শাহে উন্দলুস আবদুর রহমান ছানীর মন মস্তিস্কে আপনাকে চেপে বসতে হবে। অতি রূপসী এক ফানুস হয়ে তাকে অধিকার করতে হবে আপনাকে।'

'তারপর তাকে বাধ্য করবো, তিনি যেন আমাকে রাণী করে নেন?'

'না,' দরবশ বললো, 'এমন করলে তিনি আপনাকে সম্রাজ্ঞী বা রানী নয়, তার স্ত্রী বানাবে। তারপর একদিন আপনার মোহ কেটে গেলে আপনাকে হেরেমে নিক্ষেপ করবেন। তারপর আরেকজন রানী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তার শয়নকক্ষে এসে হাজির হবে,—এভাবে চলতেই থাকবে। আমি আপনাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি। আপনি সেটা প্রয়োগ করলে একদিন আপনি আপনার স্বাধীন অঙ্গরাজ্যের অধিকারী হবেন। সৈন্যসামন্তও থাকবে এবং আপনি স্বাধীনভাবে রাজত্বও করবেন।'

সুলতানা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী। সে মনোযোগ দিয়ে দরবেশের কথা শুনছে। আর গভীর চোখে তার চেহারা নিরীক্ষা করছে। হঠাৎ সে চমকে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে দরবেশের দাড়ি ধরে সজোরে টান দিলো। দাড়ি গোড়া থেকে উঠে এলো। তার আরেক হাত দরবেশের মাথায় রাখলো এবং মাথার কাপড় তার হাতের মুঠোয় নিয়ে টানদিতেই এক ঝটকায় মাথার কাপড় ও মাথার দীর্ঘ চুল উঠে এলো।

মাথার চুল ও দাড়ির রঙ সাদা রঙ দিয়ে শুভ্র করে তুলেছিলো। এটা আসলে ছিলো ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশ খসে যাওয়ার পর পূর্ণ এক যুবকের অবয়ব বেরিয়ে এলো।

'কে তুমি?' সুলতানা হয়রান হয়ে রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কি নিতে এসেছো? তোমার কি এতটুকু ভয় নেই যে, আমি তোমাকে হত্যা করিয়ে তোমার লাশ গায়েব করে দিতে পারবো?'

লোকটি ভয় না পেয়ে অভয়ের হাসি হেসে বললো,

'আমার নাম ইউগেলিস—সুলতানা মালিকা! ছদ্মবেশ ধারণ করেছি এজন্য যে, তোমার কাছে আসার সহজ আর কোন পদ্ধতি ছিলো না এবং এটা নিরাপদও। আমি এমন কোন উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি যে, তুমি আমাকে হত্যা

করাবে। আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাওয়ার পরও সে কথাই বলবো যা এতক্ষণ বলে এসেছি। ধর্মের কথা এজন্য বলেছি, তোমার ওপর যদি ইসলামের প্রাধান্য দেখতাম তাহলে এই ছদ্মবেশেই এখান থেকে চলে যেতাম।'

'তুমি আমাকে কি খ্রিষ্টান বানাতে এসেছো?'

'না সুলতানা! তুমি এখন যেমন মুসলমান আছো তেমন মুসলমানই থাকবে এবং সম্রাজ্ঞী হওয়ার পরও মুসলমানই থাকবে।' ইউগেলিস আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে।

ইউগেলিস তার পকেট থেকে আলতো করে একটি হার বের করলো। এতে খচিত মনিমুক্তাগুলো থেকে বিচিত্র বর্ণের আলো ঠিকরে বেরোতে লাগলো। হারটি সুলতানার সামনে তুলে ধরে বললো,

'এমন হার কখনো দেখেছো? এমন হীরা-মনিমুক্তা কখনো দেখেছো? এমন হার কোন সম্রাজ্ঞীর গলাতেই দেখা যায়।'

হারটি সুলতানার দিকে এগিয়ে ধরে ইউগেলিস বললো,

'এটা তোমার জন্য উপহার.....জানো এটা কে পাঠিয়েছেন? শাহে ফ্রান্স শাহ লুই। এটা তোমার জন্যই।'

সুলতানার চোখের মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো। তার ঠোঁট দুটি নিমিষেই শুকিয়ে গেলো। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে রইলো। সে এমন দুর্মূল্যের হার কখনো দেখেনি। তার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না এমন একটি হারের মালিক এখন সে এবং এটা পাঠিয়েছেন কোন বাদশাহ।

'শাহ লুই কি চান?' সুলতানা নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো। তার ক্ষণিক আগের লোপ পাওয়া বিবেক বুদ্ধি আবার জেগে উঠলো। মনে পড়ে গেলো, সে অতি সুন্দরী এক যৌবনময়ী মেয়ে। যার রাজা বাদশাহদের কাছেও উঁচু মূল্যের চাহিদা আছে।

'তিনি তোমাকে নিজের মালিকা বা রানী বানাতে চান না।' ইউগেলিস সোজা সাপ্টা কথা পাড়লো, 'তিনি তোমাকে একটি আস্ত অঙ্গরাজ্য দিতে চান। তোমাকে কোন ধোকাও দেয়া হবে না এবং তোমার সঙ্গে কেউ প্রতারণাও করবে না। বরং তোমাকে এক ধোকা ও প্রতারণার বাস্তব প্রতিমূর্তি বানানো হবে।'

'আর আমাকে শাহে উন্দুলুসের মহলে ঢুকিয়ে তাকে ধোকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে?' সুলতানা বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বললো, 'আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করছি। কারণ, আমি যে তোমাকে গ্রেফতার করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি সে ভয়টুকুও তোমার মধ্যে নেই। কিংবা সে বাস্তব জ্ঞানটুকুও তুমি রাখো না।'

'এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তুমি জীবিত থাকলে তো!' ইউগেলিস শীতল গলায় বললো, 'আমার মুখ একটি। হাত ও বাহু অনেক। আমি একা নই। পুরো একটা শক্তিশালী দল ছায়ার মতো আমার সঙ্গে রয়েছে। তুমি শুধু আমাকে দেখছো, আমার ছায়া দেখার মতো শক্তিশালী দৃষ্টি তোমার নেই।'

❋❋❋❋❋

'আমি যতটুকু মাটির উপরে আছি এর চেয়ে অধিক মাটির গভীরে আর অস্তিত্ব শিকড় গেড়ে আছে।' ইউগেলিস বুক টান টান করে বললো, 'আমাকে গ্রেফতার করানোর মতো বোকামি কখনোই তুমি করতে পারবে না। আমি তোমার ভবিষ্যৎ চমকাতে এসেছি। এই কেয়ামত নামানো রূপ থেকে ফায়দা উঠাও সুলতানা!'.....

'তোমার চেহারায় যা আজ বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে। এ চমক ক্ষণকালের। একসময় এই চমক তোমার কেবল স্মৃতির সঙ্গী হয়ে থাকবে। আমরা তোমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিচ্ছি না। অনেক কিছু দিচ্ছি বরং তোমাকে। আবদুর রহমান তার চোখের মণিকোঠায় তোমার আসন দেবেন। তাকে যদি তোমার দেওয়ানা বানাতে পারো সেটা হবে তোমার ঐতিহাসিক কৃতিত্ব প্রদর্শন।'

'তুমি যদি বলো আমি নিজেই তার মহলে গিয়ে হাজির হবো তাহলে কিন্তু এটা আমি মানতে পারবো না। তাছাড়া আমি নিজে গেলে তো আমার মূল্যও কমে যাবে।' সুলতানা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললো।

'তাকে তোমার রূপের ঝলক দেখানোর কাজ আমাকেই করতে হবে।' ইউগেলিস তাকে আশ্বস্ত করে বললো, 'শুধু বলো তুমি আমার সঙ্গে আছো। বাকি কাজ আমার।'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'আবদুর রহমানের ওপর নেশা বিস্তার করতে হবে। তিনি তার তিন অতি রূপসী পরিচারিকার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তাদেরকে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবে না। বরং ওদেরকে হাতে নিয়ে আবদুর রহমানের সব প্রতিভা আর যোগ্যতা শেষ করে দেবে। তিনি সাধারণ লোক নন। তিনি যদি নারীদের মোহময় পরিবেষ্টন ও রাগ-রঙ থেকে বেরিয়ে আসেন তাহলে পুরো খ্রিষ্টজগতের ওপর তিনি এক আতংক হয়ে ছেয়ে যাবেন।'.....

'তাকে বাস্তবতা থেকে দূরে রাখতে হবে। প্রায় অজ্ঞ-অসচেতন করে রাখতে হবে তাকে। বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা বা অচেতন করা যাবে না,—এর বিনিময়ে

তুমি যা পাবে সেটা হবে তোমার স্বপ্ন ও কল্পনার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি।'

'আমি রাজি।' সুলতানা অধীর আগ্রহ নিয়ে বললো।

'এখন শোনো! তোমাকে কি করতে হবে।' ইউগেলিস বললো এবং তার পরিকল্পনার আদ্যোপান্ত তাকে বোঝাতে লাগলো।

❋❋❋❋❋

যে রাতে রূপের এমন ভয়াবহ জাদুতে ভরা চক্রান্ত হচ্ছিলো সালতানাতে উন্দুলুসের বিরুদ্ধে, সে রাতে সালতানাতে ইসলামিয়া উন্দুলুসের কর্ণধার আবদুর রহমান ছানী ডুবে ছিলেন সুন্দরী নারীদের রূপ যৌবনের অতল সমুদ্রে। আর মগ্ন ছিলেন যারিযাবের মন উন্মাতাল করা গান ও নর্তকীদের নৃত্যকলায়।

যাবিয়াব আসলে ইরানের অধিবাসী ছিলো। তার আসল নাম আলী ইবনে নাফে। উপনাম আবুল হাসান। কিন্তু যারিয়াব নামেই সে বিখ্যাত হয়ে উঠে। যাবিয়াব বিশ্ববিখ্যাত এক গায়ক হয়ে উঠে। পৃথিবী বিখ্যাত আরেক সঙ্গীতজ্ঞ ইসহাক আল মুছিলী তার সঙ্গীতগুরু। খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারী গায়ক ছিলেন ইসহাক মুছিলী।

কিন্তু যারিয়াবের সুরে যে আশ্চর্য শক্তি ও রাগ-রাগিনী সম্পর্কে তার যে অগাধ জ্ঞান ছিলো সেটা দিয়ে তার গুরু মুছিলীকেও সে অতিক্রম করে গিয়েছিলো। যারিয়াব শুধু দরবারী গায়ক বা সঙ্গীতজ্ঞই ছিলো না। দেখতে দারুন সুদর্শন। ইতিহাস ও দর্শনে দারুন পান্ডিত্য ছিলো তার। কথা বললে সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতো এবং খুব দ্রুত তার মতাবলম্বী হয়ে উঠতো।

তার ব্যাপারে এমন জনশ্রুতিও ছড়িয়ে পড়ে, তার দখলে কোন জিন বা অশরীরী কিংবা অপার্থিব কোন শক্তি রয়েছে।

এক সময় সে আফ্রিকা চলে যায়।

আবদুর রহমানের বাবা আলহাকাম তার খ্যাতির কথা শুনে তার দরবারের এক ইহুদী গায়ককে আফ্রিকা পাঠিয়ে দেন যারিয়াবকে নিয়ে আসতে। কিন্তু যাবিয়াব কর্ডোভা তখন পৌঁছে যখন আলহাকামের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং আবদুর রহমান ছানী শাসন ক্ষমতার লাগাম নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন।

যারিয়াবকে হতাশ হতে হয়নি। কারণ, আবদুর রহমানও তার বাবার মতো দারুণ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি যারিয়াবকে পেয়ে বুকে তুলে নেন। যারিয়াব খুব অল্প দিনেই পুরো রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করে। সে যে শুধু একজন সঙ্গীতজ্ঞই নয়, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন ইতিহাসে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি সেটাও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

দুই তিন দিন পর আবদুর রহমান শিকারে গেলেন। যে বনজঙ্গলে তিনি শিকার করতে গেলেন সেখানে অনেক হরিণ রয়েছে। মুহাফিজ ও রাজকর্মচারীসহ অনেক লোক রয়েছে তার সঙ্গে।

আবদুর রহমান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হাতে তীর ধনুক নিয়ে একটি হরিণকে ধাওয়া করলেন। কিন্তু এসময় একটু দূরে একটি ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেলো। গাড়ির সামনে দুটি সাদা ঘোড়া জুড়ে রয়েছে।

এক মুহাফিজ ঘোড়ার গাড়িটি সেখান থেকে দূরে হটানোর জন্য সেদিকে তার ঘোড়া ছুটালো। সেই ঘোড়ার গাড়ির রুখ সেদিকে রইলো যেদিকে আবদুর রহমান যাচ্ছিলেন। তিনি জায়গায় দাড়িয়ে পড়লেন। পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে সেই সাদা ঘোড়া দুটি ভয় পেয়ে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে। নিচের জমি সমতল নয়। তাই ঘোড়ার গাড়িটি ডানে বামে কাত হয়ে যাচ্ছে।

আবদুর রহমান তার মুহাফিজদেরকে হুকুম দিলেন, গাড়ির ঘোড়া দুটিকে থামাতে। তিন চার মুহাফিজ সেদিকে ঘোড়া ছুটালো। গাড়ির ঘোড়াগুলো তাদের দিকে কয়েকটি ঘোড়া ছুটে আসতে দেখে দিকবিদিক হয়ে ছুটতে শুরু করলো। গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগাম ধরে তার দিকে সমানে টানছিলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতর থেকে এক নারীর চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো। কখনো কখনো তার ভয়ার্ত মুখ বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। পরমুহূর্তেই সেটা আবার গাড়ির ভেতর হারিয়ে যেতে লাগলো।

মুহাফিজরা সেনাবাহিনীর লোক। তারা তাদের ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে গাড়ির সাদা ঘোড়ার পাশাপাশি নিয়ে গেলো। তারপর দুই মুহাফিজ তাদের ছুটন্ত ঘোড়া থেকে গাড়ির ঘোড়া দুটির ওপর প্রায় লাফিয়ে গিয়ে সওয়ার হলো। তারা দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম ধরে আস্তে আস্তে ঘোড়া দুটিকে শান্ত করে ফেললো এবং ঘোড়া শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

গাড়ি থেকে অতি রূপসী একটি মেয়ে নেমে এলো। নেমেই মুহাফিজদের শুকরিয়া আদায় করলো।

তার মুখ এখনো ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে। সে হাফাচ্ছিলো। গাড়োয়ানের অবস্থা এর চেয়ে আরো ভয়াবহ।

মুহাফিজরা তাকে বললো এটা শাহে উন্দলুস ও শাহী খান্দানের শিকারক্ষেত্র। তাদের গাড়ি কি করে এদিকে এলো?

মেয়েটি বললো, এটা তার জানা ছিলো না যে, এই বনভূমি শাহী খান্দানের শিকারক্ষেত্র। মুহাফিজরা বললো, তাকে শাহে উন্দুলুসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে

হবে। তিনি হুকুম দিয়েছেন, গাড়ির ঘোড়া দুটি নিয়ন্ত্রণে এলে গারোয়ান ও যাত্রীকে যেন তার সামনে হাজির করা হয়।

মুহাফিজদের ঘোড়া চলতে লাগলো আগে আগে। এর পেছন পেছন চলছে ঘোড়ার গাড়িটি। গাড়ির ভেতর থেকে মেয়েটি গারোয়নের দিকে মুখ বের করে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'ইউগেলিস! আমার ঘোড়া কি আসলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। আমার তো ভয়ে রক্ত শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিলো।

ইউগেলিস নিঃশব্দে হেসে উঠলো এবং নিচুগলায় বললো,

'আমার কারিশমার প্রশংসা করো সুলতানা! ঘোড়া প্রথমে মোটেও লাগাম ছাড়া হয়নি। আমি ঘোড়া ছুটিয়েছিই এমনভাবে যে, দূর থেকে যে দেখবে সে মনে করবে ঘোড়া মনে হয় লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে।'.....

'হ্যাঁ, আমি যে সংবাদ পেয়েছি, আবদুর রহমান শিকার করতে আসছেন এটা সঠিক বলেই প্রমাণিত হলো। এখন ওরা তোমাকে তার সামনে নিয়ে যাচ্ছে। এই শিকার ক্ষেত্রের বনভূমিতে ঢুকে পড়া অপরাধ। আমার কৃতিত্ব তুমি দেখেছো। এখন তোমার কৃতিত্ব দেখাও।'

❋❋❋❋❋

শাহী মহলেও ইউগেলিসের লোক রয়েছে। সে লোকই সময়মতো তাকে খবর দেয়। অমুক দিন শাহে উন্দলুস অমুক বনভূমিতে শিকার করতে যাচ্ছেন। এ খবর পেয়ে ইউগেলিস সুলতানাকে নিয়ে সব পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে। সে অনুযায়ী কয়েকবার রিহার্সেলও করে নেয়।

সুলতানা ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলো। সামনে আবদুর রহমান দাঁড়ানো। এর আগে তার চোখ মুখ রাগে থমথমে হয়েছিলো। সুলতানার প্রতি নজর পড়তেই তার সেই থমথমে ভাব নিমিষেই দূর হয়ে গেলো। তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো।

সুলতানার রূপের জাদু পথম দেখাতেই তার কারিশমা দেখিয়েছে। আবদুর রহমান গারোয়ান ইউগেলিসের দিকে তাকালো।

'অপরাধ নেবেন না শাহে উন্দলুস!' ইউগেলিস ঝুকে পড়ে বললো, 'ঘোড়া তাবু থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। এই শিকারভূমির সীমানা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিলো না।'

আবদুর রহমান তার পুরো কথাও শুনলেন না। তার চোখ আটকে গেলো সুলতানার চেহারায়।

'শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে আমার কোন আফসোস হচ্ছে না। কে তুমি মেয়ে?' আবদুর রহমান সুলতানাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মালিকায়ে তরূব।' সুলতানা বললো, 'আমার নাম সুলতানা।'

'কোন দেশের মালিকা–সম্রাজ্ঞী?.....তরূব কোন দেশ?.....আবদুর রহমান তার লোকদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'তরূব আসলে একটি জায়গীর। কোন দেশ নয় তরূব।' কেউ একজন জানালো।

সুলতানা তাকে জানালো, তার বাবা মারা গেছে। এখনো তার বিয়ে হয়নি। এখন সে তার বাবার জায়গীরের মালিক।

'তুমি সত্যি সত্যিই সম্রাজ্ঞী হতে পারো।' আবদুর রহমান বললেন, 'তুমি সদ্য যুবতী মেয়ে। নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিজেই ফয়সালা করতে পারো।.....আমার বিশ্বাস, তমি বুঝে গেছো আমি কি বলতে চাচ্ছি।'

'বুঝে গেছি শাহে উন্দলুস!' সুলতানা মুচকি হেসে বললো, 'এতটুকু ইশারা ইংগিত তো বুঝাই যায়।'

এক ঝর্ণার ধারে দারুণ সুসজ্জিত একটি তাঁবু খাঁটানো হয়েছে। সুলতানাকে সেখানে নিয়ে গেলেন আবদুর রহমান। সেখানে রাজকীয় দস্তরখান সাজানো ছিলো। সুলতানাকে নিয়ে তিনি দস্তরখানায় বসলেন। ইউগেলিসও সঙ্গে রইলো। দস্তরখানায় পাখির ভূনা গোশত ও একটি হরিনের রানের রোষ্ট পরিবেশন করা হলো। হরিণটি কিছুক্ষণ আগে আবদুর রহমান শিকার করেছেন।

খুশিতে আবদুর রহমানের ভেতরটা ঝন ঝন করে উঠছিলো। তার আশাতীত প্রিয় এক শিকার মিলে গেছে। সুলতানাকে দেখে দেখে তিনি নিশাকাতর হয়ে উঠছিলেন।

❋❋❋❋❋

এই নেশা আবদুর রহানের ওপর সবসময় ছেয়ে রইলো। সুলতানা তার বিবাহিত স্ত্রী না হয়েও মহল, হেরেম ও আবদুর রহমানের শয়নকক্ষে একক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো।

ইতিহাসও তার ব্যাপারে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছে,

'সুলতানার রূপ-সৌন্দর্য তার দেহে কুদরত যেন নিজ হাতে ভরে দিয়েছেন। এই মেয়ে যেমন সুন্দরী ছিলো তেমনি চতুর ও কুচক্রী ছিলো। কুটিল বুদ্ধি তার রগরেশায় পরিপূর্ণ হয়ে ছিলো। দারুন সৌখিন ছিলো। তেমনি ছিলো চঞ্চলা.....।

'নিজেকে এমন সুক্ষ্ম উপস্থাপনায় বাদশাহর সামনে তুলে ধরতো বাদশাহ তার পায়ে এসে প্রায় আছড়ে পড়তেন। এই অবাধ্য যৌবন আর অনাচারী রূপ আবদুর রহমানকে মালিকায়ে তরূবের জন্য পাগল দিওয়ানা করে রাখে।..........

রূপ-যৌবনের ব্যবহার সে এমন নিষ্ঠুরভাবে করতো যে, একবার আবদুর রহমান তাকে উপহার-উপঢৌকন হিসাবে এত বেশি দিরহাম দীনার দেন যে, খাজাঞ্চীও আর্তনাদ করে উঠে।'.....

'একবার শাহে উন্দুলুসের প্রতি অভিমান করে সে তার কামরার দরজা বন্ধ করে রাখে। এটা দেখে শাহ আবদুর রহমানের অবস্থা ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলো। তিনি তার কয়েকজন গোলামকে মালিকায়ে তরূবের কাছে পাঠান যে, তারা অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করে বাদশাহকে তার কামরায় আসার অনুমতি আদায় করে নিয়ে আসে। কিন্তু মালিকা কারো কথাই শুনলো না।'.....

'তখন বাদশাহর প্রধানমন্ত্রী ও দু'জন উপদেষ্টা তাকে পরামর্শ দিলো, এমন সাধারণ একটি মেয়ে এভাবে জিদ ধরে দরজা লাগিয়ে বসে আছে যে, বাদশাহর ইযযত সম্মানের প্রতিও সে ভ্রুক্ষেপ করছে না। তাহলে তো উচিত তার দরজার সামনে ইটের দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেযা। যাতে সে ভেতরেই দম বন্ধ হয়ে মরে যায়।'.....

'আবদুর রহমান এ পরামর্শ তো গ্রহণ করলেনই না, বরং যারা এ ধরনের পরামর্শ দিলো তাদের ওপর চটে উঠে হুকুম দিলেন, মালিকায়ে তরূবের দরজার সামনে দিরহামের থলে এমনভাবে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখো যেমন দেয়াল তোলার সময় ইট নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত গেঁথে দেয়া হয়। আরো হুকুম দিলেন, সবচেয়ে মূল্যবান মোতির স্তুপ যেন দরজার সামনে এনে ফেলা হয়।'.....

'তার হুকুম পালন করা হলো। আবদুর রহমান মালিকায়ে তরূবের দরজায় গিয়ে তাকে ডেকে বললেন, দরজা খুলে দেখো, তোমার দরজার সামনে কী? এসব ধনদৌলত সবই তোমার জন্য।'

দরজা খুলে গেলো। মালিকায়ে তরূব তো এই খেলার দক্ষ খেলোয়াড়। সঙ্গে সঙ্গে আবদুর রহমানের পায়ে আছড়ে পড়লো। তার হাতে চুমু খেলো। এমন ভাব দেখালো যেন সে বাদশাহর প্রেমে অন্ধ।'.....

অন্ধ তো হয়ে গেছে আবদুর রহমান। যিনি এটাও দেখলেন না মালিকায়ে তরূব আনলে কিসের প্রেমিক। সে বাদশাহের হাতে চুমু খেলেও প্রথমেই কিন্তু বাদশাহকে তার কামরায় নিয়ে গেলো না। আগে দিরহাম ও মোতির থলেগুলো কামরায় উঠিয়ে রেখে তারপর বাদশাহকে তার কামরায় নিয়ে গেলো।

✻✻✻✻✻

মহলজুড়ে কানাঘুষা চলতে লাগলো। হেরেমের মেয়েরা দাঁত দিয়ে পিষে পিষে তাদের আঙ্গুল দংশন করতে লাগলো। সবাই তো আবদুর রহমানকে অতি কঠোর লড়াকু বাদশাহ বলে জানতো। সে বাদশাহকে যে মেয়ে এভাবে তার গোলাম বানিয়ে নিয়েছে তার হাতে নিশ্চয় কোন জাদু আছে। তাকে কেউ কেউ জাদুকরও বলতে শুরু করলো।

সবচেয়ে বেশি পরাজয় ও হতাশা ফুটে উঠলো সেই তিন সুন্দরী পরিচারিকার চোখে মুখে, যাদেরকে আবদুর রহমান দৃষ্টির আড়াল হতে দিতেন না। সুলতানা এসে তাদের প্রাণপুরুষকে কেড়ে নিয়েছে।

সেদিন সুলতানা তাদের তিনজনকে তার কামরায় ডেকে পাঠালো। তিনজন বুক ভরা ঘৃণা নিয়ে তার কাছে গেলো।

'তোমরা আমার কাছে এসে বসো।' সুলতানা তাদের তিনজনকে একেবারে কাছ ঘেঁষে বসালো এবং বললো, 'আমি জানি, এখানকার সবাই আমার বিরুদ্ধে কানাঘুষা করছে। সেসব কিছু আমার কানেও পৌঁছে গেছে। কিছু তো তোমরাও বলেছো।'

তিনজনই থতমত খেয়ে গেলো। তাদের চোখেমুখে ভয়ের ছায়া নেমে এলো। ভয় হলো, সুলতানা এখন চাইলেই তাদেরকে হেরেম থেকে বের করে দিতে পারবে। শাহে উন্দলুস তার হাতের পুতুল। তাদের তিনজনের ব্যাপারে কতলের হুকুমও নিতে পারবে সে।

'তোমাদের চেহারা এমন ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করলো কেন?' সুলতানা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি আমাকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছো? মন থেকে এ ধরনের ভাবনা দূর করে দাও। আমিও তোমাদেরকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না, তোমরাও আমাকে তোমাদের শত্রু মনে করো না।'

'তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যার মনে শাহে উন্দলুসের ভালোবাসা আছে। আমরা চারজনই শাহে উন্দলুসের ভালোবাসার কথা এজন্য উচ্চারণ করি যে, তিনি একজন বাদশাহ। আজ যদি তিনি নিহত হন এবং তার সিংহাসনে

কোন বৃদ্ধ বসে যায়, তাহলে এই আমরা চারজনই তার প্রেম ভালোবাসায় বেহাল হয়ে যেতে থাকবো।'—

'তোমরা আমার শক্তি দেখে নিয়েছো। আমি কি না করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ও হেরেমের কোন মেয়ের বিরুদ্ধেই বাদশাহর কাছে কোন অভিযোগ করবো না। কারো বিরুদ্ধে তার কানও ভারি করবো না।'

তিন পরিচারিকার চেহারায় প্রাণ ফিরে এলো।

'মুদ্দাসসিয়া!' সুলতানা মুদ্দাসসিরা নামক পরিচারিকাকে বললো, 'শাহে উন্দলুস তোমাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। তুমি তার স্ত্রী। তোমার প্রতিও তিনি কম আসক্ত নন। কিন্তু তুমি কি এটা বিশ্বাস করো তার অন্তরে তোমার ভালোবাস আছে এবং তিনি শুধু তোমারই?'

'আসলে তিনি কারোই নন'। মুদ্দাসসিরা বললো, 'আমিও তার শুধু একলা স্ত্রী নই। আমাকে তিনি অন্যদের চেয়ে অধিক পছন্দ করেন বলে আমাকে বিয়ে করেছেন। এখন তুমি তার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দের। তাই'.....

'কিন্তু আমি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো না।' সুলতানা মুদ্দাসসিরার কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'বিয়ে ছাড়াই আমি তার কাছে থাকবো। তোমাদের তিনজনকেই আমি এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমরা আমাকে তোমাদের শত্রু মনে করো না। আমি বলেছি একজন নারী আমি। তাই কোন নারীর মন আমার দ্বারা পদপিষ্ট হতে দেবো না'.....

'এখন তার সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আমার প্রতি। এ থেকে এটা বুঝে নিয়ো না, তাকে আমি তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। এই মনোযোগ আমি তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেবো। আমার মনে এমন কোন ইচ্ছে নেই যে, তাকে একলা আমি দখল করে রাখবো। নিজেদের চেহারা থেকে হতাশা ও অভিমান ধুয়ে মুছে ফেলো।'

সুলতানা ওদের সঙ্গে আরো কিছু কথা বললো। ওরা তিনজন যখন তার কামরা থেকে বের হলো তখন তাদের দৃষ্টিতে সুলতানা মালিকায়ে তরূব বা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না আর। সে হয়ে গেলো তাদের সহমর্মী। তাদের সখি বা বান্ধবী।

❋❋❋❋❋

'এটা একেবারেই অবিচার, জুলুম। গতকালও যাদের জন্য আপনি পাগল-দিওয়ানা ছিলেন আজ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে আপনি শুধু আমার প্রেমেই মজে গেছেন।' মালিকায় তরূব একদিন আবদুর রহমানকে বললো,

'আপনি শুধু একজন পুরুষ নন, আপনি বাদশাহও। আপনার তো হৃদয়ের বাদশাহ হওয়া উচিত'

'কোন নারীর প্রতি এ জুলুম আমি সহ্য করতে পারবো না যে, তার প্রেম ভালোবাসাকে আপনি আস্তকুড়ে ছুড়ে মারবেন। আমি দুই তিন দিনের জন্য বিশেষ কাজে আমার জায়গীরে যাচ্ছি। আপনি মুদ্দাসসিরা, জারিয়া ও শিফাকে সেই প্রেম ও ভালোবাসা দিন যা আমার আসার আগে দিতেন। আর না হয় তাদের দীর্ঘশ্বাস আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।'

'না, সুলতানা!' আবদুর রহমান ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'আমি তো দু' তিন মুহূর্তও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না, আর তুমি দুই তিন দিনের কথা বলছো!'

'আমি আপনাকে এজন্য চাই না যে, আনি অনেক বড় বাদশাহ।' সুলতানা বললো, 'না আপনাকে এজন্য ভালো লাগে যে, আপনার কাছে সোনা, রূপা, হীরা জহরতের বড় বড় ভাণ্ডার রয়েছে। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে আপনাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু যখন কোন নারী আপনার কারণে দুঃখ পায় তখন আমার ভালোবাসা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। দু' তিন দিনের জন্য আমি এখান থেকে অনুপস্থিত থাকবো।'

সন্ধ্যায় তার জায়গীরে পৌঁছে গেলো সুলতানা। যাওয়ার আগে আবদুর রহমানকে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। যেন আবদুর রহমানকে ছাড়া সে মুহূর্তকালও বাঁচবে না।

তার নিরাপত্তার জন্য আবদু ররহমান নিজের বডিগার্ডও পাঠিয়ে দিলেন। এরা রাতে সুলতানার বাড়ির চারপাশে প্রহরা দেবে। ইউগেলিসও গারোয়ানের ছদ্মবেশে সুলতানার সঙ্গে এসে গেলো। তার প্রতি কারো কোন সন্দেহ হলো না।

'আমি মনে হয় সবদিক দিয়েই সফল।' সুলতানা ইউগেলিসকে বললো, 'আমি মোটেও ভাবিনি, এ লোক নারীর ব্যাপারে এতই দুর্বল যে, দুনিয়া আখেরাত সবই ভুলে যাবে।'

'মাথায় কোন নারী চেপে বসলে বড় বড় যুদ্ধবাজও হাতিয়ার উঠানোর যোগ্য থাকে না।' ইউগেলিস বললো, 'কোন নারী যদি কোন কাপুরুষের পিঠে হাত রেখে তাকে বলে, আমি তোমার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক, তাহলে সে কাপুরুষও অতি কঠিন যুদ্ধবাজকে হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য করে। উন্দলুসের বাদশাহকেও আমরা এভাবে বেকার করে ছাড়বো।'

ইউগেলিস তার পকেট থেকে ছোট একটি বাক্স বের করলো। সেটা খুলে সুলতানার সামনে রেখে বললো,

'সুলতানা! এই সামান্য নজরানা শাহে ফ্রান্স লুই-এর পক্ষ থেকে। তবে তোমার আসল 'এনআম' তোমার অপেক্ষায় আছে।'

'আমাকে আর কি করতে হবে?' সুলতানা জিজ্ঞেস করলো।

'এটাই যা তুমি করে যাচ্ছো। আমি তোমাকে সময়মতো সবকিছু বলে যাবো।'

'যে তিন পরিচারিকার জন্য আবদুর রহমান পাগলপারা ছিলেন ওদেরকে আমি হাত করে নিয়েছি। মহলে এখন আমার সঙ্গে কারো কোন শত্রুতা নেই। পুরুষদের মধ্য একমাত্র গায়ক যারিয়াব আছে যার ওপর শাহে উন্দলুস বলতে গেলে আশেক। দরবারে যারিয়াবের দারুন প্রভাব। বলতে গেলে তারই হুকুম চলে দরবারে। সে যা ইচ্ছা তা করতেও পারে এবং করাতেও পারে।'.....

'যারিয়াবের মধ্যে এমন এক অপার্থিব শক্তি আছে যে, সে যা কাউকে দিয়ে মানাতে চায় মানিয়ে নেয় সেটা। শাহে উন্দলুস যেন তার সামনে বাচ্চা বনে যান। আমাকে সে একটু ভিন্ন চোখে দেখে। আমি সে দৃষ্টি পড়তে পারি। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে, অন্যকে যে জাদুতে বশ করে সেও আমার জাদুর শিকার হয়ে যাবে।'

'একে আমাদের হাত করা জরুরি।' ইউগেলিস বললো, 'আর আরেকবার শুনে নাও সুলতানা! আবদুর রহমানকে মেরে ফেলা যাবে না। তার থেকে আমাদের ফায়দা উঠাতে হবে। তাকে ভোগবিলাসে মত্ত রাখো, বাকি কাজ আমরা করবো।'

'ইউগেলিস!' সুলতানা একটু ভারি গলায় বললো, 'আমার ব্যাপারে তোমাকে একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি। আমি কখনো কারো হাতের খেলনা হইনি। অন্যকে আমি আমার খেলনা বানিয়ে অভ্যস্ত। তুমি আমাকে এখনো বলোনি তোমাদের আসল পরিকল্পনা কী? তোমাদের চক্রান্তটা কি যেটার জন্য তোমরা আমাকে দিয়ে শিকড় উপড়ানোর কাজ করিয়ে যাচ্ছো।'.....

'আমার প্রতি কি তোমাদের কারো বিশ্বাস নেই? আমাকে দিয়ে তোমাদের চক্রান্ত সফল করে পরে আমাকেই ছুড়ে ফেলবেন এর কি নিশ্চয়তা আছে? আমাকে এসব মূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে খরিদ করার চেষ্টা করো না ইউগেলিস!'

'আমাকে বলা হয়েছিলো তুমি অনেক বুদ্ধিমান এবং সব ধরনের ইংগিত বুঝতে পারো।' ইউগেলিস বললো, 'আমার তো মনে হয় তোমাকে বেছে নিয়ে

আমি কোন ভুল করিনি। এখনো কি তুমি বুঝতে পারোনি আমাদের পরিকল্পনা ও চক্রান্তটা কী?.........

তোমার হয়তো মনে আছে, প্রথম সাক্ষাতে যখন তুমি আমার ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছিলে তখন আমি আমার পরিচয় দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার ধর্ম কি?.....আর ধর্মের ব্যাপারে তোমার চিন্তাভাবনা কি?'

'তুমি বলেছিলে ধর্মের ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ নেই। তোমার ধর্ম শুধু সম্রাজ্ঞী হওয়ার এক স্বপ্ন। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে আমরা সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবো। এখন কিছু দিন শাহ আবদুর রহমানের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো। উন্দলুসের মুসলিম শাসনের যখন পতন ঘটবে তখন এক অঙ্গরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবে তুমি। আর সেটা তোমাকে দেবেন শাহে ফ্রান্স।'........

'আমাদের মূল পরিকল্পনা হলো, এই দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। আমরা অতি গোপনে এক আন্দোলন শুরু করেছি। তুমি হয়তো জানো, যেখানে বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় সেখানে বাদশাহর সৈন্যরা ব্যাপক হত্যাকর্ম চালায়। বাদশাহ যদি যারিয়াবের মতো গায়ক ও তোমার মতো জাদু জাগানো সুন্দরীর মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে তাহলে তার সব ব্যবস্থাপনা দুর্বল ও বিশৃংখল হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়।.....

'তোমার কাজ এটাই হবে, শাহে উন্দলুসকে নিজের রূপ যৌবন দিয়ে বেঁধে রাখা। যখন তাকে জানানো হবে তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে তখনো যেন তিনি বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে না আসেন।.....আমি কি বলছি তুমি বুঝতে পেরেছো সুলতানা?.....

'আমরা আবদুর রহমানকে বাঁচিয়ে রাখবো ঠিক, কিন্তু তার ভেতরের অকুতোভয় লড়াকু যোদ্ধা ও দূরদর্শী নেতৃত্বদানের ক্ষমতাকে গলা টিপে মেরে ফেলবো। এটা সহজ কাজ নয়। এজন্য তোমার পুরস্কারও নির্ধারণ করা হয়েছে এত বেশি।—একটি রাজত্ব, যার রানী হবে তুমি।'

❋❋❋❋❋

ইউগেলিস কোন কাল্পনিক বা ঔপন্যাসিক চরিত্র নয়। ইতিহাসের অতি জলজ্যান্ত এক চরিত্র ইউগেলিস। স্পেন থেকে মুসলিম শাসন গুটিয়ে যাওয়ার এবং মুসলমানদের পতনের প্রথম সারির ভিলেন এই ইউগেলিস। কুদরত তাকে অসাধারণ মেধার অধিকারী করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দারুন পন্ডিত ছিলো সে। আরবী ভাষায়ও সে দক্ষতা অর্জন করে। পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞানও সে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়।

উন্দলুসের পাম্পুলুনা নামক স্থানে খ্রিষ্টীয় উপসনালয়ের এক পোড়াবাড়ি আছে। সেখান থেকে ইউগেলিস একটি বই সংগ্রহ করে। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ নিয়ে অনেক অর্থহীন ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা লেখা আছে। বইটি হাতে লেখা। এর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার ভিত্তিহীন ও বানোয়াট উদ্ধৃতিও দেয়া আছে। যে কারণে ভিত্তিহীন একটি বই মুর্খদের কাছে নির্ভরযোগ মনে হওয়ার সবরকম উপাদান তাতে ছিলো।

ইউগেলিস বইটির কয়েকটি কপি করালো। সেগুলো বিভিন্ন গির্জায় বন্টন করে দিলো আর পাদ্রীদেরকে বলে দিলো, তারাও যেন এগুলোর কপি তৈরী করিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়। এভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা, ভিত্তিহীন কথাবার্তা, আপত্তিজনক ও অশ্লীল মন্তব্য দেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে গেলো।

মুসলিম শাসক যাদেরকে ইসলাম আমীর বলে সম্মানিত করেছে। তারা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেদেরকে রাজা বাদশাহ বলতে লাগলো। তারা টেরই পেলো না, সারা দেশে ইসলাম ও সালতানাতে উন্দলুসের বিরুদ্ধে কী বিষ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

ইউগেলিস শহরের পর শহর ঘুরে ঘুরে শাহে ফ্রান্স পর্যন্ত পৌঁছে। সে ইসলাম ও ইসলামী সালতানাতের পতনকে তার জীবনের মিশন বানিয়ে নেয়। প্রতিটি গির্জায়, দেশের প্রতিটি শহরে অলিগলিতে এসব কথা শোনা যেতে লাগলো যে, খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে দিলে পরবর্তী প্রজন্মও মুসলমানদের গোলাম হয়ে থাকবে।

সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তারাই হয় যারা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে আত্ম সচেতন। মুসলমানদের ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গেছে। কারণ, তাদের শাসকরা নিজেদের ওপর মদ, নারী ও নর্তকীদেরকে সওয়ার করে নিয়েছে। সিংহাসন ও রাজমুকুটই এখন তাদের ধর্ম হয়ে গেছে। তারা তাদের জাতিকে এখন ধোকা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।'....

'মুসলিম জাতি থেকে তাদের লড়াকু মনোভাব ও সেই দৃঢ় সংকল্প-মনোবল দূর হয়ে যাচ্ছে, যার সাহায্যে তারা অর্ধেক দুনিয়ায় বিজয় কেতন উড়িয়েছিলো। এখন তাদের বাদশাহরা তাদেরকে সে অবস্থানে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আর কোন তারিক ইবনে যিয়াদের আবির্ভয়াব ঘটবে না। এই জাতি এখন বন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাদশাহী হবে খ্রিষ্টীয় জাতির। শাসন চলবে ক্রুশের।'

ইউগেলিস সুলতানা মালিকায়ে তরুবকে যে আন্দোলনের কথা বলেছিলো সেটা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে 'মুআল্লিদনি আন্দোলন' নামে। এর ইংরেজী নাম 'RENEGADES' এর অর্থ হলো, ধর্মের ব্যাপারে যারা দু'মুখী।

মুআল্লিদীন বা দু'মুখী ধর্মানুসারী সেসব খ্রিষ্টানকে বলা হতো, যারা কোন এক সময় মুসলমানদের আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরে ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য খ্রিষ্টধর্মে ফিরে যায়; কিন্তু প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। তুলাইতা, মুলয়কা ও কর্ডোভায় এদের সংখ্যা ছিলো বেশি।

ইউগেলিসের মতো যখন এসব দু'মুখী মুসলমানরা যোগ্য নেতা-লিডার পেয়ে গেলো তখন প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে মুসলমান রয়ে গিয়ে উন্দলুসের শিকড় কাটতে শুরু করলো।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, ওরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তো এবং সাধারণ মুসল্লীরা পাক্কা মুসলমান মনে করতো তাদেরকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা ইসলামের চরম শত্রু হয়ে খ্রিষ্টধর্মে ফিরে যায়।

ইউগেলিস তার আরেকজন সহযোগী পেয়ে যায়। সে হলো ইলিয়ার। দু'জনই প্রথমে এক খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক সিনেট জুওয়াইলিসের ছাত্র ছিলো। পরে ইবট্ স্পেয়ারান্দিয়ো এর মতো বিখ্যাত খ্রিষ্টান পন্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। স্পেয়ারান্দিয়ো ইসলামের বিরুদ্ধে অতি আপত্তিজনক একটি বইও লিখেন।

❋❋❋❋❋

সুলতানা মালিকায়ে তরূব তার জায়গীরে যাওয়ার সময় আবদুর রহমানকে বলে যায়, সে দু'তিন দিন ওখানে থাকবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে ওখানে গিয়েছিলো সেটা প্রথম দিনেই হাসিল হয়ে যায়। সেখানে সে এক রাতই থাকে। আর এটা হয়ে যায় তার জীবনের এক স্মরণীয় রাত।

ইউগেলিসের মুখের ভাষায় দরুণ আকর্ষণ রয়েছে। তার ব্যক্তিত্বেও ছিলো অন্যকে কাছে টানার মতো চমক জাগানো। তাই সুলতানার ভালো লেগে যায় তাকে। তা ছাড়া ওকে যে খুশি রাখাও দরকার এটাও সে বুঝে গেছে। কারণ, এত বড় চক্রান্তের মূল হোতা তো ইউগেলিসই। তার হাত ধরে সে একটি অঙ্গরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হতে যাচ্ছে।

কিন্তু সুলতানা লক্ষ্য করেছে, ইউগেলিস তার দিকে সেই দৃষ্টিতে তাকায় না যে দৃষ্টিতে কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকায়। কিংবা আবদুর রহমানও যে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানোর পর তাকে কিনে নিয়েছেন।

রাতে ইউগেলিস সুলতানার বাড়িতেই রইলো। তাকে জানালো, ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতে সে বেরিয়ে যেতে চায়। ইউগেলিস তাকে বললো,

'সুলতানা! জল্লাদের তলোয়ার আমার মাথার ওপর ঝুলে আছে। প্রতিটি মুহূর্ত আমার মৃত্যুভয়ে কাটে। বাইরে তোমার শাহী মুহাফিজ প্রহরায় দাঁড়িয়ে। ওরা যদি আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে তো সূর্যোদয়ের আগেই আমার গর্দান কেটে নেবে। এজন্য আমি বিয়ে করিনি। কোন মেয়েকে আমি বিধবা ও সন্তানদেরকে এতিম করতে চাই না। আমার মিশনের জন্য আমি আমার সব আবেগ পায়ে পিষে দিয়েছি।'

রাতে সে পৃথক কামরায় ঘুমালো। মাঝরাতের খানিক পর তার চোখে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলো। তার চোখ খুলে গেলো। বিদ্যুৎ-বেগে কোমরবন্দ থেকে খঞ্জর বের করে ফেললো। সুলতানা না বললে পর মুহূর্তেই খ র তার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে যেতো।

'কেন? কি হয়েছে? কি খবর এনেছো?' ইউগেলিস ঘাবড়ে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।'

'কিছু হয়নি। তোমার যৌবনের আবেগ জাগাতে এসেছি ইউগেলিস!' সুলতানা তার বিছানায় আধশোয়া হতে হতে তার গলা ধরে বললো, 'যে কথা তুমি বলতে পারোনি সেটা আমি জানি। নিজেকে এভাবে জ্বালিয়ো না।'

ইউগেলিস জোর করে হাসতে চেষ্টা করলো, তারপর বিষণ্ন গলায় বললো,

'আমাকে সেসব পুরুষদের কাতারে দাঁড় করিয়ো না সুলতানা! যারা কোন নারীর সংস্পর্শে আসাটাকে জীবনের শেষ গন্তব্য বলে মনে করে। তুমি আমার যে আবেগকে জাগিয়ে তুলতে এসেছো সেটা জেগে উঠলে জেগে উঠবে আমার শরীর। কিন্তু মরে যাবে আমার প্রাণ। আমার নিজের শারীরিক ব্যাপারে যেমন কোন আগ্রহ নেই, তোমার শরীর নিয়েও আমার কোন আকর্ষণ নেই।'

সুলতানা এমনভাবে দূরে সরে গেলো যেন ইউগেলিস তাকে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

'আমাকে কি তোমার যোগ্য মনে করো না ইউগেলিস?' সুলতানা এমন সুরে জিজ্ঞেস করলো যেন এখনো ব্যাপারটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'তুমি যদি যোগ্য না হতে তাহলে আমি তোমাকে এমন ভয়াবহ এক কর্মতৎপরতার সঙ্গে জড়াতাম না।' ইউগেলিস নরম গলায় বললো, 'তোমাকে আমি শাহী মহলে পাঠাতাম না। তোমাকে আমি স্থান দিয়েছি আমার হৃদয়ে, আমার আত্মায়। আমি তোমার ইবাদত করবো। আর যার ইবাদত করা হয় তাকে পবিত্র মনে করা হয়। আমি তোমাকে পবিত্রই রাখবো।

'এ কথাটাই আমি তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছি। নারীকে যে শারীরিকভাবে বা তার মন-মানসে সওয়ার করে নিয়েছে সে তার উদ্দেশ্যে খুব কমই সফল

হয়েছে। সে তখন পশু হয়ে যায়। তার সাফল্য ও শীর্ষ চূড়ায় পৌছার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এটাই সেই দরজা যা আমি শাহে উন্দলুস আবদুর রহমান ছানীর সামনে বন্ধ করে রাখতে চাই।

'আমি যদি দেহের রূপ ও যৌবনরসের আকর্ষণে আসক্ত হয়ে যাই তাহলে নিজের অজান্তেই এই মহান লক্ষ-উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাবো; যার জন্য আমি আমার জীবনের সব চাওয়া পাওয়া বিসর্জন করে দিয়েছি।'

'সত্যিই তুমি মহান।' সুলতানা আবেগরুদ্ধ হয়ে ইউগেলিসের হাতদুটো তার ঠোঁটে ছুঁইয়ে বললো, 'তুমি আমার কাছে যে ত্যাগ চাইবে সেটাই আমি তোমাকে দেবো, তোমার এই মহত্ত্বের দাম আমি যে কোন মূল্যে দেবো।'

সুলতানা কামরা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

*****

পরদিনই সুলতানা আবদুর রহমানের মহলে পৌঁছে গেলো। আবদুর রহমান কল্পনাও করেননি সুলতানা পরদিনই ফিরে আসবে। সুলতানা তার গলা পেচিয়ে বললো,

'আপনাকে ছাড়া একটি রাত কাটানোও কঠিন হয়ে গিয়েছিলো। আমি এখন আপনার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে পারবো না।'

সুলতানার এই মন পাগল করা অভিনয় ও তার দেহের রসালো গন্ধ আবদুর রহমানকে বেহুশ করে দিলো।

এক রাতে সুলতানা দরবারের গায়ক যারিয়াবকে তার কামরায় ডেকে আনলো। আবদুর রহমানকে তখন তার প্রিয় পরিচারিকা ও স্ত্রী মুদ্দাসসিরার কাছে রেখে এসেছে।

'তোমার আওয়াজে জাদু আছে যারিয়াব।' সুলতানা চোখে মাদকীয়তা এনে যারিয়াবের চোখে চোখ রেখে বললো, 'আর এটাও আমি অনুভব করি, আমাকে যখন তুমি দেখো তখন তোমার আওয়াজ আরো সুরেলা হয়ে যায়।'

'এটা কি অন্যায়?' যারিয়াব হেসে জিজ্ঞেস করলো।

'না; সুলতানা বললো, তুমি আমাকে আসলে আচ্ছন্ন করে ফেলেছো। তোমার এই নেশাতুর চোখ থেকে যেন সুরের তরঙ্গ ঠিকরে বেরোতে থাকে।'

শাহে উন্দলুস আবদুর রহমানের এক খাস জিনিস সুলতানা, এটা জানা থাকায় যারিয়াব প্রথমে একটু দ্বিধান্বিত ছিলো। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর যখন সে সুলতানার কামরা থেকে রোরোলো তখন সে বিশ্বাস করতে শুরু করলো,

সুলতানা আবদুর রহমানের না, সুলতানা তার। তারই প্রেম-ভালোবাসা সুলতানার হৃদয়রাজ্যে ঝড় তুলছে।

সে রাতের পর থেকে তাদের গোপন সাক্ষাৎ চলতে লাগলো।

কয়েক দিন পর সুলতানা আবদুর রহমানকে বললো, মহলের এই চার দেয়ালের বাইরে কয়েক দিন তার জায়গীরে গিয়ে থাকতে চায়। আর ক্লান্তি দূর করতে যারিয়াবকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায়। তার স্বাস্থ্যহানির আশংকার কথা আবদুর রহমানকে এমনভাবে জানালো যে, আবদুর রহমান বিলম্ব না করে তাকে যারিয়াবের সঙ্গে রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

রাতে জায়গীরে ইউগেলিসও এসে গেলো। আর যারিয়াব তো আগেই তার সঙ্গে এসেছে। যারিয়াব সুলতানার প্রেমে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলো। তার সব চিন্তার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠলো সুলতানা। সুলতানা এটাক কাজে লাগালো। আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে তার মনে ঘৃণা উস্কে দিলো। সুলতানা কয়েকবারই যারিয়াবকে বলেছে,

'যারিয়াব! আমরা আসলে অন্যের হাতের পুতুল। তোমার সুর কিনে নেয়া হয়েছে। আমার রূপ বিক্রি হয়ে গেছে। না তুমি পালাতে পারবে, না আমার জন্য কোন পালানোর পথ আছে। আর পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? মাটির অতল থেকেও ধরে নিয়ে এসে জল্লাদের হাতে তুলে দেবে।'

সুলতানা আকারে ইংগিতে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের দু'জনের মুক্তির পথ তৈরী করা হচ্ছে। ইউগেলিস নামের এক খ্রিষ্টান এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছে। এতে সফল হতে পারলে সুলতানা একট রাজ্যের মালিক হবে। যারিয়াব হবে সে রাজ্যের সবকিছু।

সেদিনই সুলতানার জায়গীরে ইউগেলিসের সঙ্গে যারিয়াবের পরিচয় হলো। সুলতানা যারিয়াবকে এমন আগলে আগলে রাখতে লাগলো যেমন মা তার একমাত্র সন্তানকে আগলে রাখে।

যারিয়াব শুধু গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞই ছিলো না। বরং অসম্ভব মেধা, প্রতিভা ও বিজ্ঞতাও ছিলো তার। কিন্তু সুলতানা চুম্বকের মতো তার ধ্যান মনকে দখল করে নেয়। কিছু অপূর্ণতা থেকে থাকলে ইউগেলিস সেটা পূর্ণ করে দিলো। যারিয়াব নির্দ্বিধায় তার হাতের খেলনা হয়ে গেলো।

'ওদের জীবনাচরণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি স্বভাব বদলে দাও।' ইউগেলিস যারিয়াবকে বেশ কিছু কথা বলার পর বললো, 'যে জাতি নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যায় সে জাতি বেশি দিন বেঁচে থাকে না। তারা স্বাধীনও থাকতে পারে না এবং কোন দেশ শাসন করারও যোগ্য থাকে না।.....

'আমি জানি, এতে সময় লাগবে। কয়েক বছর লেগে যাবে। কিন্তু কোন জাতিকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দিতে এর চেয়ে উপযুক্ত কোন উপায়ও নেই। এর বিপরীতে আমরা যদি শাহে উন্দলুসকে যুদ্ধের ময়দানে চ্যালেঞ্জ করে বসি তাহলে আরব থেকে কাতরে কাতারে সৈন্য এসে যাবে। তাই শাহে উন্দলুস আবদুর রহমানকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা সম্ভব নয়।'

ইউগেলিস ও সুলতানা কথায় কথায় যারিয়াবকে দরবারী গায়ক থেকে এক রাজ্যের রাজা ও সুলতানাকে তার রানী বানিয়ে দিলো।

সুলতানা যারিয়াবকে তার জায়গীরে তিন দিন আতিথ্য দান করলো। তার জায়গীরটি সুসজ্জিত কয়েকটি বাগানে পরিবেষ্টিত হয়ে অতি মনোগ্রাহী জায়গায় পরিণত হয়েছে। এই তিন দিন সেসব বাগানেই তাদের অধিক সময় কাটলো।

যারিয়াব যখন শাহী মহলে ফিরে এলো তখন তার চিন্তা ভাবনা, স্বপ্ন-বিশ্বাস এমনকি তার আচার আচরণও পাল্টে গেলো। তার সুর আগের চেয়ে আরো মনকাড়া হয়ে উঠলো।

সুলতানা তার চেষ্টায় যারিয়াবকে আবদুর রহমানের ওপর আগের চেয়ে আরো কয়েকগুণ বেশি সওয়ার করে দিলো। সুলতানার মতো আবদুর রহমানের দৈনন্দিন জীবনে যারিয়াবও বিশাল অংশ দখল করে নিলো।

❋❋❋❋❋

সময় যেমন অতি দ্রুত বয়ে চলছে তেমনি ইউগেলিসি, সুলতানা ও যারিয়াবের সমন্বিত 'মাটি ফোড়া' মিশনও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে।

এক রাতে শাহে উন্দলুসের প্রধানমন্ত্রী হাজিব আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ সঙ্গে দু'জন লোক নিয়ে সিপাহসালার–প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর বাসভবনে গিয়ে হাজির হলেন।

উবাইদুল্লাহ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাদেরকে বসালেন। হাজিব আবদুল করীম তাকে কোন ধরনের লোক-সৌজন্যতা দেখাতে নিষেধ করলেন।

'উবাইদ!' হাজিব সেনাপতিকে বললেন, 'এই দুজন লোককে চেনো?' তার সঙ্গে আসা লোক দু'জনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, কেন নয়?' উবাইদুল্লাহ জবাব দিলেন, 'এরা আমাদের গোয়েন্দা ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। গোপন সব তথ্য উদ্ধার করে আনে।'

'তাহলে শোনো, এরা কি খবর নিয়ে এসেছে?' হাজিব দু'জনকে রিপোর্ট শোনাতে ইংগিত করলেন।

'মহামান্য সিপাহসালার!' তাদের একজন বললো, 'কর্ডোভার সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে, তুলায়তা, মুলায়কা ও বার্সিলোনা রাজ্যগুলোতে খ্রিস্টানরা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা অতি গোপনে সেসব মুসলমানদেরকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে যারা কিছুদিন আগে খ্রিষ্ট ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিলো। এরা দু'মুখো সাপ।'

'এই দু'মুখোরা আমাদের সঙ্গে নামাযও পড়ে।' আরেকজন গুপ্তচর বললো, 'আবার পর্দার আড়ালে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিগগিরই এরা মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াবে। ওদের এটাও জানা আছে, সংখ্যায় ওরা যত বেশিই হোক, আমাদের সেনাবাহিনীর সামনে বেশি দিন টিকতে পারবে না। কিন্তু ওরা প্রাণপাত করার শপথ নিচ্ছে।'

এরা আরো জানালো, শাহ লুই এই বিদ্রোহের পালে হাওয়া দিচ্ছেন। আর খ্রিষ্টান অঙ্গরাজ্য গোথাক মার্চের রাজা ব্রেন হার্ট উন্দলুসের সীমান্ত এলাকায় হামলা চালিয়ে যতটা পারে ততটা এলাকা দখল করে নেবে।

এই গোয়েন্দারা নওমুসলিম খ্রিষ্টানদের ছদ্মবেশ ধরে খ্রিষ্টানদের দলে ঢুকে পড়ে। তারপর তাদের গোপন তৎপরতার খুঁটিনাটি বের করে নিয়ে আসে। তারা আরো জানায়, ইউগেলিস নামের এক খ্রিষ্টান এই বিদ্রোহের পেছন থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বিদ্রোহের আগুন কয়েক জায়গাতেই লাগার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়ার খবর আগেই পেয়ে যান প্রধানমন্ত্রী হাজিব আবদুল করীম। তিনি শাহে উন্দলুস আবদুর রহমানকে এ ব্যাপারে সাবধান করতে চাইলে তিনি সেটা মোটেও গুরুত্ব দেননি।

'উবাইদ ভাই।' হাজিব সেনাপতিকে বললেন, 'আমাদের আমীর ও বাদশাহ যদি নিজের দেশ সম্পর্কে এমন বেপরোয়া হয়ে যান তাহলে আমাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? আমরাও কি এমন বেপরোয়া হয়ে যাবো?'

'না, কখনো না,' সেনাপতি উবাইদুল্লাহ বললেন, 'উন্দলুসের এই পবিত্র মাটি আবদুর রহমানের নয়। এটা সেই স্বাধীন বীর মুক্তি সেনাদের জমি, যারা আরব থেকে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। তারা তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের সন্তানদের কাছে ফিরে যাননি।

এটা আমাদের ও সালতানাতে ইসলামিয়ার দুর্ভাগ্য যে, উন্দলুসের শাসকরা এক খান্দান ও এক গোত্রের পরিত্যজ্য সম্পদ হিসাবে একে আঁকড়ে ধরে আছে। একে নিজেদের পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকার সম্পদ মনে করছে।'.....

'এরা শাহী খান্দান বনে গেছে। তাদের এ দেশর মাটি ও এদেশের মানুষের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। তাদের সব আগ্রহ-আকর্ষণ বাদশাহী ও ভোগবিলাসী জীবনেই সীমাবদ্ধ। দেশের আসল শত্রু তো এই শাসক শ্রেণীই, যারা তোষামোদকারীদের বেষ্টনীতে বসে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।.....

'এটা আমাদের পালনীয় কর্তব্য, দেশকে কুফরীর করালগ্রাস থেকে বাঁচানো। বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের খবর আমিও পাচ্ছিলাম। আজ তুমিও সেটার সত্যায়ন করলে। আমার পরামর্শ মতো চললে আমাদের দু'জনেরই আবদুর রহমানের কাছে যাওয়া উচিত।'

'আমার মতামতও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তিনি তো মালিকায়ে তরূব ও গায়ক যারিয়াবের দখলে রয়েছেন এখন। এরা তো জিন ভূতের চেয়েও ক্ষমতাবান। ওরা এমন এক দেয়াল তুলে রেখেছে যে, ওতে আমরা দু'জন প্রবেশ করতে পারবো না।'

'চেষ্টা করবো দেয়াল ফুড়ে ঢুকতে। বললে এখনই যাওয়া যায়।' উবাইদুল্লাহ দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন।

❋❋❋❋❋

হাজিব ও উবাইদুল্লাহ তাদের দুই গুপ্তচর নিয়ে আবদুর রহমানের মহলে চলে গেলেন।

আবদুর রহমানকে খবর দেয়া হলো প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি কোন বিশেষ কাজে দেখা করতে এসেছেন। এটা শুনেই সুলতানা মালিকায়ে তরূব বেরিয়ে এলো। গায়ে তখন তার এমন সংক্ষিপ্ত পোষাক যে, তাকে উলঙ্গ বললে অপরাধ হবে না। তার চোকে মুখে অসন্তুষ্টি আর বিরক্তি।

'আপনারা কি দিনের বেলা দরবারে উনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?' সুলতানা প্রজা শাসনের গলায় বললো, 'তিনি এই মাত্র যারিয়াবকে ডাকিয়েছেন। এসময় শাহে উন্দলুস দেখা করতে পারবেন না।'

'আমাদের এখনই উনার সঙ্গে দেখা করতে হবে।' উবাইদুল্লাহ তাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আমরা হুকুম গ্রহণ করবো তার কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে নয়। তাকে গিয়ে বলো তার সঙ্গে দেখা না করে আমরা এখান থেকে যাবো না।'

'আর আমিও আপনাদের দু'জনকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেবো না।' সুলতানা ঘাড় বাঁকা করে এক রোখা কণ্ঠে বললো।

'এমন অপমানের পরও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?' হাজিব উবাইদুল্লাহকে বললেন।

'আমি এখানে দাঁড়য়ে থাকবো না। কিন্তু ফিরেও যাবো না। ভেতরে যাবো। হেরেমের এক মেয়ে মুখে মুখে সম্রাজ্ঞী বনে বসে আছে। ওর মতো ছুড়ির সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিতে আমার কিছুই যায় আসে না।' সেনাপতি উবাইদুল্লাহ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

শাহে উন্দলুসের খাস কামরা থেকে যারিয়াবের সুরের গুঞ্জরণ ভেসে আসছে। এই গুঞ্জরনের ভেতর থেকে আবদুর রহমানের আওয়াজ ভেসে এলো।

'সুলতানা! কোথায় গেলে! ওদেরকে বলো কাল আসতে।'

উবাইদুল্লাহ আর দেরি করলেন না। আবদুর রহমানের কামরায় চলে গেলেন। হাজিব আবদুল করীমও তার পেছন পেছন গেলেন। এর পেছনে কামরায় ঢুকলো সুলতানা। আবদুর রহমান আধশোয়া হয়ে আছেন। চোখ দুটি নেশাকাতর–অর্ধ খোলা।

'শাহী মহলের আদব সম্পর্কে কি ওদের জানা নেই?' সুলতানা রাগত কণ্ঠে বললো।

'কোন জরুরি কথা হবে হয়তো সুলতানা!' আবদুর রহমান আচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি রেগে যেয়ো না। এসো, আমার পাশে বসো।'

তারপর হাজিব ও উবাইদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'আরে, এমন কোন কেয়ামতের বিভীষিকা নেমে এসেছে যে, তোমরা রাতটা পার হওয়ার অপেক্ষা করলে না? তোমাদেরকে বলাও হয়েছে, আমি এখন দেখা করতে পারবো না, তারপরও ভেতরে এসে গেলে! তোমরা কি তোমাদের পদাধিকার ও অবস্থানের কথা ভুলে গেছো?'

'হ্যাঁ, আমীরে উন্দলুস!' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমরা আমাদের পদ মর্যাদা ও অবস্থানের কথা ভুলে গেছি। এই পবিত্র ভূমির বিজয়ী বীর সেনানীরা এখানে কোন পদ মর্যাদা ও সম্মান লাভের স্বার্থে এদেশ জয় করেননি। যেসব শহীদরা এই এলাকায় আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপরাজেয় ঝাণ্ডা উড়াতে গিয়ে নিজেদের রক্ত ঢেলে শহীদ হয়েছেন তারা প্রতিদানে কি পেয়েছেন?......

'এর প্রতিদান কি এটাই যে, এক অর্ধ উলঙ্গ রক্ষিতা শহীদদের এই পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে এক সালার ও এক ওযীরকে হুকুম দেয়– তোমরা এখান থেকে চলে যাও?'

'উবাইদুল্লাহ!' আবদুর রহমান আচ্ছন্নতা ভেঙ্গে প্রায় গর্জে উঠে বললেন, 'কি হয়ে গেছে তোমার? তুমি কি বলছো এসব?'

তিনি আধশোয়া থেকে সটান উঠে বসলেন। তার নেশাতুর চোখ পুরোপুরি খুলে গেলো। যারিয়াবের গান বাদ্যও নীরব হয়ে গেলো। সুলতানা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত পিষছে। আবদুর রহমানের চেহারা রক্তবর্ণা হয়ে উঠলো। না, ক্রোধের বর্ণ নয় এটা। এটাই তার প্রকৃত পুরুষালী বর্ণ।

তার দৃষ্টি উবাইদুল্লাহ, হাজিব, যারিয়াব ও সুলতানার ওপর একে একে ঘুরে এলো। যেন আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে সবাইকে দেখছেন। তার দৃষ্টি ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে এলো।

❃❃❃❃❃

'তোমরা দু'জন কি বসবে না?' আবদুর রহমান হাজিব ও উবাইদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন এবং যারিয়াব ও সুলতানাকে বললেন, 'তোমরা দু'জন পাশের কামরায় গিয়ে বসো। মনে হচ্ছে কোন জরুরি ব্যাপার ঘটেছে। না হয় এরা দু'জন এভাবে আসতো না যেমন আজ কোন অনুমতি ছাড়া ভেতরে চলে এসেছে।'

তার কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

যারিয়াব ও সুলতানা চলে গেলো। উবাইদুল্লাহ ও হাজিব বসে পড়লেন।

আবদুর রহমান যেভাবে যারিয়াব ও সুলতানার সামনে ক্ষমাপ্রার্থনা ভঙ্গি করলেন সেটা প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিকে হতভম্ব করে দিলো। তারা একে অপরের দিকে তাকালেন। যেন চোখে চোখেই ঠিক করে ফেললেন, আজ চূড়ান্ত কথা বলে যেতে হবে।

'বলো, কি কথা তোমাদের?' আবদুর রহমান বললেন।

'আপনাকে খলীফা উন্দলুসের আমীর নির্বাচিত করেছেন, উবাইদুল্লাহ বললেন, 'কিন্তু দরবারের স্বার্থান্বেষীরা, তোষামোদকারীরা এবং পা চাটা চামচারা আপনাকে শাহ উন্দলুস বলতে শুরু করেছে। আর আপনিও বাদশাহ হয়ে বসে আছেন।'

'তুমি কি বলতে চাও উবায়েদ!' আবদুর রহমান বাদশাহী মেজাজে বললেন, 'তুমি নিজেকে সবসময় যুদ্ধের ময়দানে রেখে কথা বলো। তোমার চিন্তা ভাবনা ও সব কিছুর মধ্যেই লড়াই বেঁধে থাকে। তুমি কি শান্ত হয়ে সে কথাটা বলতে পারো না যেটা বলতে এসেছো এই গভীর রাতে।'

'না, শান্ত হয়ে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই আমি।' উবাইদুল্লাহ প্রায় ধমকে উঠলেন, 'যেদিন আমার চিন্তা ভাবনা থেকে লড়াই দূরে সরে যাবে সেদিন আপনার সিংহাসনের নিচ থেকে মাটি সরে যাবে। উন্দলুসের আকাশ থেকে খসে পড়বে ইসলামী ঝাণ্ডা। নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যাবে আযানের পবিত্র সুরধ্বনি।'....

'সালাররা দরবারী লোক হয় না। সালার সিংহাসন ও রাজমুকুটের জন্য মোহগ্রস্ত থাকেন না।.....সালারের জায়গা হলো রণাঙ্গন।.....কুফুরের বিরুদ্ধে রণাঙ্গন।'

'রণাঙ্গন বাতিলের বিরুদ্ধে,.....আপনিও এক সালার-সেনাপতি। রণাঙ্গনের সিংহ আপনি। কিন্তু আপনাকে জাগাতে হয়েছে আমাদের এসে। শুধু এ কারণে যে, আল্লাহর তলোয়ার আপনি সিংহাসনের নিচে ছুড়ে দিয়েছেন।'.....

'গান, নৃত্য আর নারীর রূপযৌবনে গড়ে উঠা বেহেশতে মগ্ন হয়ে পড়েছেন আপনি। আপনি তো মেধা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা এবং বিজ্ঞতায় অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু এক রূপসী ও সুরতরঙ্গকে আনি আপনার ওপর চুম্বকের মতো লেপ্টে রেখেছেন। যা আপনাকে এই বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে যে, যে বেহেশতে আপনি মজে আছেন সেটাই দোযখের প্রধান দরজা।'

'কিন্তু ঘটনা তো এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। হাজিব আবদুল করীম বললেন, 'যে জাহান্নামের দিকে উবাইদুল্লাহ ইংগিত করেছে তাতে বাদশাহ একাই যান না। বাদশাহর পাপ পুরো জাতিকে সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। বাদশাহর অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হয় পুরো জাতিকে। শত্রুর ব্যাপারে যে বাদশাহ অসচেতন থাকেন সে বাদশাহর অধীনস্থ জাতির ভাগ্য লিখে দেয়া হয় শত্রুর গোলামি।'

'আপনার মাথা থেকে সিংহাসন ও রাজমুকুট দূরে সরিয়ে রাখুন আমীরে মুহতারাম!' সালারে আলা উবাইদুল্লাহ বললেন, 'এখন তো সাধারণ মানুষ আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে যাচ্ছে। কিন্তু কাল আপনার ফৌজই আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠবে।'

'বিদ্রোহ?' আবদুর রহমান হয়রান ও হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের বিদ্রোহ? কোন ফৌজ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে? আমি তো জানি না কিছুই। আমাকে বলো। খুলে বলো।'

'আপনি এজন্য জানেন না যে, আপনার চোখ ও কান এই দরবারীরা বন্ধ করে রেখেছে।' হাজিব বললেন, 'আপনার চোখে তাকেই দেখেন যে আপনাকে তোষামোদ করে এবং বাস্তবতা থেকে আপনার চোখ অন্য দিকে সরিয়ে রাখে।

ঐ সুন্দরী পরিচারিকারা, এই নয়া রক্ষিতা, আর আপনার সুকণ্ঠী যারিয়াব আপনার ভেতরের সিংহ পুরুষকে হত্যা করে ফেলেছে। এটা বীর বিক্রম আর অদম্য সিংহ পুরুষদের পবিত্র ভূমি। আপনি শুধু এর আমীর নন, আমীন–বিশ্বস্ত রক্ষকও।'

'না হাজিব!' আবদু রহমান ঘাবড়ানো গলায় বললেন, 'সুলতানা আমাকে ধোকা দিতে পারে না। যারিয়াব আমার অকৃতজ্ঞ হতে পারে না।'

'আমরা আপনার ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলছি না আমীরে মুহতারাম!' আপনাকে কেউ ধোকা দিক, আর কেউ আপনার অকৃতজ্ঞ হোক, এতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমরা ইসলামী সালতানাত উন্দলুসের কথা বলছি। আমরা বাতিলের সেসব নষ্ট পূজারীদের কথা বরছি যারা সালতানাতে ইসলামিয়া উন্দলুসকে ধোকা দিচ্ছে। আর যারা আল্লাহর সেই পবিত্র শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে বেঈমানী করছে তাদের কথা বলছি। কথাগুলো একটু মনযোগ দিয়ে শুনুন আমীরে মুহতারাম।'

উবাইদুল্লাহ দুই গোয়েন্দা কমান্ডারকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তাদেরকে বললেন, আমীরে উন্দলুসকে বিস্তারিত রিপোর্ট শোনাও। তারা বিস্তারিত শোনালো। হাজিব ও উবাইদুল্লাহ সেই রিপোর্টে আরো বর্ধিত অংশ যোগ করলেন।

আবদুর রহমান অনেকটাই জেগে উঠলেন।

❋❋❋❋❋

পাশের কামরায় সুলতানা ও যারিয়াব বসে রাগে-ক্রোধে দাঁতে দাঁত পিষছিলো। সুলতানা বেশ কিছুক্ষণ আবদুর রহমানের খাস কামরায় কান লাগিয়ে ভেতরের কথাবার্তা শুনে ফেলে।

'ঐ গোঁয়ার লোক দুটি তো ওকে জাগিয়ে তুলছে।' সুলতানা যারিয়াবকে বললো, 'ওরা যদি একবার ওকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে। আমরা ব্যর্থ হয়ে যাবো।'

'ইউগেলিস বলেছিলো, বিদ্রোহ করার সবকিছুই প্রস্তুত হয়ে গেছে। ওদিকে ফ্রান্সের শাহ লুই-এর মদদে বার্সেলোনা ও গোথাক মার্চের দিক থেকেও হামলার দিনক্ষণ করা ঠিক হয়ে গেছে। এটা ওরা টের পেয়ে গেছে। তাই ময়দানে নামার হুকুম নিতে এসেছে।'

'ইউগেলিসকে সতর্ক করে দিতে হবে যে, উন্দলুসের সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠেছে।' যারিয়াব বললো, 'সঙ্গে যে দু'জন লোক এসেছে এরা মনে হয় গোয়েন্দা।'

'হ্যাঁ, এরা বড় বড় গোয়েন্দা। ওদেরকে খতম করে দেয়া জরুরী।' সুলতানা বললো।

যারিয়াব বুদ্ধিমান লোক। সে বাঁধা দিয়ে বললো–

'কতল করে কোনই লাভ হবে না। ওদের স্থলে আরো দু'জন এসে যাবে। এদের চেয়ে ভালো ও যোগ্যরাও তাদের শূণ্যস্থান পূরণ করতে পারে। এদেরকে আমরা লোভ দেখিয়ে এমনভাবে ব্যবহার করবো যে, প্রকাশ্যে এরা সরকারি গুপ্তচর হয়ে থাকবে, আর গোপনে ইউগেলিসের হয়ে কাজ করবে। এরা সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ধোকা দিতে পারবে অনায়াসে।'

'ওদেরকে রাজি করানো গেলে পুরস্কারস্বরূপ হেরেম থেকে সুন্দরী দুটি মেয়েও ওদেরকে দিতে পারবো। এ পুরস্কার ওদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখবে।' সুলতানা বললো।

সুলতানা আবার দরজায় কান লাগালো। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

'ফ্রান্সীস কাউন্ট এ্যাবলুস ও কাউন্ট ইসনিয়ারস পাম্পালুনার ওপর ফৌজি হামলা চালিয়েছে।' উবাইদুল্লাহ আবদুর রহমানকে বলছিলেন আর সুলতানা তার যারিয়াব কান লাগিয়ে শুনছিলো, 'আপনাকে বলা হয়েছিলো, এই ফৌজ ফিরে যাচ্ছিলো। সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার স্থানীয় মুসলমান ও মুসলমানদের যে ছোট সেনা ইউনিট ছিলো তার ওপর হামলা চালায় ওরা।'.....

'তাদের ওপর অকথ্য নির্যয়াতন চালায়। অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে যয়। তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এখন বার্সেলোনা থেকে হামলার সমূহ আশংকা রয়েছে।'

'তোমরা এ ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করেছো?' আবদুররহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে ওখান থেকে ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে নাও। দেখো, এ খবরগুলো কতটা সঠিক? সংবাদ ভুলও তো হতে পারে।'

'আমার ও হাজিব আবদুল করীমের নিরাপত্তা আপনার হুকুম বাস্তবায়ন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আপনার বর্তমান হুকুম তো এমনই হবে যে, গোয়েন্দা দূত পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা এখানে মন্ত্রী আর সেনাপতির গদিতে আরামে বসে থাকো। আমাদের অধীনস্ত লোকেরা আমাদেরকে সালাম করতে থাকবে।'

'কিন্তু আমীরে মুহতারাম! আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে মোটেও কার্পণ্য করবো না!। আমাদেরকে কেউ ধোকাও দিতে পারবে না। শত্রুর ব্যাপারে আপনি যদি এমন শিথিল মনে চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে আমরা আপনার হুকুম না

নিয়েই দুশনের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেবো, যা ইসলাম ও উন্দলুসের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জরুরি মনে করা হবে।'

'আপনি আমাদেরকে আপনার শাহী মহল ও সিংহাসনের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করবেন না.....শত্রু সবসময়ই শত্রু। তার বন্ধুত্বও শত্রুতা।.....আমরা সীমান্ত এলাকায় সৈন্য তৎপরতা শুরু করতে চাই। এর নেতৃত্ব থাকবে আমার হাতে। আমরা আপনার কাছে যা চেয়েছি তা আমাদেরকে দিয়ে দিন।'

'কাল সকালে আমি তোমাদেরকে বিস্তারিত জানাবো।' আবদুর রহমান বলরেন, 'আজ একটু ভাবতে দাও।'

'কাল সকালে আমরা রওয়ানা হয়ে যাবো।' আবদুর রহমান বললেন, 'অর্ধেক ফৌজ কর্ডোভায় থাকবে। এর নেতৃত্বে থাকবে হাজিবের হাতে। আপনি তো জানেন হাজিবও একজন দক্ষ সালার। আমার অনুপস্থিতিতে এখানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে এর বিরুদ্ধে হাজিব ফৌজকে ময়দানে নামাবে।'

'আমি আমীরে মুহতারামকে এটা জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করছি যে, আমার ব্যবস্থাপনা কিন্তু খুব ভদ্রোচিত হবে না।' হাজিব আবদুর রহমানকে বললেন, 'আমি বাতিলের সেই পূজারীদের খতম করে দেবো, যারা লোক দেখানো মুসলমান হয়ে পর্দার আড়ালে ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এরা মুআল্লিদীন–দু'মুখী সাপ। আমি এদেরকে রক্তে গোসল করিয়ে এদের লাশ ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবো।'

সুলতানা তখনো দরজায় কান লাগিয়ে রেখেছে। তার কানে আবদুর রহমানের আওয়াজ পৌঁছালো।

'তোমরা দু'জনে প্ল্যান প্রোগ্রাম–পরিকল্পনা ঠিক করো। এজন্য যত সেনা প্রয়োজন তাদেরকে প্রস্তুত করে নিয়ে যাও।'

উবাইদুল্লাহ ও আবদুল করীম কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলো।

'ওরা চলে গেছে।' সুলতানা যারিয়াবকে বললো, 'ওদেরকে শাহে উন্দলুস হুকুম দিয়ে দিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় সৈন্য নিয়ে যেতে।'

'আমরা তো আর ওদেরকে বাঁধা দিয়ে রাখতে পারবো না,' যারিয়াব হতাশ গলায় বললো। 'আর খেয়াল রেখো সুলতানা! শাহ উন্দলুসকে এটা বুঝতে দিয়ো না যে, আমরা তার ফয়সালায় খুশি নই। কথা আমাকে বলতে দিয়ো।.....আগামীকাল ইউগেলিসকে খবর পাঠিয়ে দিয়ো। সেই ভালো জানে এ অবস্থায় তাকে কি করতে হবে।'

'এর দ্বারা এটাও জানা হয়ে গেলো, শাহে উন্দলুসের ওপর আমাদের প্রভাব এখনো পুরোপুরি কাজ দেয়নি"।' সুলতানা বললো, 'তার ভেতরের মুসলমানি সত্বা এখনো মরেনি।'

আবদুর রহমান তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনে সঙ্গে সঙ্গে কামরায় ঢুকে পড়লো। সুলতানা আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলো, সালারে আলা ও ওযীর কেন এসেছিলেন। আবদুর রহমান তাদেরকে সব কথা বলে দিলেন।

'জিন্দাবাদ শাহে উন্দলুস!' যারিয়াব বড় আওয়াজে বললো, 'আপনি ফৌজকে কোচ করার হুকুম দিয়ে অনেক বড় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ওরা সেই কাফেরের গোষ্ঠিকে পিষে মারবে। ইতিহাসে আপনার পবিত্র নাম সোনার হরফে লেখা থাকবে।'

সুলতানা আবদুর রহমানের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গাল তার গালের সঙ্গে লাগিয়ে বললো,

'আমাদের শাহে উন্দলুস মুমিন পুরুষ এবং স্বাধীনচেতা বীর পুরুষ। আপনার এই স্বাধীনচেতা ও পুরুষোচিত মনোভাবের কারণেই আমি আপনার শিষ্য হয়ে গেছি। আমি আপনার মতোই এক মুসলিম বাপের মেয়ে। আমার তো ইচ্ছে করে তলোয়ার হাতে নিয়ে আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জিহাদের ময়দানে চলে যেতে।'

'তুমি কেন যাবে?' আবদুর রহমান তাকে নিজের কোলে বসিয়ে বললো, 'তোমার ওপর আমার পুরো ফৌজ কুরবানী করতে পারবো।'

শাহে উন্দলুস আরেকবার বাস্তব দুনিয়া থেকে অচিন জগতে হারিয়ে গেলেন।

❋❋❋❋❋

যার দেশের জন্য ভালোবাসা আছে। নিজের ধর্মের জন্য দায়িত্ববোধ আছে। সে নিজেকে যেমন চিনে তেমন তার শত্রুকেও চিনে। তারা নিজেরাও শান্তি ও নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না, শত্রুকেও দু'দণ্ড শান্তিতে বসে থাকতে দেয় না। ইউরোপীয়ানদের অবস্থাও এমনই।

তাদের বুকে অর্থাৎ স্পেনে যখন মুসলমানরা ইসলামী ঝাণ্ডা গেড়ে বসেছে তখনই তারা শঙ্কিত হয়ে উঠে যে, ইসলাম সারা ইউরোপে না আবার ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন থেকে তারা নিজেদের ওপর আরাম হারাম করে নেয়। তারা উন্দলুসের সীমান্ত এলাকাগুলোয় হামলা চালাতে শুরু করে। সীমান্তের মুসলিম জনপদগুলো তাদের ধ্বংসলীলার শিকার হতে থাকে।

উন্দলুসের সেনাবাহিনী তাদেরকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে, জবাবী হামলা চালাতে গিয়ে নিজেদের সৈন্য সংখ্যা কমাতে থাকে। এসব দেখেও মুসলিম শাসক শ্রেণীর লোকেরা পরম আরামে হেরেমের জীবনে গা ভাসিয়ে দেয়। শত্রুকে বন্ধু ভাবতে শুরু করে।

তবুও প্রত্যেক যুগেই কিছু স্বাধীন বীরপুরুষ আল্লাহ্ তাআলা পাঠিয়ে দেন, যারা ইসলামের পড়ন্ত ঝাণ্ডাটি অতি দৃঢ়-দামাল হাতে সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় তুলে ধরে। এদের মধ্যে একজন সালার উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বালান্সী এবং আরেকজন হলেন হাজিব আবদুল করীম।

তাদের অধীনে কিছু ঈমানদীপ্ত প্রাণপুরুষও ছিলো যারা তাদের শাসকদের ভোগবিলাসের জীবনে মত্ত দেখে নিজেদের দায়িত্ব পালনের সামান্যতম ত্রুটি করেনি।

সালারে আলা– প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহ রাতে রাতেই তার সেনা ইউনিটগুলোর কমান্ডার ও পদস্থ কর্মকর্তা ও সহযোগীদের ডেকে তুললেন। তাদেকে জরুরি গলায় জানালেন, সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। এ থেকে আমদের মনযোগ সরানোর জন্য আমাদের সীমান্ত এলাকায় দুশমন হামলা চালাচ্ছে।

'প্রচণ্ড এক ঝড় আমাদেরকে লণ্ডভন্ড ও ধ্বংস করে দিতে উঠে আসছে"।' সালারে আলা উবাইদুল্লাহ সবার উদ্দেশ্যে বলতে শুডরু করলেন, 'এটা ঠিক যে সৈন্যদের যে কোন হুকুম মানতে হয়। পাহাড়, পর্বত, নদী-সমুদ্র, উত্তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে যেখানেই তাদেরকে যেতে নির্দেশ দেয়া হয় সেখানে তাদের যেতে হয়। লড়তে হয়। অকুণ্ঠ চিত্তে প্রাণ দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা তো অন্যান্য জাতির সৈনিকদের থেকে একেবারেই ভিন্নতর।'.....

'তারা পবিত্র এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লড়াই করে। কোন ব্যক্তি মানুষ, কোন খান্দান বা গোষ্ঠির শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা লড়াই করে না। একমাত্র আল্লাহর শাসন মানবজাতির হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর সৈনিকরা লড়াই করে। আমরা তো পবিত্র কুরআনের সেই হুকুমের ওপর অটল থেকে লড়াই করি যে,

'যে পর্যন্ত কুফরের কর্মতৎপরতার মূলোৎপাটন না হবে সে পর্যন্ত তোমাদের ওপর অবিরাম জিহাদ ফরজ।'.....

'নিজেদের সৈনিকদের মনে এ কথাটা ভালো করে গেঁথে দাও যে, উন্দলুসের পূর্বপুরুষ বীর সেনানীরা এখানে যে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলো তা জীবন্ত রাখতে হবে। তাদেরকে বলবে; এই পবিত্র মাটি সেসব শহীদ আত্মাদের আমানত যারা খুব স্বল্প সংখ্যকের একটি দল হয়ে এখানে এসেছিলো। তারপর তাদের নৌযানগুলো পুড়িয়ে ফেলে। যাতে কারো মনে ফিরে যাওয়ার কল্পনাও না আসে।....

'আজ আমাদের প্রয়োজন এমন হার না মানা জযবা– ঈমানদীপ্ত চেতনার। আর আমি যে সব কথা তোমাদেরকে বলছি তা তোমাদের সৈনিকদেরকে বলো আর না বলো, নিজেরা গভীর মনে শুনে রাখো, কিছুকাল ধরে খলীফার পক্ষ থেকে উন্দলুসে এমন আমীর নিযুক্ত হচ্ছে যারা নিজেদেরকে বাদশাহ বলতে পছন্দ করেন। এটা তো অনৈসলামিক রীতি-নীতি। ইসলামে কোন রাজা-বাদশাহ নেই।'.....

'কিন্তু আমাদের ওপর এমব বাদশাহ চেপে বসেছেন, যিনি আল্লাহ ও রাসূলের নাম নেন ঠিক, কিন্তু তার প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও রাসূলের বিধি বিধানের পরিপন্থী। তিনি হেরেমও আবাদ করেছেন। যাতে অতি রূপসী কালনাগিনী প্রতিপালিত হচ্ছে। আমাদের বর্তমান আমীরও তেমন।'.....

'আমি জানি, তোমাদের অনেকর মনে এই অনুযোগ রয়েছে, নিজেদের আমীরের চেহারাখানি কোন দিন দেখোনি। তিনি নিজে কখনো এসে দেখেননি, তোমাদের কি অবস্থা? তোমরা এখানে কেমন আছো?

'তোমাদের অনেকেই হয়তো জানো, আমদের আমীর গান-বাদ্য ও ভোগ-বিলাসে ডুবে আছেন। হয়তো এ কারণে কারো মনে এটাও আসতে পারে, নিজেদের আমীর যখন এমন তাহলে আমাদের জানবাজি রেখে, যখমী হয়ে লড়াইয়ের কী দরকার?'

'এমন ভাবনা মনে আসলে তা ঝেটিয়ে দূর করে দাও। এটা আল্লাহর রাজত্ব। কোন বাদশাহ বা আমীরের নয়। তোমরা এর আমীন–বিশ্বস্ত রক্ষক। প্রত্যেককে যার যার কবরে গিয়ে শুতে হবে, বাদশাহকেও তারই নির্ধারিত কবরে নামানো হবে। আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে দেশে কুরআনের শাসন চলে সেখানে কোন এক ব্যক্তি বা তার খান্দানের জায়গীর হয় না, সেটা সে দেশের জনগণের সবার দেশ। আমাদের সবার দেশ। আমাদেরকে বাদশাহর সামনে না, আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে.....

'এজন্য মুসলমান কোন রাজা-বাদশাহ, আমীর উমারা, সালার, সিপাহসালার বা কমান্ডারদের জন্য লড়াই করে না। মুসলমান লড়াই করে একমাত্র আল্লাহর পথে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। মুসলমান লড়াই করে বিজয়ের জন্য। পরাজয়ের জন্য মুসলমান লড়ে না। পরাজয়ের চেয়ে মুসলমানের কাছে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ।'

'নারায়ে তাকবীর–আল্লাহু আকবার।' উপস্থিত সবার ধ্বনিত শ্লোগানে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেলো।

উবাইদুল্লাহ সালার ও কমান্ডারদেরকে হুকুম দিলেন ফজরের পরেই সেনাদল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে।

❋❋❋❋❋

কোচ করার গতি ছিলো অতি তীব্র। তাই সূর্যোদয়ের আগেই ফৌজ শহর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আবদুর রহমানের ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি তার সচিবকে ডেকে বললেন, প্রধান সেনাপতিকে যেন পয়গাম পাঠানো হয়, শাহে উন্দলুস ফৌজকে বিদায় জানাতে ফৌজের সঙ্গে কিছু দূর এগিয়ে যাবেন।

'ফৌজ শহর থেকে বেরিয়ে গেছে শাহে উন্দলুস!' সচিব জবাব দিলো। 'বাইরে প্রধানমন্ত্রী আবদুল করীম আপনার অপেক্ষায় আছেন।'

'তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' আবদুর রহমান হুকুম দিলেন।

হাজিব ভেতরে আসতেই আবদুর রহমান একটু ক্ষুণ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

'উবাইদুল্লাহ কি এতটুকু অপেক্ষা করতে পারলো না যে, ফৌজ আমাকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে যাবে?'

'না, আমীরে মুহতারাম?' হাজিব আবদুল করীম নির্বিকার ভঙ্গিতে বলরেন, 'দুশমন এটা কখনো দেখে না যে, তাদের বিরুদ্ধে যে ফৌজ আসছে তারা কি তাদেরকে বাদশাহকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে এসেছে কি না। এখন সেলামী প্রথা পালনের সময় না আমীরে উন্দলুস! এর চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব হলো, কর্তব্য পালনের ডাকে সাড়া দেয়া।'

'তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছো, রাষ্ট্রীয় সব নিয়ম কানুন ও প্রথা-প্রচলন উঠে যাবে?' আবদু রহমান বিরক্ত গলায় বললেন।

'মহান আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিয়মনীতি আমাদেরকে দিয়েছেন তাই বহাল থাকবে। আর মানব রচিত সব নিয়মকানুন, প্রথা-প্রচলন রহিত হয়ে যাবে। আমরা দাবী করবো ইসলামী সালতানাতের আর তাতে চলবে সব অনৈসলামিক কার্যকলাপ তা তো চলতে দেয়া যাবে না।' হাজিব আবদুল করীম এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন।

আবদুর রহমান যেন কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। তারপর হাজিবের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের বিদ্রোহ বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

সীমান্ত এলাকায় পাম্পালুনা নামক একটা জায়গা আছে। কিছু দিন আগে এর ওপর ফ্রান্সীয় দুই কাউন্ট হামলা করে এবং শহর ও গ্রামে লুটপাট চালায়।

তারা অনেক মুসলমানকে বন্দি করে ওদের সঙ্গে নিয়ে যায়। তারপর তাদের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের মতো আচরণ করে। গাঁধার মতো খাঁটায়।

উবাইদুল্লাহ অল্প কয়েক দিনেই পাম্পালুনা পৌঁছে গেলেন। সেখানকার স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে সীমান্তের বাইরের এলাকাগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। তিনি জানতে পারলেন, সীমান্ত এলাকার সঙ্গে একেবারে লাগোয়া অবস্থায় খ্রিস্টানরা কেল্লা গড়ে তুলেছে। এই কেল্লার পরিবেষ্টন যে মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য এটা বুঝতে সময় লাগলো না উবাইদুল্লাহর।

উবাইদুল্লাহ আবদুর রহমানের কাছ থেকে এ অনুমতি নেননি যে, তিনি সীমান্ত ছেড়ে এর বাইরে গিয়ে শত্রু সীমানায় হামলা চালাবেন। প্রয়োজন মনে করলে ওখানে গিয়ে হামলা চালাবেন এ মর্মে কোন অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি উবাইদুল্লাহ।

উবাইদুল্লাহ যখন তার ফৌজ নিয়ে সীমান্ত এলাকা পাড়ি দিলেন তখন মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে স্থানীয় গাইড ছিলো। সে তাদের শত্রু সীমান্তের সবচেয়ে বড় কেল্লার দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। চলার গতি দ্রুত থাকায় রাতের শেষ প্রহরে সেখানে পৌঁছে গেলো মুসলিম সেনাবাহিন।

সেখানে পৌঁছেই কেল্লা অবরোধ করে ফেললো উবাইদুল্লাহর সেনাদল। অবরোধ কাজ পূর্ণ হতেই 'মিনজানীক' দ্বারা কেল্লার ভেতর পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের জ্বলন্ত তীরও কেল্লার ভেতর ছুড়তে শুরু করলো। মিনজানীক ও জ্বলন্ত তীর আরবদের এমন হাতিয়ার ছিলো যা শত্রুপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতোই, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আতংকও ছড়িয়ে দিতো।

অপরাধী খ্রিষ্টানরা কেল্লার ওপর থেকে বৃষ্টির মতো তীর ছুড়তে শুরু করলো। কিন্তু উবাইদুল্লাহর সৈন্যরা যেমন চাঙ্গা মনোবলে উদ্দীপ্ত ছিলো, কমান্ডাররাও ছিলো ক্রোধের আগুনে উত্তপ্ত। ওরা তীর বৃষ্টির মধ্যেই কেল্লার ফটকের দিকে দৌড়ে যেতো এবং তীর খেয়ে খেয়ে আহত হতো। এভাবে চললো কিছুক্ষণ।

তারপর একবার কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিক তীর বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফটকের দিকে ছুটে গেলো এবং দশ বারটা কুড়াল দিয়ে দরজার ওপর আঘাত করতে করতে দরজা ভেঙ্গে ফেললো। তার পর বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো।

মুসলিম সেনারা বাঁধভাঙ্গা জলোচ্ছাসের মতো ভেঙ্গে ফেলা ফটক দিয়ে ভিতরে চলে গেলো। সামনের কয়েকজন অবশ্য শত্রুর ছোড়া তীর আর বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে গেলো। কিন্তু পুরো মুসলিম সেনাদল তাদেরকে টপকে খুনী খ্রিষ্টানদের ওপর পাহাড়ের মতো ভেঙ্গে পড়লো।

এরপর যা হলো তা হলো, উবাইদুল্লাহ ফৌজ যে লড়াইয়ে যোগ দিলো তা ছিলো এক কথায় ইসলাম ও উন্দলুসের দুশমনদের পাইকারি দরে হত্যা।

মুসলিম কয়েদিরা এই কেল্লাতেই ছিলো। তাদের পায়ে লোহার কড়া দিয়ে রেখেছিলো নরপিশাচের দল। রাতে এই কড়ার সঙ্গে শিকল বেঁধে দেয়া হতো। তাদেরকে পশুর খোয়াড়ে রাখতো। তাদের সবাইকে মুক্ত করা হলো।

তারপর অন্যান্য কেল্লাগুলোও এভাবে অবরুদ্ধ করা হলো। অবশ্য সে কেল্লাগুলো ছোট ছোট ছিলো। একে একে কেল্লাগুলো বালুর স্তুপের মতো মাটিতে ধ্বসে গেলো।

উবাইদুল্লাহ যখন তার সেনাদের নিয়ে ওখান থেকে ফিরতি পথ ধরলো, তখন দুশমনদের বসতিগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো এবং কেল্লাগুলো থেকে ধোয়া উঠছিলো।

❃❃❃❃❃

উন্দলুসের পবিত্র মাটি বিদ্রোহ আর ষড়যন্ত্রের এক কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠলো। একের পর এক শাসক দাফন হতে লাগলো আর তাদের স্থলে খলীফার পক্ষ থেকে নতুন নতুন শাসক নিযুক্ত হতে লাগলো।

ওদিকে খেলাফতের গদিতে নতুন নতুন খলীফার পালাবদল ঘটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোতে চক্রান্ত আর বিদ্রোহ দ্বিগুণ আকারে দানা বাঁধতে শুরু করলো।

উন্দলুসের শাসকরা তো মূলতঃ খলীফার পক্ষ থেকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু তারা নিজেদরকে বাদশাহ বলতে লাগলেন। ইসলামের মহান পয়গাম তারা সিংহাসনের নিচে ছুড়ে মারেন। সেসব শহীদদের ভুলে যান যাদের রক্তের বিনিময়ে সালতানাতে ইসলামিয়া উন্দলুসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো।

বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র মূলতঃ পরাজিত খ্রিষ্টানরাই করছিলো। আর তাদেরকে মদদ যোগাতে থাকে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান অঙ্গরাজ্যগুলো। কিন্তু এ কারণে ওদেরকে গালমন্দ করা উচিত হবে না। ওরা তো ঘোষণাই দিয়েছে, ইউরোপ থেকে ইসলামকে ঝেটিয়ে বিদায় করেই তারা দম নেবে।

তারা একে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এভাবেই উন্দলুস অদৃশ্য এক যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হলো।

এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্দলুসের আমীর উমারাদের প্রথম ফরজ কর্তব্য তো ছিলো, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করা। ইসলামের প্রচার প্রসারে সর্বাধিক মনোযোগ ঢেলে দেয়া। কিন্তু তারা তাদের নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করলো। পরিণামে কি হলো?

একজন শাসক মরতেই উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে যেতো। গদিতে তো বসতো একজন। আর তার আপন সন্তান, চাচাতো ভাই বোন, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা তার নিচ থেকে মাটি সরানোর ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে যেতো।

এই সুযোগে উন্দলুসের দুশমনরা সীমান্ত এলাকায় বিশৃংখল ও অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়। দেশের ভেতরে বিদ্রোহ দানা বাঁধা শুরু করে। কিন্তু দরবারী তোষামোদকারীরা তাদের বাদশাহকে রিপোর্ট দেয়, 'সবকিছু ঠিক আছে।' এভাবে তার চোখ, কান ও বিবেক বুদ্ধির ওপর পর্দা ফেলে রাখে তোষামাদকারীরা।

পুরস্কারস্বরূপ এসব তোষামোদকারীরা অনেকে শাসকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। কথার জাদুতে তারা শাসকদেরকে বশ করে রাখে। শাসকরা তাদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেয়। যেখানে বসার নূন্যতম যোগ্যতাও তাদের থাকে না। কারণ, দেশের প্রতি আন্তরিকতা, চিন্তা ভাবনার গভীরতা, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এসব কিছুই তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

মুখে মধু, অন্তরে বিষ এই যোগ্যতাই তাদের পদ প্রাপ্তির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা হতো।

ইতিহাস লেখকনরা মোটা দাগের জিনিসগুলো দিয়েই ইতিহাস রচনা করেছে। পূর্বপুরুষরা যারা তোষামোদকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তারা পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি এই জুলুমও করে গেছে যে, তাদের রচিত ইতিহাসে এমন কোন কথা, এমন কোন তথ্য বা ঘটনা খুব কমই লিপিবদ্ধ হতে দিয়েছে যা শাসকদের বিরুদ্ধে যায়।

উন্দলুসের কিছুটা সঠিক ইতিহাস লাতিন ভাষায় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় কিছু ঐতিহাসিকও সেসব খ্রিষ্টানদের উল্লেখ করতে গিয়ে সঠিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন যারা উন্দলুসে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সবসময় চক্রান্ত করে গেছে।

প্রসঙ্গক্রমে তারা উন্দলুসের সেসব বীর সেনানীর ইতিহাসও লিপিব্ধ করেছে যাদের আত্মত্যাগে উন্দলুসে ইসলামী শাসন ছিলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জানা যায়, উন্দলুসের শাসকদের বিরুদ্ধে অতি সংগোপনে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের আগুন সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি ছড়ায় আবদুর রহমান ছানী ইবনে আলহাকাম এর শাসনামলে।

আবদুর রহমান তার দরবারে সবচেয়ে ভয়ংকর মানুষ যাকে রাখেন সে হলো সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক যারিয়াব। ইতিহাস তার ব্যাপারে লিখেছে,

'যারিয়াব তার গানবাদ্য যখন কর্ডোভার দরবার কক্ষে উপস্থাপনা করলো তখন সেখানে শুধু তার ভক্তই ছিলো না, সমালোকচকও ছিলো। কিন্তু তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না, যখন তারা দেখলো, যারিয়াব আবদুর রহমানের মন মানসে স্থায়ী আসন গেড়ে ফেলেছে এবং আবদুর রহমান তার একান্ত শিষ্য বনে গেছেন। .....

গান বাদ্য ছাড়াও মুখের ভাষায় জাদু ও মধু প্রয়োগে যারিয়াবের সমতুল্য সে যুগে কেউ ছিলো না।.....

'তার সৃজনশীল শক্তি ও অসাধারণ যোগ্যতা শুধু সঙ্গীত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না। পোশাক আশাকের ক্ষেত্রেও তার উদ্ভাবনী রুচি ছিলো। নানান ধরনের বিভিন্ন রঙের কাপড়ে বিচিত্র কারুকাজ করা এবং মেয়েদের জন্য এমন সুক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের উদ্ভাবন করে যারিয়াব যে, সেগুলো পড়লে শরীরের ভাঁজগুলোও দেখা যেতো। সে মুসলিম সমাজের বিনোদনের জন্য অনেক কিছুই আবিষ্কার করে। যা কেবল অমুসলিমদেরই সংস্কৃতির অংশ ছিলো।.....

'উন্দলুসের মুসলিম সোসাইটিতে আরবদের কৃষ্টি কালচারের প্রাধান্য ছিলো। কিন্তু যারিয়াব তাদের মধ্যে নতুন কালচারের বিপ্লব ঘটায়। আরবদের মতো মুসলমানরা মাথায় লম্বা চুল ও মুখে লম্বা দাঁড়ি রাখতো। যারিয়াব এমন 'লাইফ ষ্টাইলের প্রচলন ঘটালো যে, লোকে চুল কেটে ইউরোপীয়ানদের মতো 'টেরিকাট' রাখতে লাগলো এবং দাড়িও ছাটতে শুরু করলো।

এ ছাড়াও নারীদের জন্য বহু ধরনের ফ্যাশনের প্রচলন করে যারিয়াব। এর মধ্যে কিছু ছিলো সরাসরি উলঙ্গপনার নামান্তর।

❋❋❋❋❋

'জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারিয়াব ছেয়ে যায়। এমনকি মানুষের বাসস্থান, ঘরবাড়ি, দালানকোঠাতেও আধুনিকতার ছাপ এনে দেয় যারিয়াব। বিচিত্র রকমের সুগন্ধিও আবিষ্কার করে। তার কথাবার্তা, বিভিন্ন উক্তি জনশ্রুতি ও জনরোলে পরিণত হয়।

তার মন-মস্তিষ্ক সব সময় নতুন পরিকল্পনা, নতুন আবিষ্কারের চিন্তায় বিভোর থাকে। এসব কারণে বহু মানুষ তার একেবারে শিষ্য হয়ে যায়। কেউ বলতো, ওর প্রতি বুযুর্গ, মনীষী এবং আধ্যাত্মিক পুরুষদের আশীর্বাদ আছে। যারা স্বপ্নযোগে তাকে এই বিচিত্র আবিস্কারের উপাদান দিয়ে গেছেন।.....

কেউ কেউ বলে, তার অনুগত জিন বা অশরীরি কেউ আছে। যাদের কাছ থেকে সে এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। আর না হয় বাদশাহ এমন উন্মাদের মতো কারো গোলাম হতেন না.....

'কি আমীর উমারা, কি সাধারণ মানুষ যারিয়াবের প্রভাব সবার ওপরেই ছিলো। বাদশাহ তো যেন তার 'আশেক' ছিলেন। যারা সরাসরি বাদশাহর কাছে যেতে পারতো না, তাদের জন্য একমাত্র ভরসা ছিলো যারিয়াবই।

এর কারণে যারিয়াব সব আলেম, কামেল, পন্ডিত, মন্ত্রী, সচিব হাকিম, শাহজাদা, শাহজাদী এবং দরবারীদের অতি প্রিয় এবং 'গুরু' বনে গিয়েছিলো। আবদুর রহমান তো তাকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার পদমর্যাদা দান করেন।'.....

'যারিয়াব নিজে কারো প্রতি দুর্বল ছিলো না। একমাত্র মালিকায়ে তরূব সুলতানা ছাড়া। সুলতানা যখন প্রথমে তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করলো তখন দেখা গেলো, যারিয়াব আগে থেকেই সুলতানার প্রতি আসক্ত হয়ে আছে। তার মাথা নত হলে তা হতো একমাত্র সুলতানার সামনে। তার এই অন্ধ প্রেম-ভালোবাসার পেছনে ছিলো ইসলামের ভয়ংকর দুশমন ইউগেলিসের হাত। যারিয়াব সেটা বুঝতে পারেনি। অবশ্য একসময় সুলতানাও ধীরে ধীরে যারিয়াবের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে।'.....

'আবদুর রহমান কখনো অনুভবই করেননি, যে সুলতানা তার সবচেয়ে প্রিয় রমণী, সে যারিয়াবকেই ভালোবাসে। তার সঙ্গে শুধু ভালোবাসার অভিনয় করে।'

সুলতানার এই ভালোবাসার পেছনে যে মুসলমানদের অনেক বড় শত্রু ইউগেলিসের হাত রয়েছে, যারিয়াব সেটা বুঝতে পারেনি।

❋❋❋❋❋

আবদুর রহমানের রাজ দরবারে প্রচলিত সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিনোদন এমনকি স্থাপত্যত্ত নির্মাণশৈলীতে ও যারিয়াব আবিস্কৃত বিপ্লবের ছোঁয়া তখন এসে গিয়েছিলো।

আবদুর রহমানের সালারে আলা উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ তখন পাম্পালুনা অঞ্চলে খ্রিষ্টান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছিলেন।

ইতিমধ্যে উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ দুই ফ্রান্সীয় কাউন্টকে চরমভাবে পরাজিত কেরেছেন। যারা উন্দলুসের পাম্পালুনা অঞ্চলে হামলা করে লুটপাট চালিয়েছিলো।

তিনি তার কাজ শেষ করে ফিরতি পথ ধরলেন। কিন্তু ফেরার ব্যাপারে তাড়াহুড়াও করলেন না। ফিরতি পথের ডান বাম ও আশেপাশের এলাকার অবস্থা দেখভাল করতে করতে আসছিলেন।

এসব এলাকার অধিকাংশই পাহাড়ি ও বন্য। উবাইদুল্লাহর জানা আছে, এসব এলাকার জায়গায় জায়গায় খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের আস্তানা রয়েছে। যেখানেই

তার সন্দেহ হলো সেখানেই তিনি ওদের অড্ডাখানা আবিস্কার করে করে সমূলে ধ্বংস করে দিতে লাগলেন।

এসব ছোটখাটো অপারেশনে থাকায় রাজধানীতে ফেরাটা তার বেশষ ধীরগতির ছিলো।

প্রধান সেনাপতি যে এখনো ফিরে আসছেন না রাজধানী কর্ডোভায়, এ নিয়ে যেন আবদুর রহমানের কোন মাথা ব্যথাই ছিলো না। তবে প্রধানমন্ত্রী হাজিব আবদুল করীম ও এক সালার আবদুর রউফের পেরেশানী-দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়তেই থাকে। অবশ্য তারা পত্রদূত পাঠিয়ে খবরাখবর নিতে থাকেন।

'আমার তো আশংকা হচ্ছে, আমীর আবদুর রহমান এই সালতানাতকে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবেন না।' একদিন সালার আবদুর রউফ হাজিব আবদুল করীমকে বললেন, 'এর কি কোনই প্রতিকার নেই?'

'আমরা আমীর আবদুর রহমানকে হত্যা করাতে পারি।' আবদুল করীম বললেন, 'আমরা যারিয়াব ও সুলতানাকেও হত্যা করাতে পারি। কিন্তু ওতে অবশেষে লাভটা কি হবে? আবদুর রহমানের খান্দানের কেউ একজন তার সিংহাসনে বসে যাবে। তারপর তো এ রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যাবে, হত্যা করো আর গদি দখল করো। ধীরে ধীরে খেলাফত দুর্বল দুর্বল হতে ভেঙ্গে যাবে এবং একদিন এর নাম নিশানাও মিটে যাবে। তাই আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।'

'আমি তো আমীরে উন্দলুস আবদুর রহমানকে একটা কথা বলতে চাই,' সালার আবদুর রউফ ক্ষোভ মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'তাকে বলবো, রাজত্ব করো আর ইসলামের নাম বেঁচা ছেড়ে দাও। তিনি তো আমাদেরকে ধোকাই দিচ্ছেন। কারুকার্যময় সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করাচ্ছেন। কুরআন শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলছেন। এটা কি পাপ নয়?'

'এখন আমি বুঝতে পারছি। সালতানাতে উন্দলুস শুধু দুর্বলই নয় একে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে।' হাজিব আবদুল করীম বললেন, 'শাসকরা যখন সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক ও তোষামোদকারীদের মায়াবী ভাষার জালে আটকে পড়েন তখন সালতানাতের খুঁটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একেবারে শেকড় থেকে'

'দুর্বল শত্রুরাও ধীরে ধীরে বড় যুদ্ধশক্তিতে পরিণত হয়। আর আবদুর রহমানের মতো শাসকরা নিজেদের চরম শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার হীন পথ-পদ্ধতি বের করতে থাকে। কারণ, তাদের সিংহাসন ও ক্ষমতার নিরাপত্তা এর মধ্যেই তারা নিহিত দেখতে পায় যে, দুশমনকে শক্তিশালীর মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে বলবে, এসো আমরা বন্ধু হয়ে যাই। আর পরস্পরের বিরুদ্ধে আমরা তলোয়ার উঠাবো না।'.....

'আবদুর রউফ! তোমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাও। পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। হতে পারে তোমাদের রেখে যাওয়া অবদান, অক্লান্ত পরিশ্রম, রক্তাক্ত পদক্ষেপ, ঈমানদীপ্ত জযবা তাদের জন্য পথের আলোকবর্তিকা হবে।'

'আজ যদি তোমরা যারিয়াবের আমদানী করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিতে ডুবে যাও তাহলে তোমরা তোমাদের সন্তান ও তাদের আত্মজদের প্রতি অনেক বড় জুলুম করবে;.....

'ওদের পর্যন্ত যখন কালের এই পরিণতির অশুভতা পৌঁছবে তখন ইসলাম কেবল একটা নামসর্বস্ব বিষয় হয়ে যাবে। মানুষ যাকে ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া কোন ধর্ম বা কিছু লোকের ধর্মবিশ্বাস বলা ছাড়া আর কিছু বলতে চাইবে না। এজন্যই আমাদেরকে ইসলামের এই প্রদীপ্ত দীপশিখাকে আলোকিত রাখতে হবে। সেটা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে হলেও প্রদীপ্ত রাখতে হবে।.....

'মানবতার শত্রু কুফরের অশুভ ঝড় ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। তারপরও আমাদের রক্তমাখা এই দীপ্ত শিখার সলতে প্রজ্জ্বলিত রাখা যাবে শুধু ত্যাগের মাধ্যমে। হয়তো এমন এক প্রজন্ম আসবে যারা এই টিমটিমে প্রদীপটি নিজেদের উষ্ণ রক্ত ধারায় এমন বিপুল আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবে যেমন আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোনালী যুগে স্বর্ণাভা হয়ে জ্বলতো।'

সালার আবদুর রউফের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার চোখ পবিত্র আভায় পূর্ণ হয়ে গেলো। এ আসলে তার জাগ্রত আত্মার বিভা, যা তার চেহারায় খেলে গিয়েছে। তিনি তো স্বাধীনতার ত্যাগী সৈনিক। পদমর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য উন্মাদ নন।

❋❋❋❋❋

যারিয়াবের চেহারায়ও আজকাল এ ধরনের উজ্জলতা দেখা যায়। এমনিই তো সে দারুন সুদর্শন। কিন্তু সুলতানাকে দেখলেই অন্যরকম এক আভা তার চোখে মুখে ঝলকে উঠে।

সুলতানা যখনই তার জায়গীরে যেতো যারিয়াবকেও নিয়ে যেতো। কয়েক দিন পর পরই আবদুর রহমানের কাছে এসে অজুহাত দাঁড় করাতো মহলের বদ্ধ পরিবেশে দম আটকে আসছে। একটু মুক্ত আবহাওয়ায় ঘুরে আসতে চায়। আবদুর রহমান নিষেধ করার সাহস পেতেন না।

প্রথম প্রথম তো সুলতানা যারিয়াবকে লুকিয়ে ছাপিয়ে নিয়ে যেতো। পরবর্তীতে আবদুর রহমানকে এই বলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো, সে যারিয়াবকে একাকিত্বের সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর নরম চাদর। ফুলের মনকাড়া সৌরভ। মখমলের মতো বিছানো ঘাস। এর মধ্যে দু'জন বসে আছে। নিঃশব্দ রাত।

এই নিঃশব্দ-মায়াময় পরিবেশে যারিয়াবের গিটারের মৃদু লয়ের আওয়াজ এক কল্পজগত সৃষ্টি করেছে। গিটার যারিয়াবের সবচেয়ে প্রিয় রাগ-সঙ্গীত। গিটার যন্ত্রে যারিয়াব পঞ্চতারের সংযোগনী এনে বাদ্যযন্ত্রে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে। বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ যারিয়াবকে গিটারযন্ত্রের আবিষ্কারকও বলতে শুরু করে।

যারিয়াব গিটারের তারে শৈল্পিক হাতের কাজ দিয়ে দারুণ মনোমুগ্ধকর সুর তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাপারে তার জুড়ি নেই কোথাও। সুলতানাও এই সুর তরঙ্গে পাগলপারা হয়ে যেতো। গিটারের সুরতরঙ্গ আর যারিয়াবের সূক্ষ্ম গলার গান সুলতানার একেবারে অন্তরমূলে আঘাত করছিলো আজ। কিন্তু সুলতানা নিজের মধ্যে এমন বিচলতা অনুভব করছিলো যেন বাদ্যযন্ত্রের এই তরঙ্গাভিঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো।

'তুমি আমার কাছে থাকলে মনে হয় আমার সব ব্যক্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে।' যারিয়াব সুলতানাকে বললো, 'আমি যেন তোমার অস্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে যাই।'

সে সুলতানার বাহু ধরে তাকে টেনে কাছে আনতে গেলো, কিন্তু সুলতানা তার কাছে না এসে দূরে সরে গেলো। যারিয়াব মৃদু হেসে বললো,

'তুমি তো জানো, আমি কতটা তৃষ্ণার্ত। দূরে সরে যেয়ো না সুলতানা!'

'খোদা তোমাকে অনেক জ্ঞান বুদ্ধি, বিচক্ষণতা দান করেছেন যারিয়াব!' সুলতানা একরোখা গলায় বললো, 'কিন্তু ভালোবাসার মর্মভেদ তুমি বুঝতে পারবে না.....তুমি কি এই না পাওয়ার অতৃপ্তিতে এই তৃষ্ণায় দারুণ ভালোলাগাকেই অনুভব করছো না?'

'আর তুমি কি মিলনের স্বাদ সম্পর্কে জানো? না.... তুমি জানো না।' যারিয়াব বললো।

'মিলনের ব্যাকুলতায় আর ছটফটানিতে যে স্বাদ আর উপভোগ্যতা রয়েছে সেটা কিন্তু মিলনের মধ্যে নেই।' সুলতানা বললো, 'তুমি জানো না, শাহে উন্দলুসের চোখে আমি কখনো আমার প্রতি প্রেম দেখিনি। তার প্রেম ভালোবাসা আমার দেহের সঙ্গে। তার এই ভালোবাসার বয়স ততদিন যতদিন আমার সৌন্দর্য আর যৌবনের সঞ্জীবতার বয়স থাকবে। যেদিন সে আমার প্রতি আর আকর্ষণ বোধ করবে না সেদিন আমি হেরেমে নিক্ষেপিত এক বঞ্চিত নারী হয়ে যাবো।.....

'আমি চাই না, তুমি আমার দেহের স্বাদ উপভোগ করো। তাহলে তুমিও একদিন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে। এখনো আমি এক মায়াময় রহস্য। এই রহস্য ফাঁস

হয়ে গেলে তোমার প্রেমের ব্যাকুলতা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। তুমি যদি আমাকে তোমার আনন্দ বিনোদনের খেলনা বানাতে চাও তাহলে আমি তোমাকে আমার এক গ্রাহক মনে করবো। যারিয়াব! আমাকে তোমার পূজা করতে দাও।'

যারিয়াব মুখে মিটি মিটি হাসি ধরে রেখেই তার হাত পেছনে নিয়ে গেলো। এসব কথা সুলতানা যারিয়াবকে এই প্রথমই নয়, আরো কয়েকবার বলেছে। সে যারিয়াবের মধ্যে তৃষ্ণার এই ব্যাকুলতা খুব ভেবে চিন্তেই উস্কে দিচ্ছে। এমন অস্থিরতা আবদুর রহমানের মধ্যেও সে জাগিয়ে তুলেছিলো।

আবদুর রহমান তো মুদ্দসসিরা, জারিয়া ও শিফার জন্য পাগলপ্রায় ছিলেন। সুলতানা ওদেরকে দিয়ে আবদুর রহমানকে ভোগমত্ত জীবনে ডুবিয়ে রাখতো। আর নিজে তার বাহুবেষ্টনীতে থেকেও মাঝেমধ্যে দূরে থাকতো।

ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'মনে হয় ইউগেলিস!' যারিয়াব বললো।

'হ্যাঁ, সেই হবে। তুমি এখানে বসো। আমি ওকে নিয়ে আসছি।' সুলতানা বলে সেখান থেকে চলে গেলো।

সুলতানা ইউগেলিসের ঘোড়াটি এক সহিসকে দিয়ে তাকে একটু দূরে নিয়ে গেলো। তাকে জানালো যারিয়াবও এখানে আছে।

'আমি তো এক সমস্যায় পড়েছি ইউগেলিস!' সুলতানা বললো, 'এটা তো তুমি জানো, যারিয়াব আমার প্রেমে কেমন দেওয়ানা হয়ে আছে। আমিও তাকে এটা বুঝাচ্ছি যে, ওকে আমি এর চেয়ে বেশি ভালোবাসি এবং ওর প্রতি আরো দেওয়ানা আমি। দেখো ইউগেলিস! আমি তোমার কথা মতো ওর জন্য দারুণ মনকাড়া মরীচিকা হয়ে এ অবস্থা করেছি ওর। আর সেও আমার পেছন পেছন ছুটে আসছে।'.....

'কিন্তু আজ আমি এই সত্যকে লুকোতে পারছি না যে, জানি না কাল থেকে কখন আমার হৃদয় জুড়ে ওর ভালোবাসায় ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে ও নয়, আমিই ওর দিকে চুম্বকের মতো লেপ্টে যাচ্ছি।........

'এখন আমি বুঝতে পারছি ওর মধ্যে কোন জাদু আছে যা দিয়ে সে আবদুর রহমানের মতো দূরদর্শী, জ্ঞানী ও রণকুশলী বাদশাহকে নিজের শিষ্য বানিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ও তো পুরো এক জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্যন্ত বদলে ফেলেছে।'

'প্রেম ভালোবাসা পাপ নয় সুলতানা!' ইউগেলিস বড় বিচক্ষণ কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু যাদের ব্যক্তি মহিমার উপলব্ধি আছে, সে তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ব্যক্তিত্বকে

সামান্য প্রেম ভালোবাসার জন্য বিসর্জন দেয় না। তোমাকে সম্রাজ্ঞী বানাচ্ছি সুলতানা! তোমার মধ্যে আমি সম্রাজ্ঞীর এক মহিমা দেখেছি। কিন্তু সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে তোমাকে এক নাটকের ভূমিকায় থাকতে হবে।'.....

'এর মধ্যে অন্যতম একটি নাটক এটাও যে, যারিয়াবকে তোমার প্রেমের শেকলে বেঁধে রাখবে। ওর ওপর তোমার যৌবনের জাদু ছেয়ে রাখো। ওকে ওর আসল অবস্থায় জাগতে দিয়ো না। ওকে রূপ ও প্রেমের নেশায় মাতাল থাকতে দাও।'.....

'আমি জানতে পেরেছি, ও, আমাদের অনক বড় বিশাল কাজ করে দিয়েছে। কিছু আরব দেখেছি আমি, যারা কথা বলে আরবী ভাষায়, কিন্তু পোষাক আশাক ও চুল রাখার স্টাইল এবং চালচলন সব আমাদের মতো। আমাদের সংস্কৃতিই ওদের সংস্কৃতি হয়ে গেছে।'

'তুমি তাহলে অনেক কম দেখেছো।' সুলতানা বললো, 'আমরা এর চেয়ে আরো অনেক বেশি সফল হয়েছি এখানে তোমাদের তুলনায়।'

'চলো, ও আমাদের অপেক্ষায় আছে, ওর কোন সন্দেহ যেন না হয। তোমাকে আমি আরেকবার বলছি, নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখো। যারিয়াবের মতো এমন সক্ষম পুরুষকে তোমার অবশ্যই ভালো লাগা উচিত। ওর মধ্যে দারুণ আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু ওকে চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রাখো।'

ইউগেলিস সুলতানার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো। যেন ও তাকে আশীর্বাদ করছে।

যারিয়াব যেখানে একা বসে রয়েছে সেখানে পৌঁছে গেলো ওরা।

'যারিয়াব! আমার এত সময় নেই যে, লম্বা চওড়া কথা শুনবো এবং শোনাতে বসে যাবো এখানে।' ইউগেলিস বললো ব্যস্ত গলায়, 'আমি জানি তোমাকে যে কাজ দিয়েছি সেটা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করে যাচ্ছো। আমার উদ্দেশ্য তুমি নিশ্চয় বুঝে গেছো। আমি শাসন ক্ষমতার লোভী নই। আর এটাও বলবো না নিজের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে তুমি খ্রিষ্টান বনে যাও।'.....

'আমার চোখে 'ধর্ম' কোন তাৎপর্যের বিষয় নয়। আমি মানবতার মুক্তির দাবীদার। তোমরা দু'টি মানব-মানবী। যদি সুলতানা এত সুন্দরী না হতো, আর তুমিও এত উচ্চ পর্যায়ের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক না হতে তাহলে এখন আবদুর রহমানের দরবারে তোমাদের যে বিশাল অবস্থান তা কি তোমরা হাসিল করতে পারতে?

'আবদুর রহমান যে এত বড় এক রাজ্যের শাসক হয়ে বসে আছে, তুমি কি ওকে এর যোগ্য মনে করো? শাসক হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে আসলে তোমার। তোমাকে সেই অবস্থান নিজেকেই অর্জন করতে হবে।'

'তুমি যে বলেছো আবদুর রহমান এত বড় রাজ্য শাসন করার যোগ্য নন এটা একেবারেই ভুল বলেছো,' যারিয়াব ইউগেলিসকে বললো, 'তার শাসন ক্ষমতার যোগ্যতার কথা আশেপাশের খ্রিষ্টান বাদশাহরাও স্বীকার করেন। তুমি কি এটা ভুলে গেছো, তার বাবা আলহাকাম যখন আমীরে উন্দলুস ছিলেন সালতানাতের প্রশাসনিক সব ক্ষমতা আবদুর রহমানের হাতে ছিলো? আবদুর রহমান না থাকলে আলহাকাম উন্দলুসকে কবে ধ্বংসের অতলে ডুবিয়ে দিতেন।'.....

'এটা আমার ও সুলতানার যে অনেক বড় কৃতিত্ব সেটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরাই তার উদ্যমী মানসিক শক্তি ও অসামান্য প্রশাসনিক যোগ্যতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। এ লোকের মধ্যে যদি নারীপূজা ও গানবাদ্যের প্রতি এমন উন্মত্ততা না থাকতো তাহলে আজ উন্দলুসে কোন খ্রিষ্টানের সহস হতো না যে, সে বিদ্রোহের কথা বলে,'.....

'আজ যদি কেউ ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় তাহলে তোমাদের পাতা ষড়যন্ত্রের জাল কয়েক দিনেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এটা আমার একক কৃতিত্ব যে, আমি এখানকার নকশা, জীবন যাপন অন্যরকমভাবে বদলে দিয়েছি। আমি শাহী খান্দান ও এর সঙ্গে যারা উঠাবসা করে তাদের মধ্যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জীবন যাপন রীতির প্রচলন করে দিয়েছি। তুমি যেমন বলেছো, তোমার দৃষ্টিতে ধর্ম কোন অর্থবোধক বিষয় নয়, আমার কাছেও ধর্ম অর্থহীন জিনিস।'

যারিয়াব বাস্তবেই অর্থহীন মনে করতো ধর্মবিশ্বাসকে। কিন্তু ইউগেলিসের আপাদমস্তক খ্রিষ্ট ধর্মে ডুবন্ত ছিলো। যারিয়াবের মতো অসম্ভব দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকও বুঝতে পারলো না, ইউগেলিস তাকে যা বলেছে নিজের ব্যাপারে সেটা একেবারেই মিথ্যা এবং ধোকা।

যারিয়াব তো বলতো, আবদু ররহমানের বড় দুর্বলতা হলো, তিনি নারী ও গানবাদ্য বলতে বেহুশ। কিন্তু সে নিজে বুঝতে পারেনি, সুলতানা নামের এক ভয়ংকর সুন্দরি নারীকে তার মন-মস্তিষ্কে সওয়ার করে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ধর্ম ও দেশের শত্রুদের দাবার অর্থ ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে।

সে রাতে ওরা ওদের মিশন নিয়ে অনেক কথা বললো। ওদের সবার মিশনই তো এক। তবে ইউগেলিস সতর্ক লোক। সে যারিয়াব ও সুলতানার কাছে অনেক কিছুই চেপে গেলো।

প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ পাম্পালুনার সফল অভিযান শেষ করে ফিরে আসার সময়ও ছোট ছোট খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী দলগুলোকে গুড়িয়ে দিতে দিতে আসছিলেন। তিনি কয়েকটি ছোট ছোট ইউনিটও তৈরি করে নেন, যারা আচমকা আশেপাশের এলাকায়, ঘন বনজঙ্গলে কিংবা উঁচু নিচু উপত্যকায় হানা দিতো এবং শত্রুর আস্তানা আবিস্কার করে তা গুড়িয়ে দিতো।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহর সেনাদল এক ময়দানে তাঁবু ফেলেছে। এর আশেপাশে পাহাড়ি প্রান্তর ও বনজঙ্গলে ভরা। সন্ধ্যা এখনো নামেনি। এসময় দু'জন ঘোড়সওয়ার এলো। দেখে ওদেরকে সাধারণ মুসাফির বলেই মনে হচ্ছিলো। দু'জনের অবস্থাই ধূলো মলিন।

ওরা জানালো, ওরা খ্রিষ্টান ছিলো। ইসলাম গ্রহণ করেছে। সিপাহসালারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। বলতে লাগলো, বিশেষ এক গোপন কথা আছে, সেটা একমাত্র সিপাহসালারকেই বলা যাবে। ওদের দেহ তল্লাশী করা হলো। না, ওদের কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলো না। তারপর তাদেরকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

'হতে পারে এটা আমাদের কেবল সন্দেহই,' দু'জনের একজন সিপাহসালার উবাইদুল্লাহকে বললো, 'কিন্তু আমরা যা দেখেছি সেটা আপনার পর্যন্ত পৌচানো নিজেদের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এর অর্থ হলো, ইসলামের প্রতি আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা আছে। ইসলামকে যোগ্য মনে করেছি বলেই আমরা এর জন্য খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করেছি।'

ওরা এ ধরনের গুরুগম্ভীর ও দীর্ঘ ভূমিকা ছাড়ার পর বললো, এক প্রান্তর দিয়ে ওরা যাচ্ছিলো। একটি পোড়া বাড়িতে চারপাঁচজন মহিলাকে ঢুকতে দেখলো ওরা। মহিলাদের ওপর ওদের কিছুটা সন্দেহ হলো। কারণ, ওদের পোশাক এ এলাকার লোকদের মতো নয় এবং এই পোড়া ও নির্জন এলাকায় ওরা একা সফর করতে পারে না।

তারা জানালো যে, তারা দু'জন পোড়া দালানের ভেতর চলে গেলো। এটা প্রাচীন কোন গির্জার ধ্বংসাবশেষ। ওরা দু'জন মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলো ওরা কারা? কোত্থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে?

ওরা বললো, ওরা নওমুসলিম। মুসলিম সেনাদল থেকে একটু দূরে দূরে থেকে ওরা এই সেনাদলের সঙ্গে যাচ্ছে।

'আমরা এই সেনাদলের প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে চাই', মহিলারা এই লোক দু'জনকে বলেছিলো, 'কিন্তু আমরা তো নারী। এজন্য সৈনিকদের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছি। আমাদের কাছে কিছু গোপন তথ্য আছে সেটা শুধু সালারকেই

বলতে চাই। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে না চাইলে আমরা ফিরে যাবো। তিনি কষ্ট করে এখানে আসলে তাকে সব কথা বলে দেবো।'

উবাইদুল্লাহর ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো।

'আমাকে তোমরা বেকুব বানাতে এসেছো? উবাইদুল্লাহ্ বললেন।

'এত বড় দুঃসাহস কি আমরা দেখাতে পারি?' দু'জনের একজন বললো, 'ওরা পুরুষ হলে ওদেরকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম। মহিলাদেরকে তো আমাদের সঙ্গে আসতে বাধ্য করতে পারি না আমরা। তবুও বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে আসতে। কিন্তু ওরা মানলো না। ওদের মধ্যে দু'জন তো কাঁদতে শুরু করলো। জানি না, ওরা কি বলতে চায়। মেয়েদেরকে আপনার কিসের ভয়? তবে আপনি যেতে না চাইলে সেটা আপনার মর্জি। আমরা মুসাফির। আমাদের পথে আমরা নেমে যাবো।'

ওরা এমনভাবে কথা বললো উবাইদুল্লাহর সঙ্গে যে, তিনি ওদের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সঙ্গে নিলেন মাত্র দু'জন মুহাফিজ। এসব এলাকায় তিনি তার ফৌজের মাধ্যমে এমন আতংক ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, তাকে কেউ ধোকা দেবে এমন দুঃসাহস করাও অসম্ভব ব্যাপার।

সেই পোড়া গির্জা এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে প্রান্তরভাগের মধ্যে। দুই ঘোড়সওয়ার সবার আগে, তার পেছনে উবাইদুল্লাহর ঘোড়া, এর পেছনে মুহাফিজদের ঘোড়া।

পোড়া গির্জার কাছে যেতেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। সামনের দুই ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আর সামনে যাবেন না সিপাহসালার!' মুহাফিজদের একজন উবাইদুল্লাহকে বললো, 'এদেরকে মানুষ মনে হয় না। কোন জিনটিন হবে। কারণ, ওদের তো কান্নার কোন কথা ছিলো না। এরা তো আমাদের সঙ্গে এমন কিছু বলেনি যে, এরা মজলুম নারী।

ভেতর থেকে ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যেতে লাগলো, 'বাঁচাও, ওই জালিমদের হাত থেকে বাঁচাও।'

❋❋❋❋❋

দুই ঘোড়সওয়ার তলোয়ার বের করে ঘোড়া থেকে নেমেই গির্জার দিকে ছুটে গেলো। উবাইদুল্লাহও ঘোড়া থেকে নেমে সেদিকে ছুটলেন। মুহাফিজরাও তার পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো।

সহসাই লোক দু'জন বেরিয়ে এলো। ওরা হাসছিলো। নারী চিৎকার এখন আর নেই। ওরা উবাইদুল্লাহ ও মুহাফিজ দু'জনকে বাইরে দাড় করিয়ে বললো,

তেমন কোন ব্যাপার নয়। কয়েকটি ঘোড়ার আওয়াজ শুনে ভেবেছে, ওদেরকে বুঝি সৈন্যরা পাকড়াও করতে এসেছে। আমাদেরকে দেখে শান্ত হয়ে গেলো।

'আপনার মুহাফিজরা বাইরে থাকুক। শুধু আপনি ভেতরে আসুন। ওরা শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চায়। আর কারো সঙ্গে নয়।'

মুহাফিজ দু'জন বাইরে রয়ে গেলো। উবাইদুল্লাহ ভেতরে চলে গেলেন। এটা একটা দেউরীর মতো দালান। ছাদ বেশ নিচু। বেশ ছমছমে পরিবেশ। দুর্গন্ধও নাকে আসছে। উবাইদুল্লাহ সামনের একটি কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। কোন মহিলাকে দেখতে পেলেন না। ততক্ষণে তিনি তার তলোয়ারও কোষবদ্ধ করে কোমরে ঝুলিয়ে ফেলেছেন।

কামরার চারটি দরজা। একটি দরজা খোলা। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। এ সময় পেছন থেকে মৃদু পায়ের আওয়াজ পেলেন। তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন।

ততক্ষণে তিনি ছয়জন দীর্ঘদেহী শক্তিশালী মানুষর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। সবার হাতে উদ্যত বর্শা। তাদের চোখে ক্রোধ আর ঘৃণা।

এরা যে খ্রিষ্টান এতে কোন সন্দেহ রইলো না উবাইদুল্লাহর এবং তিনি যে অনেক বড় ভুলের মধ্যে পা দিয়েছেন সেটা দেরিতে হলেও তিক্তভাবে অনুভব করলেন। এই দুই ঘোড়সওয়ারের কথায় এত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি।

'তোমরা কি চাও?' তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা যা চেয়েছি তা পেয়ে গেছি।' ছয়জনের একজন বললো।

'সিপাহসালার! তোমার দুই মুহাফিজকে আমরা খতম করে দিয়েছি।' দেউরী সংলগ্ন দরজা থেকে আওয়াজ এলো।

উবাইদুল্লাহ সেদিকে তাকালেন। তার দুই মুহাফিজ ঘোড়সওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের হাতে তরোয়ার ছিলো। দু'জনের তলোয়ারই রক্তে লাল। ওদেরকে তাহলে ওদের তলোয়ার দিয়েই হত্যা করা হয়েছে।

'তুমি এখন আমাদের কয়েদী' একজন বললো, 'ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাকে হত্যা করবো না।'

'তোমার ভাগ্যের ফয়সালা করবেন শাহে ফ্রান্স লুই।'

'আর আমরা তোমাকে বলবো তুমি সে রক্তের কি মূল্য দেবে যা তুমি বিদ্রোহ দমনের নামে খ্রিষ্টানদের শরীর থেকে ঝরিয়েছো।' তাদের একজন বললো।

‘এর মূল্য কি তাও শাহে লুই বলবেন।’ দীর্ঘকায় আরেকজন বললো। ‘তোমার তলোয়ারটি আমার হাতে হাওলা করে দাও।’ একজন এগিয়ে আসতে আসতে বললো।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ তার তলোয়ারের বাট শক্ত করে ধরে বললেন,

‘প্রাণ দিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবো না; কিন্তু তলোয়ার দেবো না। তোমরা আটজন আর আমি একলা। তবুও লড়তে ভয় পাচ্ছি না। তোমাদের বর্শার ফলাগুলো যখন আমার দেহে ঢুকে যাবে এবং আমার দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে যাবে তখন তোমরা তলোয়ার নিয়ে নিয়ো।’

‘বাস্তবায় ফিরে এসো উবাইদুল্লাহ।’ তাদের মধ্যে নেতা গোছের একজন বললো, ‘আমরা তোমাকে হত্যা করতে পারবো না। জীবিত নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু লড়াই করে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে মারা যেতে পারো।’

‘আমি এজন্য প্রস্তুত। আমার লাশই শাহ লুইয়ের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।’

‘আমরা ক্রুশের পূজারী’। আরেকজন বললো, ‘ডাকো তোমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে; তোমাকে আমাদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে। .....আমরা তোমার কাছে তলোয়ার চেয়েছি।

‘তলোয়ার আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই দেবো।’ উবাইদুল্লাহ কঠিন গলায় বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী দুশমনের হুমকিতে তলোয়ার ছেড়ে দেয় না।’

এ সময় হঠাৎ বাইরে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা গেলো। কাছে এসে শব্দ থেমেও গেলো।

‘দেখো তো বাইরে কে? সাবধানে দেখবে।’ নেতা গোছের খ্রিষ্টানটি বললো।

তাদের একজন পা টিপে টিপে বাইরে বের হলো এবং শরীর লুকিয়ে উঁকি মেরে বাইরে তাকালো এবং একইভাবে ভেতরে চলে এলো।

‘ওকে মেরে ফেলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।’ লোকটি তাগাদা দিলো সবাইকে।

উবাইদুল্লাহ বুঝে গেলেন বাইরে তার লোকজনই এসেছে। ওরা তাঁরই সেনাদলের একটি ইউনিট।

এতে প্রায় বিশজন ঘোড়সওয়ার রয়েছে। এরা আশপাশের এলাকায় টহল দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো। এই পোড়া গির্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে বাইরে

চারটি ঘোড়া দাঁড়িয়েআছে। দলে কমান্ডার দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর দেখলো দুটি লাশ পড়ে আছে।

ঘোড়া থেকে নেমে কাছে গিয়েই চিনতে পারলো সিপাহসালারের মুহাফিজ ছিলো ওরা। বাইরে যে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে এর সওয়ার যে ভেতরে রয়েছে এটাও নিশ্চিত হয়ে গেলো তারা।

দলীয় কমান্ডারকে যে লোকটি বাইরে উঁকি দিয়ে সেনা ইউনিটকে দেখে ভিতরে গিয়ে বলেছিলো উবাইদুল্লাহকে মেরে ফেলো। তার পিছু পিছু মুসলিম কমান্ডারও ভেতরে ঢুকে পড়লো। সবাই কমান্ডারের দিকে তাকালো।

এই সুযোগে উবাইদুল্লাহ তলোয়ার বের করে তার একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীর ঘাড়ে সজোরে আঘাত করলেন। একটুর জন্য মাথাটি ধড় থেকে আলাদা হলো না।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে কমান্ডারকে বললেন, 'সবাইকে ভেতরে ডাকো।'

কমান্ডারও চিৎকার করে তার লোকদের ভেতরে আসতে বললো। কয়েকজন সন্ত্রাসী বাইরের দিকে ছুট দিলো। আর দু'জন উবাইদুল্লাহর ওপর বর্শা চালালো।

যারা বাইরের দিকে দৌড়াতে লাগলো তাদেরকে পথেই মুসলিম সৈনিকরা পথরোধ করে দাঁড়ালো এবং এরা পালাতে চেষ্টা করলো না। তারা লড়াই শুরু করে দিলো।

উবাইদুল্লাহ ওদিকে দুই বর্শাধার বিরুদ্ধে একাই লড়তে লাগলেন। বর্শা তো বেশ লম্বা। এজন্য উবাইদুল্লাহর তলোয়ার বর্শাধারী পর্যন্ত পৌঁছছিলো না।

তার সৈন্যরা বাইরে রক্তক্ষয়ী লড়াই লড়ছিলো।

উবাইদুল্লাহ তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে একটি বর্শা ভেঙ্গে ফেললেন। এর মধ্যেই দু'জন সৈন্য ভেতরে এসে গেলো। ওরা একজন বর্শাধারীকে নিমিষেই যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলো। আরেকজনকে জীবিত গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন উবাইদুল্লাহ।

উবাইদুল্লাহ বাইরে বের হয়ে দেখলেন, ক্রুশের পূজারীরা জাহান্নামে চলে গেছে। তার সৈন্যদেরও তিনজন শহীদ হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, এই খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী দলটি বেশ সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে।

'তোমরা আসলে কী চাইছিলে? তোমাদের উদ্দেশ্যই বা কী ছিলো?' যাকে পাকড়াও করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

'আপনি যদি মনে করেন আমার প্রাণের ভয়ে আপনাকে সবকিছু বলে দেবো তাহলে এই ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।' পাকড়াও করা খ্রিষ্টানটি বললো,

'আমার নাম সিলওয়াস। আমরা আপনাকেই অপহরণ করে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। আমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, আপনি কোন ঝামেলা করলে কতল করে ফেলতে। এটা তো বলাই হয়েছে, আপনাকে ধরে নিয়ে ফ্রান্সের শাহ লুইয়ের কাছে নিয়ে যেতাম আমরা। এর অতিরিক্ত আমি আর কিছুই বলবো না।'

'তোমাকে তো এটা বলতে হবে তোমাদের এই সন্ত্রাসী দল আর কোথায় কোথায় আছে?' উবাইদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কোন কোন মসলমান তোমাদের সঙ্গে আছে?'

'এটা তো কোনভাবেই বলবো না।' সিলওয়াস বললো, 'আমরা শক্ত কসম করে এসেছি, কোন ধরনের তথ্য কাউকে দেবো না। প্রাণ গেলেও না। আমরা আত্মউৎসর্গকারী– জানবায, আমাদের খ্রিষ্টধর্মের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে রেখেছি।'

সেনা ইউনিটের কমান্ডার তলোয়ার উঠিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, 'তোকে আমাদের সিপাহসালারের প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে।'

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ সিলওয়াস ও কমান্ডারে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

'অত্যন্ত সম্মান পাওয়ার যোগ্য এই লোক যে নিজের ধর্মের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছে।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমি ওর ওপর সামান্যতম কঠোরতাও করবো না। সিলওয়াস! তোমাকে আমি এ অধিকার দিচ্ছি, তুমি তোমার গোপনীয়তা গোপনই রাখো। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। আর আমাদের কাছে এটা কোন বীরত্বের বিষয় নয় যে, আমরা এতগুলো মানুষ মিলে তোমাকে একা কতল করে দেবো।'.....

'শাহ লুইয়ের কাছে যাও এবং আমার পয়গাম দাও যে, আমাকে অপহরণের জন্য যেন তিনি নিজে আসেন। তোমরা তো কিছু লোককে নিজেদের ধর্মের জন্য জানবায বানিয়েছো। এখানে আমরা সবাই-সিপাহসালার, সালার থেকে নিয়ে সাধারণ সিপাহী পর্যন্ত ইসলামের জানবায।.....

'যাও, সিলওয়াস! তাকে বলবে, উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ একা অসহায় কোন কাফেরের ওপর তলোয়ার চালায় না।

'আর সিলওয়াস! তোমার কোন এক সঙ্গী কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলেছিলো যে, তোমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকো, তিনি তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন।–' দেখেছো তোমরা, আমার রাসূরুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমাকে কীভাবে উদ্ধার করেছেন?'

ওরা পোড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। সবাই শোকতপ্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত এই লড়াইয়ে নিহতদের পাশে দাঁড়িয়ে গেলো।

❋❋❋❋❋

'আপনি যদি আমাকে ধোকা না দেন তাহলে আপনাকে দু' একটি কথা আমি বলতে চাই।' সিলওয়াস বললো।

'কোন ধোকা নয় সিলওয়াস!' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'যা বলতে চাও নির্ভয়ে বলো। আমাকে গালি দিতে চাইলে গালি দাও। তুমি এখন মুক্ত।'

'আমি নির্ভীক মানুষ সালারে আলা!' সিলওয়াস বললো, 'কিন্তু গালি দেয়াকে আমি ঘৃণা করি। প্রকৃত জানবাযের মুখ নয়, তলোয়ারই চলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে.....

আমি আপনার এই অসাধারণ চরিত্রমাধুরীকে এবং আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সামান্য কিছু মূল্য দিতে চাই। আপনি জিজ্ঞেস করেছেন কোন কোন মুসলমান আমাদের সঙ্গে আছে?.......

'আমি নাম তো বলবো না এবং দু'একজন ছাড়া কারো নাম জানিও না। শুধু এতটুকু বলবো, সালতানাতে উন্দলুসের খুঁটি তার ভিত্তিপ্রস্তর থেকে খসে পড়েছে। আপনারা উন্দলুসের এই মাটিতে বেশি দিন আর টিকতে পারবেন না। আপনাদের মুসলমানরাই সালতানাতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কোন গোপন তথ্য নয়, আপনারা নিজেরাই তো সব দেখতে পাচ্ছেন।'.....

'আপনারা এই ঘুণপোকা মারতে পারবেন না। হাজার হাজার খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এরা এবং যারা আরব থেকে এসেছে তাদের সবাইকে তো আপনারা পাক্কা মুসমান মনে করেন। আসলে এরা নামসর্বস্ব মুসলমান হয়ে গেছে। মুখের ভাষায় যে কাজ হয় সেটা তলোয়ারে সম্ভব হয় না। আর যে জাতি তাদের সভ্যতা ও শিক্ষা বদলে দেয় তাদের তলোয়ার ভোতা হয়ে যায়।'

'কাবার রবের কসম! তুমি ভাড়াটে খুনি নও।' উবাইদুল্লাহ স্বগোতক্তি করে উঠলেন, 'তোমার কথায় বুদ্ধির ঝলক আছে। তুমি চিন্তাভাবনা করার মতো যোগ্য লোক।'

'যে সিপাহী মেধা-বুদ্ধি খাঁটাতে পারে না সে তো ভাড়াটে খুনীই।' সিলওয়াস বললো, 'সেই বর্শাই দুশমনের বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়

যার পেছনে সিপাহীর বাহুবল নয়, কোন ধর্মের জযবাদীপ্ত শক্তি থাকে। আমরা আপনার কওমের সেই জযবা–সেই চেতনাকে সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

'আর তোমরা এতে কখনো সফল হতে পারবে না।' সিপাহসালার বললেন।

'আমাদের দীক্ষাগুরু বলেছেন, কোন জাতিকে একদিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরে মারা যায় না সিপাহসালার!' সিলওয়াস বললো, 'আপনার অসাধারণ আদর্শ আর চমৎকার ব্যবহারই আমাকে এভাবে এবং এ ধরনের কথা বলতে বাধ্য করেছে। না হয় আমি এ সম্পর্কে কিছুই বলতাম না। .....দীক্ষা গুরু বলতেন, তোমার শত্রু-জাতিকে অধঃপতনের পথে নামিয়ে দাও। এটাই তোমাদের সফলতা।'.....

'নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে এটা মাথায় ঢুকিয়ে দাও যে, এই মিশনকে তাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের সন্তানদের বলে যাও, তাদের পূর্বপুরুষরা এই মিশনে বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ধর্ম, জাতি ও দেশের জন্য নিহতদের কাহিনী শোনাও ওদেরকে।'.....

'তারপর এই সন্তানরাই এই মিশনকে অগ্রগামী করবে এবং এমন এক সময় আসবে যে, তোমাদের শত্রু জাতি এমনভাবে কালের হাওয়ায় উড়ে যাবে যেমন প্রখর রৌদ্রে ভেজা শিশির উড়ে যায়। হ্যাঁ, আমরা আপনাদেরকে অধঃপতনের পথে নামিয়ে দিয়েছি।'

'আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?' উবাইদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি আমাদের সেনাবাহিনীকেও অধঃপতনের পথে নিয়ে যেতে পারবে? ওদেরকে পরাজিত করতে পারবে?'

'যে জাতির বাদশাহ বা শাসকরা নিজেদের সিংহাসন আর রাজমুকুটের হেফাজতের জন্য স্বজাতিকে ধোকা দিতে পারে এবং শত্রুকে বন্ধু মনে করে। গানবাদ্য আর যৌন-বিলাসকে নিজেদের ওপর ছায়ার মতো সওয়ার করে রাখে,নিজের বিবেক বুদ্ধিকে কোন সুন্দরী নারী বা গায়কের হাতে বন্ধক রাখে'.....

'সে জাতির সেনাবাহিনী যত শক্তিশালী আর দুর্দান্ত হোক না কেন ওরা এক সময় বেকার হয়ে যায়। আপনাদের সেনাবাহিনীর অবস্থাও তাই হবে। যখন শাসক ও সেনাবাহিনীর চিন্তা-ভাবনা বিপরীতমুখী হয়ে যায় তখন স্বজাতি জীবিত থাকতে পারে না। জীবিত থাকলেও তাদের ভাগ্যলিপিতে কারো গোলামি লিখে দেয়া হয়।'

'সালারে আলা!' সেনা ইউনিটের কমান্ডার উবাইদুল্লাহকে বললো, 'এ লোক ভাড়াটে খুনি বা সন্ত্রাসী নয়। এতো সন্ত্রাসী দলের বড় নেতা মনে হচ্ছে। একে

জীবিত রাখা মানে ভয়ংকর এক জঙ্গি গ্রুপকে জীবিত রাখা। ওকে আপনি হত্যা করছেন না কেন?'

'না,' সালারে আলার দৃষ্টি তখন সিলওয়াসের চেহারায় নিবদ্ধ এবং তার ঠোঁটে মুচকি হাসি, তিনি বললেন, 'ওকে হত্যা করা আমার ওপর ওয়াজিব নয়। আমি এমন শত্রুকে সম্মান করি।'

'আর আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করি। সিলওয়াস উবাইদুল্লাহকে বলে কমান্ডারকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হত্যা করতে হলে নিজেদের বাদশাহকে হত্যা করো আমার বন্ধু। আর তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাও যে নিজের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে মত্ত নয়।'

একটু পর সিলওয়াস ঘোড়ায় চড়ে একদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

এতে তো কোন সন্দেহ নেই, সালতানাতে উন্দলুসকে অনেক আগেই চক্রান্তকারী খ্রিষ্টানরা অধঃপতনের পথে নিয়ে গেছে। পুরো খ্রিষ্টান জাতির মধ্যে এক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

ইউগেলিস, ইলওয়ারের মতো নেতা ও পাদ্রীরা এমন সুক্ষ্ম বিষয়ের ওপর খ্রিষ্টান জাতিকে উস্কে দিলো, যার মধ্যে মুসলিম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে এবং লড়াই এড়িয়ে যাওয়ার চমৎকার কৌশল রয়েছে।

তাদের আসল হামলা ছিলো ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির ওপর এবং মুসলমানদের মন-মানসের ওপর। যাতে ভোগ, বিলাস, বিনোদন আর প্রেম ভালোবাসার সহজ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

একদিকে রইলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহর মতো সালার, যিনি ইসলামের জন্য রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছেন। আর অন্যদিকে শাহী মহলের কোন নারী কণ্ঠের অট্টহাসি বা কোন গায়কের মায়াভরা সুর-তরঙ্গ।

আবদুর রহমানের দরবারে নারী, নর্তকী, গায়কদেরই প্রাধান্য ছিলো না, কবিয়াল গোষ্ঠিরও বড় দখল ছিলো। আবদুর রহমান কাব্য কবিতার প্রতিও দারুণ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সেসব কবি ও গীতিকারদেরই দরবার পর্যন্ত যাতায়াত ছিলো যারা দরবারের উপদেষ্টা ও আমীর উমারাদের পছন্দের হতো। সব দরবারী কবিরাই পরবর্তীতে উন্দলুসে ইসলামের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাদশাহর সামান্য আপত্তি আছে এমন কোন কথাই এরা এদের কাব্যে রাখতো স্থান দিতো না। এভাবে ওরা বাদশাহদেরকে শব্দের আফিম খাইয়ে মাতাল করে রাখতো।

'তারীখুল উম্মত' এর উদ্ধৃতি এরকম,

'বনী উমাইয়ার ওযীর, নাযীর, আমীর উমারাদের নির্বাচনে ব্যক্তিগত পছন্দ ও সুপারিশই সবচেয়ে বড় নীতি ছিলো। বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের কোন অভাব ছিলো না তাদের। যথেষ্ট পরিমাণেই ছিলো, কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ খুব কমই হতো। ওযীর ও আমীর ততক্ষণেই ওযীর আমীর থাকতো যতক্ষণ তারা বাদশাহর দৃষ্টিতে মনোনীত থাকতো।

'যার ওপর থেকে বাদশাহর দৃষ্টি সরে যেতো তার সব পদমর্যাদা, সব অর্জন মাটিতে মিশে যেতো। এমন অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও চরম স্বার্থপরতাই অধিকাংশ যোগ্য ও প্রতিভাবান নেতৃত্বকে অংকুরেই নষ্ট করে দেয়।'.....

'এসব শাসকদের আসল লক্ষ্য যেহেতু ছিলো নিজেদের ঘরানায় ও খান্দানে পূর্ণ সালতানাত কায়েম করা, এজন্য বিভিন্ন শক্তিধর গোত্র ও ব্যক্তির ওপর নিজের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করে রাখা খুবই জরুরি ছিলো।

'আর তাদেরকে এভাবে হাতের মুঠোয় রাখতে গিয়ে দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ডালা সবসময় উন্মুক্ত রাখতো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তারা কাড়ি কাড়ি সম্পদ খরচ করতো। আমীর-উমারা ও সরদাররা ছাড়াও খতীব, কবি, গীতিকার, গায়ক, সুন্দরী নারীদের পেছনে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করা হতো। আর যারা বাদশাহদের তোষামোদ করতো, প্রশংসা-গুণকীর্তন করতো তারা তো হয়ে উঠতো একেকজন সম্পদের মনুষ্য পর্বত।'

উন্দলুসের ইতিহাস সেসব দরবারী কবি-সাহিত্যিকরাই লিখেছেন যারা তাদের কালের শাসকদের শিল্প ও ছন্দের ভাষায় চরম আত্মতুষ্টিতে মগ্ন রাখতো। তাদের সেসব লেখাই তো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়ে পৌঁছেছে। যার মধ্যে শাসক শ্রেণীর গুণকীর্তন আর তাদের অবদানের কথাই উঠে এসেছে বেশি, তাদের অযোগ্যতা, ভুল-ক্রটি, ক্ষমতার লোভ, অপকর্মের কথা তারা জেনে শুনেই চেপে গেছে।

"উত্থান আর সাফল্য সে জাতির কপালেই চুম্বন করে যারা তাদের পূর্বসুরীদের বিচ্যুতিকে পথের আলোকবর্তিকা বানিয়ে পথ চলে এবং সুখ স্মৃতিকে উদ্দীপনার উৎস ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কিন্তু দরবারী ঐতিহাসিকরা পরবর্তী প্রজন্মকে সেই ইতিহাসই দিয়েছে, যা বিজয় আর সুকীর্তির কাহিনীতে পূর্ণ।"

চারদিকে একটি খবর ছড়িয়ে পড়লো। কর্ডোভা থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরের এক উপত্যকায় হযরত ঈসা (আ) এর এক খাস শিষ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে এক পাহাড়ি প্রান্তরের ওপর একটি গাছে একটি নক্ষত্র চমকে উঠে। তারপর তার শিষ্যের আওয়াজ শোনা যায়।

সেখানে এক প্রাচীন গির্জার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গির্জা বেশ উঁচুতে নির্মাণ করা হয়েছিলো। কোন এক যুগে এসে সেটা পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

খ্রিষ্টানরা বলতে শুরু করেছে, এখন সেখানে গির্জার ভেতরে বহু অশরীরি এসে বাসা বেঁধেছে। ভয়ংকর সব কাহিনী শোনানো হতো। কেউ কেউ বলতো, এগুলো অশরীরী নয় বরং হযরত ঈসা (আ) এর যুগের পূণ্যাত্মা।

কিছুদিন ধরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই গির্জার আলোচনা একটু বেশিই হচ্ছে। অবশেষে একটা খবর ছড়িয়ে পড়লো, ঈসা (আ)-এর এক শিষ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষ তো ভয়ে ওদিকে যেতো না। কিন্তু বিভিন্ন চার্চ ও গির্জায় যখন পাদ্রীরাও এ বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলো তখন সন্ধ্যার পর লোকজন জটলা বেঁধে ওদিকে যেতে শুরু করলো।

ওদিকে যখন লোকেরা ভিড় করতে শুরু করলো তখন থেকেই পোড়া গির্জার পাশের একটি গাছে নক্ষত্র চমকে উঠতে লাগলো। সেখানে কিছু স্বেচ্ছাসেবকের মতো লোক দর্শকদেরকে দুই প্রান্তরভাগের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিতো এবং তাদেরকে বলতো, ভয় পাবে না। তারকা চমকে উঠলে ঈসা মসীহকে স্মরণ করবে।

এমনই এক রাতে লোকদেরকে দুই প্রান্তরভাগের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। অন্ধকার রাত। মাঝ রাতের পর চাঁদ উঠবে। লোকজনের সামনে একটি শূন্য প্রান্তর। এর পেছনে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের ওপর ঘন বৃক্ষ লতায় ছাওয়া। এই বৃক্ষ লতায় গন ঝোপের উচ্চতায় সেই গির্জা।

ওপরে যাওয়ার একটি রাস্তা আছে অবশ্য। কিন্তু কত যুগ সে রাস্তা ব্যবহার করা হয় না কে জানে। এজন্য রাস্তাটা ঘাস ও ঝাড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আছে। পাহাড়ের মাঝখানে কোন কালে ঝর্ণার পানিতে প্লাবিত কোন ঝিল ছিলো। এখন সেখানে কাদাময় চোরা ভূমি এবং পানিও আছে। আর পানিতে আছে কুমীর। লোকজনের সে পথ না মাড়ানোর এটাও একটা কারণ।

এর আশপাশেও গাছপালায় ভরা একাধিক পাহাড় রয়েছে।

লোকজন পাহাড়ের নিচের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। এত অন্ধকার যে, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ভিড় থেকে লোকজনের কথাবার্থার মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আচমকা সবাই এমন নিঃশব্দ হয়ে গেলো যেন সব মরে গেছে।

সামনের পাহাড়ের ঢালের একটি গাছের ওপর একটি নক্ষত্র চমকাতে দেখা গেছে। আকাশের নক্ষত্রের মতো সেটা ঝলমল ঝলমল করছে।

আজো কোথাও হযরত ঈসা (আ) বা তার কোন শিষ্যের আত্মপ্রকাশের গুজব শোনা গেলে কোন এক গাছে বিদ্যুৎচমকের মতো নক্ষত্র চমকানোর কথা অবশ্যই শোনা যাবে।

এনময় গির্জার দিক থেকে কয়েকজন মানুষের সুরেলা আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। কোন প্রার্থনার সঙ্গীত গাইছে তারা। নিঃস্তব্ধ রাতে এই সঙ্গীত সমবেত মানুষের ওপর জাদুর মতো ছেয়ে গেলো। সবাই যার যার বুকে ডান ও বাম হাত রেখে ক্রুশের আকৃতি বানিয়ে এই সঙ্গীত গাইতে লাগলো।

নক্ষত্র স্থির নয়। এদিক ওদিক হেলছে দুলছে। এর আলো সামান্য কিছু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

'ক্রুশের পূজারীরা!' এক গম্ভীর–ভারী গলার আওয়াজ শোন গেলো, 'ক্রুশ ও ঈসা মাসীহের অনুসারীরা! আমি পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি আসতেই থাকবো। ধ্বংস তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। সেটা তোমরা থামাও। সেটা থামানোর শক্তি তোমাদের আছে।'....

'ঈসা মাসীহের হাত ও পায়ের কাটা যখমে মুসলমানদের আযানের শব্দ নুনের ছিটা দিচ্ছে। হযরত ঈসা (আ) কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্য দান করতেন। কিন্তু তিনি কুষ্ঠরোগী বানাতেও পারেন। যারা খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে ধর্মান্তরিত হয়েছো তারা স্বধর্মে ফিরে এসো। না হয় সবাই কুষ্ঠ রোগী হয়ে যাবে।'

নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে গেলো। আবার সব অন্ধকারে ডুবে গেলো। লোকজনের নিঃশব্দতা আরো গভীর হয়ে গেলো। তারপর ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো। যেটা বাড়তে বাড়তে গুঞ্জনের রূপ নিয়ে শোরগোলে পরিণত হলো। গির্জার দিকে থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এলো,

'এখন তোমরা চলে যাও। নিজেদের কাজ কর্মে সতর্ক থেকো, ...আগামীকাল এসো। হয়তো তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।'

লোকজন ভয়ে আতংকে নিজেদের বাড়ির পথ ধরলো।

❋❋❋❋❋

গুটি কয়েক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার মতো ঘটনা নয় এটি। সেটা তো এক পশ্চাদপদ যুগ। কোথাও শিক্ষার আলো নেই। সাধারণ মানুষ রহস্যজনক ও বিচিত্র সব ঘটনাকে দিনের সূর্যের চেয়ে সত্য মনে করতো। এসব দারুন উপভোগ করতো। যখন পরস্পরকে কোন ঘটনা শোনাতো তখন নিজেদের পক্ষ থেকেও কিছু কাহিনী যোগ করে লোকজনকে শোনাতো।

হযরত ঈসা (আ) এর কোন শিষ্যের আত্মপ্রকাশ এক নক্ষত্রের মাধ্যমে; এমন অলৌকিক ঘটনা যে কেউ দেখতে চাইবে। এর মধ্যে অনেক মুসলমানও রাতে সেই পরিত্যক্ত গির্জা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

মসজিদে মসজিদে এ খবর পৌঁছে গেলো। মুসল্লীরা ইমাম ও মাওলানা সাহেবদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এ ঘটনা কতটা সত্য?

'এটা ভণ্ড খ্রিষ্টানদের বানানো কাহিনী'। ধর্মীয় নেতারা তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'এ ঘটনা সত্য বলে কোন মুসলমান যেন বিশ্বাস না করে। এটা কুফরী। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ অহেতুক, অর্থহীন ও ভিত্তিহীন কাহিনী বানিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে।'

মসজিদে মসজিদে এ কথা ঘোষণা করে দেয়া হলো।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া সে যুগের একজন বিখ্যাত আলেম ও আইনজ্ঞ। আমীরে উন্দলুস আবদুর রহমান ও প্রধান বিচারপতির ওপর তার তখন একচ্ছত্র প্রভাব। তিনি ফতোয়া দিলেন,

'হতে পারে এটা কোন ভেল্কিবাজি; এ ঘটনাকে সত্য বলে মানা এবং এ ঘটনা আবার কখনো ঘটবে তা দেখতে যাওয়া মুসলমানদের জন্য শিরিকী পাপের নামান্তর।"

এই ফতোয়া দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, কোন মুসলমান যদি অনুসন্ধানী মন নিয়ে সেদিকে যেতে চায় তারা যেন আর না যায়। কারণ, প্রকৃত মুসলমান যার মধ্যে কুরআন হাদীসের জ্ঞান আছে সে তো অবশ্যই এগুলোকে বিশ্বাস করবে না। সে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ভেল্কিবাজি বের করে ফেলবে।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার ব্যাপারে ইতিহাসে লেখা আছে,

'ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মালিকী মাযহাবের বড় ফকীহ ছিলেন। তবে দরবারী আলেম ছিলেন তিনি। এ কারণে শাহী খান্দানে ও শাহী দরবারে তার ভীষণ প্রভাব পড়ে। কারণ, উন্দলুসে মালিকী মাযহাবেরই প্রসার ছিলো বেশি। সালতানাতের বড় কোন বিষয় তার পরামর্শ ছাড়া গৃহীত হতো না।'.....

'আর এই প্রভাব ও মর্যাদাকে ইয়াহইয়া রাজনৈতিক উত্থানের কাজে লাগান। প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। আবদুর রহমানের পিতা আলহাকামের যুগে ইয়াহইয়া বড় রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেন এবং আলহাকামকে গদিচ্যুত করতে ব্যর্থ হন। তবে আবদুররহমান তার শাসনামলে তাকে বাবার দরবারের আগের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।'

সালতানাতে উন্দলুসের পতনের ব্যাপারে ইয়াহইয়ার পরবর্তী বংশধররা অতি ঘৃণ্য সব চক্রান্ত চালিয়ে দেশময় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রাখে।

হযরত ঈসা (আ) এর কোন শিষ্য কেন আত্মপ্রকাশ করতে যাবেন? এই ঘটনা কি কোন ভেল্কিবাজি, না এর কোন বাস্তবতা আছে? এসব প্রশ্ন কোন কোন মুসলমানের মনে ঠিকই জাগে। কিন্তু ইহইয়া ও অসচেতন ইমাম ও খতীবদের ফতোয়া তাদের প্রশ্নের সত্যতা যাচাই বাছাই করার ব্যাপারে একেবারেই দমিয়ে রাখে।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ এখনো কর্ডোভা ফিরে আসেননি। সালার আবদুর রউফ ও প্রধানমন্ত্রী হাজিব আবদুল করীম এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনাও করেছেন।

'ব্যাপারটা কি এটা আসলে দেখা উচিত।' হাজিব বললেন, 'খ্রিষ্টানদেরকে উস্কে দিতে ও মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে কোন ভেল্কিবাজিরও আশ্রয় নেয়া হতে পারে।'

'ব্যাপার যাই হোক, শাহ উন্দলুসের সঙ্গে কথা বলার আগে আমাদের নিজেদের ব্যাপারটা দেখে নেয়া উচিত।' সালার আবদুর রউফ বললেন।

'খ্রিষ্টানরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, পুরো শহর, উপ শহর এবং গ্রামেগে ও এটা ছড়িয়ে পড়ছে যে, আজ রাতে ঈসা মসীহের শিষ্যের দেখা মিলতে পারে।'

আবদুল করীমের দু'জন বেশ তৎপর ও উদ্যোগী গোয়েন্দা আছে। রহীম গাজ্জালী ও হামিদ আরাবী।

আজ রাতে দলে দলে খ্রিষ্টানরা সেই পাহাড়ি প্রান্তরে যাবেই যেখানে নক্ষত্রের চমক দেখা যায়। রহীম গাজ্জালী ও হামিদ আরাবীও ওদের সঙ্গে গেলো।

এত মানুষের ভিড়ে মনে হয় না কোন মুসলমান আছে। কারণ, মসজিদগুলোতে ঘোষণা করে দেয়া হয়, খ্রিষ্টানদের এসব ভেল্কিবাজি দেখা গুনাহ এবং যে মুসলমানই দেখবে তার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

আজকের রাতটিও অন্ধকার। পাহাড়ের নিচে দুই প্রান্তর ভাগের মাঝখানে অন্ধকার আরো গভীর। সবাই ব্যাকুল হয়ে আছে। ধীরে ধীরে প্রার্থনা সঙ্গীতের গুরণ উঠতে লাগলো। পুরো সমাবেশ নীরব হয়ে গেলো।

একটু পরেই পাহাড়ের উঁচু ঢালুতে নক্ষত্র চমকে উঠলো। বহু কণ্ঠ এককণ্ঠী হয়ে পবিত্র গজল গাইতে লাগলো। এই গজল খ্রিষ্টানরা গির্জায় গেয়ে থাকে।

হঠাৎ নক্ষত্রের চমক অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর এমন এক চমক সবাইকে চমকে দিলো যে, সবার দম বন্ধ হয়ে এলো। এই চমক পরিত্যক্ত গির্জার মিনারের ওপর দেখা গেলো। যেখানে কাঠের ক্রুশ ঝুলানো থাকে। চমক দৈর্ঘ্যে

প্রস্থে দুই আড়াই গজ পরিধির হবে। চমকানো আলোর মধ্যে অনেক বড় ক্রুশ দেখা গেলো এবং এর সঙ্গে ঝুলন্ত হযরত ঈসা (আ)কে দেখা গেলো।

ভিড়ের মধ্যে কান্না ও হেচকি তোলার আওয়াজও শোনা গেলো। আবারো সেই পবিত্র গজলের বহু কণ্ঠী সুর গুঞ্জন করে উঠলো। এবারে আওয়াজে অন্যকরকম এক আবেগ ও তরঙ্গ রয়েছে।

দর্শকরা সব হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। সবাই হাত জোড় করে পবিত্র গজল গাইতে লাগলো। রহীম গাজ্জালী ও হামিদ আরাবীর লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেলো। ওরা ফিসফিস করে একে অপরকে বলতে লাগলো, এটা ভেল্কিবাজি হতে প ারে না।

ওরা এমন প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো যে, ওরাও খ্রিষ্টানদের মতো হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। যেন অদৃশ্য কোন শক্তি ওদেরকে বসিয়ে দিয়েছে।

ওরা খ্রিষ্টানদের গাওয়া গজল বা পার্থনা সঙ্গীত তো জানে না; কিন্তু তবু চুপ থাকলো না। কালেমায়ে তায়্যিবার জপ শুরু করে দিলো।

গজলের গুঞ্জন আস্তে আস্তে থেমে গেলো। তারপর সে চমকও নিভে গেলো যাতে হযরত ঈসা (আ)-কে দেখা গিয়েছিলো।

'এই অস্থির–অতৃপ্ত আত্মা তোমাদের সবাইকে সতর্ক করছে,' দূর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এলো, 'তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে, তোমরা যেন নিজেদের ধর্ম না ছাড়ো। তোমরা কি জানো না, এই পাপের শাস্তি কি? যে মাটিতে গির্জা পরিত্যক্ত হয়ে যায় সে মাটিতে মানুষ আবাদ থাকতে পারে না। শুধু ধ্বংস হয়ে যায়।'.....

'সবাই যার যার এলাকার গির্জায় যাও। সেখানে তোমাদেরকে বলা হবে, তোমাদের ওপর কি কি বিপদ আসছে। ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করো। তোমাদের ঐক্যের কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যারা মুসলমান হয়ে গেছো তারাও গির্জায় যাও। নিজেদের পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিজেদের পবিত্র মাটিতে ঈসা মসীহের নূর ছড়িয়ে দাও।'

*****

হামিদ আরাবী ও রহীম গাজ্জালী রাতেই হাজিব আবদুল করীমের দেউরীতে চলে গেলো। তারা কি দেখে এসেছে তা জানালো আবদুল করীমকে।

'এটা ভেল্কিবাজি হতে পারে না।' ওরা দু'জনে বললো।

আবদুল করীম অতি বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি ঐ আলোর চমকই দেখেছো, না

এদিক ওদিকও তাকিয়ে দেখেছে এর আশেপাশের জায়গাটুকুও আলোকিত কিংবা আগুনের শিখার আভাও দেখা যেতে পারে।

তারা কিছু একটা চিন্তা করে জানালো, যখন আলোর চমক অদৃশ্য হয়ে গেলো তখন পরিত্যক্ত গির্জার সমনের দিকের জায়গা থেকে একটু দূরে ওদের চোখ পড়তেই সন্দেহ হয়েছিলো, এর নিচে কোথাও আগুন জ্বলছে। তারপর এক সময় এই প্রচ্ছন্ন আলোও মিলিয়ে গেলো।

'এটা চরম ভাওতাবাজি ও ভেল্কিবাজি'! হাজিব আবদুল করীম শতভাগ নিশ্চয়তার গলায় বললেন,

'এটা কোন অলৌকিক ঘটনা নয় কিংবা জাদুরও কৃতিত্ব নয়। এর মাধ্যমে খ্রিষ্টানদেরকে আতংকিত করে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেরকেও প্রভাবান্বিত করা হচ্ছে।'.....

'আমি এর ব্যবস্থা করবো এবং এই ভেল্কিবাজিকে তোমরা দু'জন খতম করবে। তোমরা যে দূর থকে আওয়াজ শুনেছো যে, গির্জায় যাও এবং সেখানে তোমাদেরকে বলা হবে তোমাদের ওপর কোন বিপদ আসছে। এটা এই দুনিয়ারই কোন মানুষের আওয়াজ। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি জেনে যাবো, গির্জায় যারা যাবে তাদেরকে কি বলা হবে?'

পরদিন আবদুল করীমকে চার পাঁচজন লোক এসে বললো, আজ প্রতিটি গির্জায় এত ভিড় যে, ভেতরে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায়নি।

পাদ্রীরা ইসলামের বিরুদ্ধে রীতি মতো বিষ উদগীরণ করেছে। আর উউন্দলুসের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমন এমন কথা বলেছে যার অর্থ হলো, তোমরা এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাদ্রীরা হযরত ঈসা (আ) এর আত্মপ্রকাশকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে এবং লোকদেরকে খুব ভয় দেখিয়েছে।

লোকরো যখন গির্জা থেকে বের হলো তখন তাদের ওপর স্তব্ধতা নেমে এসেছিলো।

পরদিন আবদুল করীম সালার আবদুর রউফের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ঠিক করেন যে, শাহে উন্দলুসকে কোন কিছু না বলেই এই ভণ্ডামির মুখোশ ফাঁস করে দিতে হবে। তিনি তখনই রহীম ও হামিদকে ডেকে পাঠালেন। সালার আবদুর রউফ চারজন সেনাকে তলব করেন।

'আমরা তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করছি। প্রধানমন্ত্রী হাজিব আবদুল করীম ঐ ছয়জনকে বললেন, 'আমরা জানতে পেরেছি হযরত ঈসা (আ)-এর এই আত্মপ্রকাশ ও অদৃশ্য থেকে আওয়াজ সম্পূর্ণ ভাওতাবাজি। এটা

তখনই উৎখাত করতে হবে যখন সেখানে মানুষের ভিড় থাকবে এবং নক্ষত্রের চমক দেখা দেবে কিংবা হযরত ঈসা (আ)-কে দেখানোর নামে ভেল্কিবাজি দেখা যাবে।'.....

'তোমরা খেয়াল রাখবে, যেদিন জানতে পারবে, আজ রাতে আবার ঈসা (আ) এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে সে রাতে তোমাদেরকে সে এলাকায় থাকতে হবে। কিন্তু লোকদের ভিড়ে নয়, বরং গির্জার কাছের পাহাড়ে যাবে। সেখানেই তোমরা দেখতে পাবে চমক কোথা থেকে আসে।'.....

'কোথাও না কোথাও অবশ্যই প্রজ্জলিত আগুন দেখতে পাবে। আর এটা এমন এক দৃষ্টির আড়াল করা জায়গায় জ্বলতে দেখবে যেখান থেকে আগুনের আভা লোকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সেখানে একাধিক মানুষও থাকতে পারে। তাদেরকে কাবু করে আগুন নিভিয়ে দেবে।'.....

'তোমাদের মধ্যে দু'জন গির্জার কাছে গিয়ে লুকিয়ে থেকে সতর্ক চোখে দেখবে। কাউকে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে দেখলে সেখানে তাকে পাকড়াও করবে। তোমাদের সঙ্গে বর্শা ও খঞ্জর থাকবে। হতে পারে ওদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই করতে হতে পারে। আর লড়াই হলে কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে না। সব কয়টাকে খতম করে দিবে।'.....

'তারপর তোমাদের কেউ উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করে দিবে, এসব ভাওতাবাজি। এখানে ঈসা মাসীহের আসার পশ্নউ উঠে না। তারপর সকাল বেলা আমরা লোকদেরকে পরিত্যক্ত গির্জা ও অন্যান্য জায়গা দেখাবো। আর তাও দেখাবো যা গাছের ওপর থেকে চমকে উঠতো।'

প্রধানমন্ত্রী হাজিব ও সালার রউফ তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন কখন কিভাবে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হবে এবং এই মিশন কিভাবে জয় করবে।

'তোমরা তোমাদের দ্বীন-ধর্ম ও সালতানাতে উন্দলুসের অতন্দ্র প্রহরী। এই দেশ ঐ শাহী খান্দানের নয়। তোমাদের এই দেশ। তোমাদের ঘরে ডাকাত পড়েছে এবং তোমাদের বাপ ডাকাতদেরকে ঘর লুট করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। তোমরা তো তোমাদের বাড়ি লুটপাটের হাত থেকে বাঁচাবে... এটা তোমাদের ঘর, এটা আমাদের ঘর।'

'আমরা সব রকম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। আমরা অবশ্যই যাবো।' তাদের মধ্যে একজন বললো।

'আমরা কারো কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাইবো না।'

'প্রতিদান আল্লাহর কাছেও চাইবো না।'

ছয় আত্মত্যাগী প্রস্তুত হয়ে গেলো।

দু'দিন পরই জানা গেলো, আজ রাতে কিছু একটা দেখা যাবে। যারাই ওখানে যাবে তারা যেন ভালো করে পরিষ্কার করে গোসল করে পবিত্র হয়ে যায়। মসজিদে সব মুসলমানকে সতর্ক করে দেয়া হলো, কেউ যেন ওখানে না যায়।

তবে সেই ছয়জন মুসলমান যাচ্ছিলো।

তাদের একজন রহীম গাজ্জালী আরেকজন হামিদ আরাবী। তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর চারজন গেরিলা দলের আত্মত্যাগী রয়েছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সেখানে পৌঁছে গেলো। দিনের বেলা রহীম ও হামিদ এখানে বকরীচারীর বেশে এসে সবকিছু দেখে গেছে। পাহাড়ের ওপরে গিয়েও ওরা এদিক ওদিক মোটামুটি দেখে নিয়েছে।

সূর্যাস্তের পর আত্মত্যাগী দলটি অন্য দিক দিয়ে পাহাড়ে চড়লো। এই পাহাড়ের ঢাল একটাই নয়। একটি ঢাল শেষ হতেই ওপরে সামান্য কিছু জায়গা ময়দানের মতো সমতল। এখান থেকে অধিক ঢালু ঢাল ওপরে উঠে গেছে। উঁচু ঘাস ও বুনো ঝোপ-ঝাড় আড়াল নেয়ার দারুণ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ওপরের দিকে প্রথম ঢালটি শেষ হতেই সেই পরিত্যক্ত গির্জা। এর ডান দিকে চলে গেলে দেখা যাবে পাহাড়ের নিচের দিকে ঢাল নেমে গেছে। সেখানেই চোরা ও কাদায় থকথকে জায়গায় এবং বদ্ধ পানির বড় সড় একটা চৌবাচ্চাও রয়েছে। যার মধ্যে ছোটখাটো কুমীর আছে।

চোরা ভূমির এক প্রান্তে খাড়া প্রান্তর। যা গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ে আচ্ছাদিত। এই প্রান্তরের ওপর দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় শিলা পাথর।

গেরিলা দলের দু'জনকে সঙ্গে নিলো হামিদ আরাবী। আর দু'জনকে নিলো রহীম গাজ্জালী। ওরা আলাদা হয়ে গেলো। রহীম গাজ্জালীরা পরিত্যক্ত গির্জার কাছে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। হামিদ আরাবী তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই গাছগুলোর কাছে চলে গেলো যার ওপর নক্ষত্রের চমক দেখা যায়।

যখন অন্ধকার এত গভীর হয়ে গেলো যে, কারো হাতও নজরে পড়ে না তখন রহীম গাজ্জালীরা গির্জার একেবারে কাছ থেকে কিছু মানুষের নড়াচড়া ও ফিসফিস করে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলো। তারপর গির্জার ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। যেটা পেছনের দিকের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো। ভেতর থেকে কয়েকজন লোক বের হলো।

'জিনিসগুলো আরেকবার দেখে নাও।' কেউ একজন বললো।

'যা দরকার সবকিছুই নিয়েছি। তোমরা গাছে গিয়ে ওঠো। লোকজন আসতে শুরু করেছে।' আরেকটি গলা শোনা গেলো।

'লোকজনের চিন্তা করো না। ওরা তো আর ওপরে উঠতে যাবে না।' আরেকজন বললো।

হামিদ আরাবী নক্ষত্র চমকানো গাছের কাছে সতর্ক হয়ে আছে। সে কয়েকটি পায়ের আওয়াজ পেলো। অন্ধকারে দু'টি ছায়া মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। তারপর একজন গাছে চড়তে লাগলো। নিচে দাঁড়ানো লোকটি জিজ্ঞেস করলো,

'সেই জায়গাটা মনে আছে তো?'

'মনে আছে। ভালো করেই মনে আছে।'

দুই তিন জন হামিদ আরাবীর একেবারে কাছ ঘেঁষে চলে গেলো। তারা পাহাড়ের ঢালের নিচের প্রান্তরে নেমে গেলো। তারপর সামনের দিকের প্রান্তর থেকে নিচু সুরের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো।

লোকজন নিচে জমা হতে শুরু করেছে। তাদের শোরগোল স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

❃❃❃❃❃

খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি। সামনের দিকের প্রান্তর যেখানে শিলাপাথর দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সে জায়গাটা তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। হামিদ আরাবী লক্ষ্য করে দেখলো, বড় সাইজের একটা ফানুস জ্বলছে। কিন্তু এর আলো শুধু সামনের দিকে যাচ্ছে। ডানে, বামে, উপরে নিচে যাচ্ছে না।

হামিদ দেখলো, যে লোকটি গাছে চড়েছিলো সে আবার নিচে নেমে আসছে। তার সঙ্গী সেখান থেকে চলে গেছে আগেই। হামিদ নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো। লোকটির নামা শেষ হতেই হামিদ আরাবী বর্শার ফলা লোকটির পাজরে ঠেকিয়ে বললো,

'আবার ওপরে যাও। ওপরে যা কিছু রেখে এসেছো সেগুলো নামিয়ে আনো।'

'কে তুমি?' সে অস্বস্তি ভরা গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'আমি যা বলি তা করো।' হামিদ আরাবী বললো।

'বর্শা সরাও। আমি ওপরে যাচ্ছি।' লোকটি বললো।

সে গাছে চড়তে লাগলো। অন্ধকারে আবছায়া মতোও কিছু দেখা যায় না। লোকটি কি করছে হামিদ সেটা দেখতে পেলো না। লোকটি খঞ্জর বের করে তারপর গাছের দিক থেকে সরে একটু ঘুরেই খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো হামিদকে।

হামিদ নিজেকে বাঁচাতে পারলো না। খঞ্জর তার বাহু কেটে পাজরে গিয়ে লাগলো। তবে পেটে বিদ্ধ হলো না। হামিদ পেছনে সরে গিয়ে বর্শার ফলা আমূল লোকটির পেটে বিদ্ধ করে দিলো।

লোকটি উঁচু আওয়াজে কাউকে ডাকতে ডাকতে পড়ে গেলো।

হামিদ তার লোকদেরকে ডাকলো। হামিদ আছড়ে পাছড়ে সেদিকে ছুটলো যে দিকে তার লোকজন ছিলো এবং এর পাশে আলো জ্বলেছিলো।

গির্জার দিক থেকে কয়েকজন দৌড়ে আসতে লাগলো। তাদের হাতে উদ্যত তলোয়ার। হামিদ আরাবী তার লোকদেরকে লুকিয়ে পড়তে বললো এবং নিজেও ওদের সঙ্গে লুকিয়ে পড়লো।

গির্জা থেকে যারা ছুটে এসেছে তারা সংখ্যায় বেশি। ওরা ওদের আহত সঙ্গীকে দেখতে পেলো। গাছের কাছে পড়ে আছে। মুহূর্তেই সবাই ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে লাগলো কারা তাকে আহত করেছে।

একজন হামিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো, হামিদ বসে বসেই তার পাজরে বর্শা ঢুকিয়ে দিলো। লোকটির মুখ দিয়ে এমন আর্তনাদ বেরিয়ে এলো যে, তার সঙ্গীরা এদিকে ছুটে এলো। তাদের মধ্যে একজন উঁচু আওয়াজে বললো,

'আলো যেদিকে আছে সেদিকেই রাখো। এখানে সবকিছু দেখা যাচ্ছে।'

ওরা হামিদ ও তার সঙ্গীদের দেখে ফেললো। হামিদ রহীম গাজ্জালীদেরকে ডেকে এ দিকে আসতে বললো। তারপর খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

কিন্তু সন্ত্রাসী দল সংখ্যায় বেশি হওয়াতে ওদের তিনজনকে ঘিরে ফেললো। তবে ওদিক থেকে রহীম গাজ্জালীরাও এসে গেলো।

ওদিকে হাজারো মানুষ নক্ষত্রের চমক দেখতে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছো। আর এদিকে নক্ষত্রের চমক দেখানোর কলা-কুশলীরা জীবন-মরণ লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে।

❋❋❋❋❋

রাতের শেষ প্রহর। হাজিব আবদুল করীম গভীর ঘুম থেকে হড়বড় করে উঠে বসলেন। তার কামরার দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। তিনি দরজা খুলে দেখলেন, তার এক পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে। সে হাজিবকে জানালো, বাইরে এক লোক এসেছে। সে এমনই আহত যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

হাজিব ছুটে বের হয়ে পড়লেন। দারোয়ান ততক্ষণে আহত লোকটিকে এক দিকে শুইয়ে দিয়েছে। সে রহীম গাজ্জালী। ওর আপাদমস্তক রক্তাক্ত। সে যেন

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় রয়েছে। হাজিব দারোয়ানকে তাড়া দিয়ে বললেন, দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ও শল্য চিকিৎসককে নিয়ে এসো। কিন্তু রহীম গাজ্জালী বাঁধা দিয়ে বললো,

'ডাক্তার বা সার্জন আসার আগ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো না।' রহীম গাজ্জালী কাতরাতে কাতরাতে বললো, 'আগে আমার কথা শুনুন। এখনো পর্যন্ত যদি আমার কোন সঙ্গী না থাকে তাহলে সবাই মারা গেছে। ওরা নিঃসন্দেহে ভণ্ড, প্রতারক, ভেল্কিবাজধারী।'.....

'ভেল্কিবাজদের কাউকে হয়তো আমরাও জীবিত রাখিনি। আপনি এখনই সেই পরিত্যক্ত গির্জায় চলে যান। সেখানে আমার সঙ্গীদের লাশ তো পাবেনই এবং সব ভেল্কিবাজির তথ্য উপাত্তও ওখানে পাবেন। আলামত–প্রমাণও হয়তো পেয়ে যাবেন।'

থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলছিলো রহীম গাজ্জালী। তাঁর নিঃশ্বাস ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। ডাক্তার ও সার্জন আসতে আসতে রহীম গাজ্জালীর প্রাণটি তার পরম কর্তব্য পালনরত যখমে যখমে জর্জরিত দেহ থেকে বেরিয়ে গেলো।

হাজিব আবদুল করীম তীব্র বেগে বেরিয়ে আসা কান্না চাপা দেয়ার ব্যর্থ চেস্টা করতে করতে বললেন,

'এই শহীদদের রক্ত কি বৃথা যেতে পারে? কখনোই নয়।'

শিরা উপশিরায় তার রক্ত টগবগ করতে লাগলো। দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে লাগলো। পরিচারককে প্রায় ধমকে উঠে বললেন, এখনই সালার আবদুর রউফকে ডেকে নিয়ে এসো, সে যে অবস্থাতেই থাকুক সে অবস্থাতেই যেন চলে আসে।

আবদু ররউফের দেউরী দূরে নয়। তিনি চলে এলেন। রহীম গাজ্জালীর লাশ দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। হাজিব আবদুল করীম তাকে জানালেন রহীম গাজ্জালী মারা যাওয়ার আগে তাকে কি বলে গেছে।

সালার আবদুর রউফ তখন বিশ পঁচিশ জন সিপাহী ও কমান্ডারদের একটি ইউনিট প্রস্তুত করলেন এবং আবদুল করীম ও তার নেতৃত্বে গোড়সওয়ার হয়ে সবাই পরিত্যক্ত গির্জায় পৌঁছে গেলো। এখনো অন্ধকার থাকায় সঙ্গে করে মশালও নিয়ে গেলো তারা।

গির্জায় ঢুকে তারা দেখলো ভেতরে দুটি বাতি জ্বলছে। কোন মানুষজন নেই। দেয়ালের সঙ্গে কাঠের একটা তখতা পড়ে আছে। এর ওপর হযরত ঈসা (আ) এর অনক বড় কাল্পনিক একটা ছবি। এটাকেই ক্রুশের সঙ্গে ঝুলানো অবস্থায় দেখানো হয়েছিলো। ছবিটি তৈলচিত্র। এ কারণে বেশ চকচকে।

সবাই বাইরে বের হয়ে দেখলো, একটি গাছের নিচে কয়েকটি লাশ পড়ে আছে। এর মধ্যে মুসলমান আত্মত্যাগী ইউনিটের সেই সৈনিকরাও আছে এবং খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীরাও।

লাশগুলোকে সনাক্ত করার চেষ্টা করা হলো। একটি লাশ নড়ে উঠলো। এটা মুসলমানের লাশ। সালার আবদুর রউফ তার পাশে বসে পড়া আতহ লোকটিকে তার নাম ধরে ডাকলেন। এক সিপাহীকে বললেন, ওকে উঠাও। ও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

ওর পেট ফেটে গেছে। নিজের সালারকে দেখতে পেয়ে তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারলো না। ধীরে ধীরে সে একটি হাত উঠালো এবং ওপরে গাছের দিকে ইংগিত করলো।

আবদুর রউফ জিজ্ঞেস করলেন ওপরে কি দেখেছে? আহত জানবাযের কেবল ঠোঁট দুটো নড়লো। ওপরে উঠানো হাতটি পড়ে গেলো। তার মাথা একদিকে ঢলে পড়লো।

তারপর সবগুলো লাশ দেখা হলো, আর কেউ জীবিত নেই এখানে।

গির্জার দিক থেকে কারো ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো।

সিপাহীরা সেদিকে দৌড়ে গেলো। ওরা দেখলো, দু'জন লোক সেই কাঠের বড় তখতাটি– যার ওপর ঈসা (আ) এর ছবি ছিলো, উঠিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে। সিপাহীদেরকে তাদের পেছনে ছুটে আসতে দেখে দ্রুত পাহাড় থেকে নামতে লাগলো। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে দু'জনেই হোচট খেয়ে পড়ে গেলো। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

গির্জার ভেতর থেকে ধোয়া উঠতে দেখা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে চেরাগদানগুলো থেকে উজ্জ্বল আলো বের হতে লাগলো। ছাদটা কড়িকাঠের। আর ভেতরে পুরোনো বেঞ্চ, টেবিল, খাটিয়া ছিলো। দ্রুত সেগুলোকে আগুনে গ্রাস করলো। এমন অগ্নিকাণ্ড নেভানোর কোন ব্যবস্থা ছিলো না এবং এর কোন প্রয়োজনও ছিলো না।

❋❋❋❋❋

গ্রেফতার করা দুই খ্রিষ্টানকে জ্বলন্ত গির্জার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। এখন গির্জার দরজা ও জানলাগুরো দিয়েও আগুনের শিখা বের হয়ে আসছ। বারান্দার কাঠের থামগুলোতেও আগুন ধরে গেছে। পুরো গির্জা ভয়ংকর এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

'যদি ঠিকঠাক বলে দাও, এসব ভেল্কিবাজি কি ছিলো তাহলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো।' প্রধানমন্ত্রী হাজিব আবদুল করীম বললেন, 'আমরা তোমাদেরকে গ্রেফতার করবো না। এটা তো তোমাদের ধর্ম।'

'তোমরা তোমাদের ধর্মের জন্য যত প্রতারণা ধোকাবাজি করো আমাদের কোন আপত্তি নেই। .....কিন্তু আমি অবশ্যই এটা জানবো যে, এটার মূলে কি ছিলো। যদি না বলো তাহলে এই জ্বলন্ত গির্জায় ফেলে দেয়া হবে। দু'জনকে টেনে হেচড়ে জ্বলন্ত গির্জার এত কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যে, আগুনের প্রচন্ড উত্তাপে ওদের চেহারা ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো।

আগুনের শো শো আওয়াজ বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়ার মতো। দুই খ্রিষ্টান পেছন দিকে সরে আসতে লাগলো। কেউ ওদেরকে বাঁধা দিলো না।

'আমরা আপনাকে কখনো বলবো না এর পেছনে কার হাত রয়েছে?' তাদের একজন বললো, 'আমরা আপনাকে কোনভাবেই বলবো না এর পেছনে কার হাত রয়েছে। যদি এর পরও জানতে চান তাহলে আমাদেরকে আগুনে ফেলে দিন। আমরা নিজেরাই আগুনে ঝাপিয়ে পড়বো। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, সে তার ধর্মের জন্য তারই ইবাদতখানায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে?'

'সে ধর্মই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে যার অনুসারীরা তাদের পবিত্র ধর্মের জন্য জীবন্ত পুড়ে মরাকে অতি সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করে।'........

অন্যজন অতি দুঃসাহসিক গলায় বললো, 'ইসলাম মৃত্যুবরণ করছে। আর খ্রিষ্টধর্ম পুনর্জীবন লাভ করছে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

এ ধরনের কথা বলতে ওদেরকে তো বাঁধা দেয়া হলোই না; বরং তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হলো। ওদের মধ্যে যে যথেষ্ট জযবা-আবেগ আর বিচক্ষণতা রয়েছে এতে কারো কোন সন্দেহ রইলো না। বড় বড় কথা বা অবাস্তব কোন কথা ওরা বললো না।

পরিস্কার ভাষায় ওরা জানালো, সামনের প্রান্তরের শিলা পাথরের দেয়াল আর ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে তীব্র শিখাধারী ফানুস জ্বালানো হতো। এর ওপর গোল চিমনি রাখা হতো।

চিমনির তিন দিকে কালো রঙ করা। একদিক উন্মুক্ত। এদিক দিয়ে আলো বের হয়। যে কারণে আলো কোন দিকে না ছড়িয়ে শুধু সামনের দিকের গাছ পর্যন্ত পৌঁছে।

সামনের গাছের একটি ডালে একটা কাঠের এক হাত সমান টুকরো বেঁধে রাখা আছে। এর চারপাশে আয়না লাগানো। এর ওপর আলো পড়তেই সেটা

ঠিকরে আলো বের হতো। এটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখার কারণে বাতাসে মৃদু হেলতো দুলতো। এ থেকে কম্পিত আলো বের হতো। দূর থেকে দর্শকরা এটাকেই মনে করতো উজ্জল নক্ষত্র।

হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে যেহেতু ভিত্তিহীন জনশ্রুতি আছে যে, তাঁর নূর যারা দেখবে তারা সেটা কোন গাছের শাখায় নক্ষত্র চমকানোর রূপে দেখবে। মানুষের এই কুসংস্কারের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এই খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী দলটি নাটক খেলে। এই কম্পিত আলোর সাহায্যে হযরত ঈসা (আ) এর ক্রুশে ঝুলানো ছবি তুলে ধরে। লোকেরা মনে করে, সত্যিই বুঝি ঈসা (আ) আত্মপ্রকাশ করেছেন। .....

এখন ধরা খাওয়ার পর এরা গির্জায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এর আগে ঈসা (আ) এর কাল্পনিক মূর্তিটি বের করে নিয়েছিলো।

সেই আহত জানবায সৈন্যটি মৃত্যুর আগে যে হাত উঁচিয়ে গাছের দিকে ইংগিত করে গিয়েছিলো, এতে আসলে সে এই কাঠের টুকরোটি দেখাতে চেয়েছিলো; যেটা চারপাশ থেকে কাঁচ সংযুক্ত। সেটা নামানো হলো। এটা এতক্ষণ গাছের শাখায় ঝুলছিলো।

'আমরা যা কিছু করেছি আমাদের ধর্মের জন্য করেছি।' তাদের একজন বললো, 'আমাদের লোকেরা যে ভাষা ও যে ধরনের ইংগিত বুঝে আমরা তাদেরকে সে ভাষা ও ইংগিতে বুঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি, ওরা যেন নিজেদের ধর্ম না ছাড়ে। ইসলামের প্রতি যেন ঝুঁকে না পড়ে।'.....

'আপনাদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। এটা দুই ধর্মের মধ্যে শত্রুতা। ইসলামের বিস্তৃতি ঘটছে চারদিকে। আমরা তা রোধ করার জন্য বৈধ অবৈধ সব ধরনের কৌশল প্রয়োগ করবো। আমাদের দু'জনকে আগুনে ফেলে দিন। আমাদের জ্বলন্ত ছাই থেকে আরো দু'জন আত্মত্যাগীর জন্ম হবে। যারা আমাদের পথে চলবে। এই গির্জার আগুন সারা উন্দলুসে ছড়িয়ে পড়বে।'

❋❋❋❋❋

সূর্যোদয় হচ্ছে। এ সময় হাজিব আবদুল করীম ও সালার রউফ আবদুর রহমানের মহলে পৌঁছলেন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো জানবায ও খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের লাশ।

হযরত ঈসা (আ) এর কাল্পনিক মূর্তি, ফানুস ও কাঁচযুক্ত কাষ্ঠখণ্ডটিও নিয়ে আসা হলো। আর গ্রেফতার করা দুই খ্রিষ্টানও সঙ্গে ছিলো।

তাদের আসার খবর শাহ উন্দলুস পেয়েছেন। তিনি এখনো শয়ন কক্ষে। সুলতানা তার সঙ্গে রয়েছে।

আবদুর রহমান তাদেরকে ডেকে পাঠালেন।

তারা দু'জন সাক্ষাৎ কক্ষে গিয়ে বসলেন। আবদুর রহমান শয়ন কক্ষ থেকে বের হতেই সুলতানা তার খাস খাদেমাকে ডেকে বললো,

'যারিয়াবকে গিয়ে বলো, যে অবস্থাতেই থাকুক চলে আসে যেন। আবদুল করীম ও আবদুর রউফ এসেছেন।'

আবদুর রহমান সাক্ষাত কক্ষে এলেন। সুলতানাও তার সঙ্গে সঙ্গে কামরায় ঢুকলেন। এখনো তার পরনে নাইটি। দুই কাঁধ ও বাহুমূল উন্মুক্ত। রেশম কোমল ঝলমলে চুলগুলো পিঠময় ছড়ানো। এ তার প্রকৃত রূপ। এর মধ্যে কোন ধরনের অপ্রাকৃতিক প্রসাধনীর ছোঁয়া নেই। এই নিরাভরণ সাজেই তার থেকে রূপের এক চরম উত্তাপ ঠিকরে পড়ছে।

উন্দলুসের প্রধানমন্ত্রী ও সালার দু'জনে দুজনের দিকে তাকালেন। সুলতানাকে দেখে তারা যে মনে মনে ধাক্কা খেলেন সেটাই একে অপরের চোখে পড়ে ফেললেন। তাদের প্রতিক্রিয়া, চিন্তা ভাবনা এক–অভিন্ন।

দু'জনের চিন্তার সার কথা এটাই, রূপের এই আগুনে সেই আবদুর রহমানই বেঁচে থাকতে পারবেন যিনি শাহে উন্দলুস ও নারী অন্ত প্রাণ। সুলতানার এমন মাখন নরম ও ঝলমলে পূর্ণ মুখাবয়ব ও চিবুক স্পর্শে আপাদমস্তক ডুবে গিয়ে সে আবদু রহমান জীবিত থাকতে পারেন না যিনি ছিলেন উন্দলুসের স্বাধীনতার গর্ব ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী।

'আমরা আপনাকে এ সময় কষ্ট দিতাম না।' প্রধানমন্ত্রী আবদুল করীম কথা বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু খ্রিষ্টানরা এমন ভযাবহ এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, আমাদের রাতেও শোয়া উচিত নয়। ওরা এমন ভেল্কিবাজি ও ভাওতাবাজি শুরু করেছে যে, আমাদের ইসলাম ধর্মেও এর মন্দ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু খ্রিষ্টানদেরকেই নয়, মুসলমানদেরকেও তারা হুকুমতের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিচ্ছে।'

'বিশেষ কিছু কি ঘটেছে?' আবদুর রহমান হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাকি আপনারা আপনাদের গোয়েন্দাদের পাঠানো রিপোর্ট আমাকে শোনাতে এসেছেন?'

'আমীরে উন্দলুস!' হাজিব বললেন, 'রাতে বিশেষ এক ঘটনা ঘটেছে। যেটা কয়েক **রাত ধরেই ঘটছে। গতরাতে আমরা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র**–অপতৎপরতা ও **ভেল্কিবাজি ধ্বংস করে দিয়েছি। বাইরে আমাদের কয়েকজন** সিপাহীর লাশ পড়ে আছে। আর **কয়েকজন খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের,** যারা এসব নাটক খেলেছে। দু'জনকে আমরা জীবন্ত ধরে এনেছি।'

'লাশ?' আবদুর রহমান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার এতটাই সঙ্গীন ছিলো যে, খুন খারাবি পর্যন্ত ঘটে গেছে?'

প্রধানমন্ত্রী আবদুল করীম ও সালার রউফ তাকে বিস্তারিত শোনালেন। পাহাড়ের ওই পরিত্যক্ত গির্জায় কি কি নাটক রচনা করে লোকদেরকে এ কয়দিন দেখানো হয়েছে।

এর মধ্যে যারিয়াবও এসে গেলো। সে মনোযোগ দিয়ে রাতের ঘটনা শুনতে লাগলো। আবদু ররহমান ঝিমুচ্ছিলেন। হাজিব ও সালার রউফ এক এক করে সব শোনালেন।

'আমরা আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি আমীরে মুহতারাম!' সালার আবদুর রউফ বললেন, 'এই দুই কয়েদীকে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। এই নাটকের আসল রচয়িতা কে? কাদের ছত্রছায়ায় এসব হচ্ছে?'

'এসব ছোটখাটো কয়েদীকে কারাদন্ড দেয়া কিংবা তাদেরকে জল্লাদের কাছে সোপর্দ করে দেয়া কোন প্রতিকার নয়। এদের মাথাগুলোকে আমাদের পাকড়াও করতে হবে। সে মাথাগুলোকে আমাদের থেঁতলে দিতে হবে যারা এই সন্ত্রাস আর ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা।'

'গোস্তাখী মাফ শাহে উন্দলুস!' আবদুর রহমানের স্থলে যারিয়াব বলে উঠলো,' 'মান্যবর প্রধানমন্ত্রী ও সালার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নামান্তর।.........

'ওরা যদি ধর্মীয় ব্যাপারে ভেল্কিবাজি বা কোন কৌশলের আশ্রয় নেয় সেটার অধিকার তাদের আছে। আমাদের ধর্ম-কর্ম তো এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ওদেরকে এসব নাটকীয় খেলা খেলতে দিন যাতে খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারে, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কি?'

'ওরা খুব দ্রুতই বুঝতে পারবে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং একে ভেল্কিবাজির মাধমে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।'

'যারিয়াব।' প্রধানমন্ত্রী হাজিব গর্জে উঠে বলরেন, 'আমরা আমীরে উন্দলুসকে কথা বলছি, আপনাকে নয়। আমাদের হুকুম নিতে হবে আমাদের আমীরের কাছ থেকে। কোন দরবারী গায়কের কাছ থেকে নয়.....আমীরে মুহতারাম! এসব নাটকীয় তৎপরতা একমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে।'

আবদুল করীমের গর্জন শাহে উন্দলুসকে তন্দ্রলুভাব থেকে জাগিয়ে দিলো। তিনি যারিয়াবকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন। সুলতানা যারিয়াবকে ডাকিয়ে এনেছে এজন্য, যাতে যারিয়াব আবদুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ও সালারের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে।

'যারিয়াব!' আবদুর রহমান বললেন, 'তুমি নিশ্চুপ বসে থাকো। এরা ঠিকই বলছে। তাদের হুকুম আমার কাছ থেকেই নিতে হবে।'

❋❋❋❋❋

যারিয়াব অতি সতর্ক লোক। প্রখর মেধার অধিকারী সে। যে কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। আর মুখের জাদুর জোর তো আছেই। তার মুখে সে অপ্রস্তুতের হাসি ঝুলিয়ে নিলো।

'শাহে উন্দলুসের কাছে আমি মাফ চাচ্ছি।' সে বললো, 'আমি মুহতারাম ওযীর ও মুহতারাম সালারের কাছেও মাফ চাচ্ছি। আমার 'গোস্তাখী' হয়ে গেছে। আপনারা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন আমি আসলে এর বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব যা বলে তাই আপনারা পূর্ণ করেছেন। শাহে উন্দলুস আপনাদের যোগ্য প্রশংসাই করবেন।'....

'কিন্তু শাহে উন্দলুসকে তার প্রজাদের ধর্মীয় চেতনার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। এই সিংহাসনে আপনারা বসলে আপনাদেরও চিন্তাভাবনা বদলে যাবে। শাহে উন্দলুসকে যদি সালার বানিয়ে দেয়া হয় তাহলে দুশমনের বিরুদ্ধে তার পদক্ষেপ আপনাদের চেয়েও রক্তক্ষয়ী হবে।'

যারিয়াব তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলতে লাগলো।

যেভাবে বলে সে পুরো দরবারে আধিপত্য বিস্তার করে রাখে। তার কথার মধ্যে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ঝলকও মাঝে মধ্যে ফুটে উঠতে লাগলো। যেটা ক্রমেই শাহ উন্দলুসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে গেলো। আরেক প্রভাব বিস্তারী হলো সুলতানা। যে আবদুর রহমানের এত কাছ ঘেঁষে বসে ছিলো যে, তার দেহের উষ্ণতাও তিনি উপভোগ করছিলেন। সুলতানার দিকে তাকালেই দু'জনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস একাকার হয়ে যেতে লাগলো।

'তোমাদের দু'জনের নেতৃত্বে যা করা হয়েছে তা খুব ভালো করা হয়েছে। ব্যাপারটি এখানেই শেষ করে দাও।' আবদুর রহমান ফয়সালা শোনালেন।

'ওদের দু'জনকে কি ছেড়ে দেয়া হবে না-যাদেরকে উনারা ধরে নিয়ে এসেছেন?' সুলতানা বললো, 'অমুসলিম প্রজারা না আবার বলে যে, ইসলাম এক জালিম ধর্ম।'

'হ্যাঁ, ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক।' আবদুর রহমান বললেন।

হাজিব আবদুল করীম রাগে ফেটে পড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সালার আবদু ররউফও উঠলেন।

'আমীরে উন্দলুস!' হাজিব দরবারী আদব ও নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে বললেন, 'আপনি ভালো করে বিশ্রাম নিন। আমরা জীবিত আছি। ইসলামকে আমরা জীবন্ত রাখবো। ইসলামের হেফাজত করবে সেসব শহীদদের আত্মা যাদের লাশ আপনার দরজায় পড়ে আছে। আর যাদেরকে আপনি এক নজর দেখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না।'

'আপনি না দেখুন আমীরে উন্দলুস! ওদেরকে আল্লাহ দেখছেন।' সালার রউফ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন।

'আপনারা বসুন।' আবদুর রহমান এমন কণ্ঠে বললেন যাতে শাহী উত্তাপ ছিলো না, 'আমি আপনাদের কথা শুনছি। আমার কথাও আপনারা শুনুন।'

'উন্দলুস যদি আপনার জায়গীর হতো তাহলে আপনার হুকুম ছাড়া তো নিঃশ্বাসও নিতাম না।' ওযীর আব্দুল করীম আবেগ-উত্তেজনায় আপ্লুত হয়ে বললেন, 'এটা আল্লাহর পবিত্র মাটি। ইসলাম এখনো এসে কাউকে ভয় পায়নি। কারো আক্রমণের শিকার হবে সে চাপও অনুভব করেনি। মাথা উঁচু করে রেখেছে সবসময়।'.....

'আমরা ইসলাম ও ইসলামী সালতানাতকে যে কোন ধরনের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবো। এমনকি সে বিপদ বা আশংকা কিংবা অনিশ্চয়তা যদি আপনার পক্ষ থেকে ও হয় তবুও আমরা এর কোন পরোয়া করবো না।'

'আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত যে, আমার কথা আপনাদেরকে' যারিয়াব বলতে লাগলো।

'আমাদের দৃষ্টিতে তোমার তো সামান্যতম মূল্য নেই?' সালার রউফ তার কথা শেষ করতে না দিয়ে চরম ঘৃণা উপচানো কণ্ঠে বররেন, 'খেলাফত ব্যবস্থায় তোমার মতো চামচা জাতীয় লোককে কোন মূল্যই দেয়া হয় না। কিন্তু আমাদের সম্মিলিত দুর্ভাগ্য যে, তুমি অনেক কিছুই এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো। তোমার ও এই মহিলার তো এই কামরায় থাকারও অধিকার ছিলো না। সালতানাতের বিষয়ে তোমাদের মতামতের তো কানাকড়িও মূল্য নেই।'

'আমরা যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি। আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদেরকে অপরাধী মনে করলে জল্লাদের হাওলা করে দেবেন।' হাজিব বললেন।

দু'জনই আবদুর রহমানের অনুমতি না দিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলেন।

'দাড়াও তোমরা! আমি শহীদদের সবসময় সম্মান করি।' আবদুর রহমান এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

তারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবদুর রহমান উঠলেন এবং তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। এখন তার পদক্ষেপে লড়াকু দীপ্তি। সুলতানা ও যারিয়াবের প্রভাবমুক্ত তিনি এখন। তার ওপর কোন নেশা সওয়ার হয়ে নেই। তার দেহ ঋজু হয়ে গেলো। মাথা উঁচু হয়ে উঠলো।

'আমি তো এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি।' আবদুর রহমান এক হাত আবদুল করীমের কাঁধে আরেক হাত আবদুর রউফের কাঁধে রেখে বললেন, 'আমি এই ঘটনার ব্যাপারে ভালো করে চিন্তাও করতে পারিনি।'

'জেগে উঠো আমীরে উন্দলুস! জেগে উঠো। দুশমন জেগে উঠেছে।' হাজিব বললেন।

দু'জনে আমীরে উন্দলুসকে সেখানেই রেখে বেরিয়ে গেলেন।

✻✻✻✻✻

আবদুর রহমান জানালার বহু পরতের কচি দেয়া পর্দাগুলো সামান্য সরিয়ে বাইরে তাকালেন। সে সময় হাজিব ও রউফ শহীদদের লাশ উঠাচ্ছিলেন।

'খ্রিষ্টানদের লাশ ও এই দুই কয়েদী এখানেই থাকবে?' প্রহরী জিজ্ঞেস করলো।

'শাহে উন্দলুস যে হুকুম দেবেন তাই পালন করবে। শুধু শহীদদের লাশ এখান থেকে যাচ্ছে।' সালার রউফ বললেন।

আবদুর রহমান শহীদদের লাশগুলো যেতে দেখলেন। প্রতিটি লাশ কাঠের একেকটি তখতায় রাখা হলো। প্রতিটি তখতা চারজন করে সিপাহী বহন করছিলো। শহীদদের ছোট খাটো এই মিছিলটি বড় নিঃশব্দে যাচ্ছে। চার দিকের পরিবেশ বড় বিষণ্ন, বড় শোক স্তব্ধ।

আবদুল করীম ও আবদুর রউফ লাশের পেছন পেছন যাচ্ছেন। শহীদদের সম্মানে তারা তাদের তলোয়ার কোষমুক্ত করে তাদের সামনের দিকে সোজা করে ধরে রেখেছেন। তাদের ঘোড়া তাদের সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু তারা যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে।

তাদের পেছনে কয়েকজন সিপাহীও আসছে। তারাও তাদের বর্শাগুলো সোজা করে ধরে রেখেছে। কিন্তু তাদের চলার ভঙ্গি শোকস্তব্ধ নয়। তাদের গতি তীব্র। প্রতিটি পদক্ষেপ দৃপ্ত-কঠিন সংকল্পে সুদৃঢ়। আর যারা শহীদদের লাশ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে তারা এমন ঋজুভঙ্গিতে চলছে যেন ওদের কাঁধে শহীদদের বোঝাই নেই।

আবদুর রহমান একবারও সেদিক থেকে দৃষ্টি সরাননি। তার কাছে মনে হচ্ছিলো, শহীদদের এই কাফেলার শোভাযাত্রা বুঝি শেষ হবে না।

তার অনুভূতিগুলো যেন তুমুল ঝড়ের কবলে পড়লো। তার রক্ত টগবগিয়ে উঠলো ঝড়ের তাণ্ডবে। জানালার পর্দা ছেড়ে তিনি ঘুরে গেলেন। তার চোখে মুখে নেশার কোন চিহ্ন নেই। যারিয়াব ও সুলতানা এতক্ষণ ওখানেই ছিলো। যারিয়াব তার মনোভাব বুঝে ফেললো।

'উনারা যা বলেছেন এবং যা করেছেন সবই ঠিক করেছেন।' যারিয়াব বললো আবদুর রহমানকে,

'কিন্তু তাদের আপনার শাহী মান-মর্যাদাকে এমনভাবে উপেক্ষা করা উচিত হয়নি। আমি আমার ভুল মেনে নিচ্ছি শাহে উন্দলুস! কিন্তু মুহতারাম ওযীর ও সালারের এই আচরণকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।'

'কেন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না?' আবদুর রহমান দাপুটে গলায় বললেন, 'তারা পূর্ণ নৈতিকতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। আমার সঙ্গে তাদের ভব্যহীন আচরণকে শুধু আমি উপেক্ষাই করছি না, আমি ওদের শতভাগ প্রশংসা করছি।'.....

'আর যারিয়াব! এবং সুলতানা তুমিও শুনে যাও। আমি তোমাদেরকে ভবিষ্যতে আমার ওযীর বা কোন সালারের সঙ্গে এভাবে কথা বলার অনুমতি দেবো না। এটা সালতানাতের ব্যাপার। এতে তারাই হস্তক্ষেপ করতে পারে যারা এর প্রতি দায়িত্ববান এবং যারা এ সম্পর্কে সবিশেষ অভিজ্ঞ। মনে রেখো, আমার মতোই তাদের হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে।'

যারিয়াব এমনভাবে ঝুঁকে পড়লো যেন আধখানা হয়ে গেছে। এটা দেখে সুলতানাও মাথা নুইয়ে ফেললো।

'সুলতানা! আবদুর রহমান ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'আমার গোসলের ব্যবস্থা করো। তার পরই দুই খ্রিষ্টানকে আমার সামনে হাজির করবে। প্রধান বিচারপতি ওদের শাস্তি দেবেন। তবে আমিও জানতে চাই, ওদের মিশন কি এবং ওরা কি চায়?'

সুলতানা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। আবদুর রহমান শয়ন কক্ষে চলে গেলেন। আর যারিয়াব বের হয়ে সিপাহীদেরকে বললেন, দুই কয়েদীকে তার হাতে ছেড়ে দিতে।

❋❋❋❋❋

গোসলের পর আমীরে উন্দলুস তার সাক্ষাতের বিশেষ কামরায় গিয়ে বসলেন। তার সামনে দুই খ্রিষ্টান কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আছে যারিয়াব এবং প্রধান বিচারপতি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া।

'যদি সত্য না বলো তাহলে এমন শাস্তি দেবো যে, মৃত্যুর চেয়ে তা হবে জঘন্য। মরবেও না, আবার বেঁচেও থাকতে চাইবে না।' আবদুর রহমান কয়েদীদেরকে বললেন, 'এটা কোন্ কোন্ মাথার আবিষ্কার? আমি অবশ্য সেই কুট-বুদ্ধির মাথাওয়ালাদের প্রশংসা করি। কিন্তু ওরা শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। যদি তোমরা দু'জন বলে দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে ছেড়েও দিতে পারি।'

'আমরা কি অপরাধ করেছি, কি পাপ করেছি?' তাদের একজন এমন গলায় বললো যাতে রাগ, ক্ষোভ এবং অত্যাচারিতের আর্তনাদ ফুটে উঠলো, 'আমরা আপনার প্রজা। আপনার ওযীর ও সালারের বিপক্ষে তো আমাদেরকে মিথ্যাবাদীই বলবেন। কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু অন্যরকম। আমাদের ঐ গির্জায় আপনার হাকিমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যেটা হযরত ঈসা (আ) এর যুগ থেকে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছিলো।'.....

'সে গির্জাকে আপনারা পরিত্যক্ত বলবেন; কিন্তু এই গির্জা আমাদের কাছে এতই পবিত্র যেমন আপনাদের কাছে কাবা শরীফ। আমরা কখনো কখনো রাতে ওখানে ইবাদত করতে যাই। আমরা যখন ইবাদত করছিলাম তখন আপনার সিপাহীরা সেখানে গিয়ে হামলা চালায়। আমাদের সবাইকে হত্যা করে দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে। আমরা যেহেতু কয়েদী হয়ে এসেছি এজন্য আপনি আমাদেরকে অপরাধী মনে করবেন এটাই তো স্বাভাবিক।'

'ইসলাম কি কখনো অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে আগুন দেয়ার অনুমতি দেয়?' অপর কয়েদী তর্ক করার ভঙ্গিতে বললো, 'এই যে দেখুন ঈসা মাসীহের মূর্তি এখানে পড়ে আছে। আপনার সালার ওখান থেকে ছিনিয়ে এনে এখানে ফেলেছে। আপনি যদি আশা করেন এভাবে ভয়-ভীতি দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো তাহলে কখনো আপনার এ আশা পূর্ণ হবে না।'

ইয়াহইয়া! আমি কি এটা মেনে নেবো যে, আমার প্রধানমন্ত্রী ও এক সালার মিথ্যা বলেছে?' আবদুর রহমান প্রধান বিচারপতিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া কী জবাব দেবেন এটা চিন্তা করছিলেন, তখনই এক কয়েদী বলে উঠলো,

'ওযীর ও সালার তো আমাদের মতোই মানুষ, উনারা তো কোন ফেরেশতা নন। উনারা আমাদের ওপর যে জুলুম করেছেন সেটা উনাদের ধর্মের স্বার্থেই করেছেন। কিন্তু তারা পুরো খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে যে নিজেদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছেন সেটা বুঝতে পারেননি।

আমরা আপনার অনুগত প্রজা। ফ্রান্সের বাদশাহ লুই ও ওদিকে আলফাঁসো খ্রিষ্টান। কিন্তু তাদেরকে আমরা এজন্য দুশমন মনে করি যে, তারা আপনার ও সালতানাতে উন্দলুসের দুশমন।'

'এদের দু'জনকে বাইরে নিয়ে যাও। আমাকে কিছু একটা ভাবতে দাও।' আবদুর রহমান বললেন।

দুই কয়েদীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। যারিয়াবের ঠোঁটে হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ইয়াহইয়া গভীর চিন্তা-মগ্ন। আবদুর রহমান নিজেন মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

তিনি ও ইয়াহইয়া তো জানেন না, আব্দুর রহমান যখন গোসলের জন্য চলে গেলেন, তখন দুই কয়েদীকে যারিয়াব অনেক কিছুই শিখিয়ে দেয়। এখানে যারিয়াবের শেখানো বুলিই ওরা আওড়ে যায়।

'আমি কি আমার ওযীর ও সালারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবো?' আবদুর রহমান ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজেই জবাব দিলেন, 'না, আমি এমন কিছুই করবো না।'

'ওদের বিরুদ্ধে আপনার কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত হবে না শাহে উন্দলুস!' যারিয়াব তার সঙ্গে তাল মেলাতে মেলাতে এবং আবদুর রহমানের মাথায় তার ফয়সালা ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আপনি দুই সালারের শত্রুতা সামাল দেয়ার ঝুঁকি নিতে পারেন না। আবদুল করীম একজন ওযীর এবং সালারও। উনারা অনেক বড় ভুল করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়া যাবে। আমি খ্রিষ্টান নাগরিকদেরকে শান্ত করতে পারবো। এই দুই কয়েদীর মুক্তির হুকুম দিয়ে দিন।'

'আপনি ওদের মুক্ত করতে চাইলে মুক্ত করতে পারেন।' ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া বললেন, 'কিন্তু এটা ভুলবেন না, বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমি জানতে পেরেছি, যে পুরনো ও পরিত্যক্ত গির্জায় আগুন লেগেছে সেখানে কিছু সন্দেহভাজন খ্রিষ্টান রহস্যজনক কায়দায় খ্রিষ্টানদেরকে ভীত ও আতংকিত করে তুলেছে.....'

'এরপর তারা খ্রিষ্টান নাগরিকদেরকে হুকুমাতে উন্দলুসের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। তবে গির্জায় কারা আগুন দিয়েছে সেটা জানা সহজ হবে না।.....আমার পরামর্শ হলো, এই খ্রিষ্টান দুই কয়েদীকে ছেড়ে দিন এবং খ্রিষ্টানদের গোপন তৎপরতার ওপর নজর রাখুন। গির্জায় আগুন লাগিয়ে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে আপনি নেভাতে পারবেন না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন।'

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তাদের সঙ্গে তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিলো। এজন্য তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিতে কথা বলছিলেন। আর যারিয়াব তো খ্রিষ্টানদের এজেন্ট। কিন্তু আবদুর রহমান তার ব্যাপারে খুবই প্রভাবান্বিত ছিলেন। এজন্য তিনি তাদের পরামর্শ মতোই ফয়সালা শোনালেন, দুই কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়া হোক।

আবদুর রহামন যখন এ ফয়সালা শোনাচ্ছেন তখন কর্ডোভার গির্জাগুলোয় ঘরা-তবলা বাজতে লাগলো। কোনটার আওয়াজ ভারি, কোনটার আওয়াজ হালকা। এক সুর তালে শৃংখলিত হয়ে ঘরা বেজে চলেছে। এসব বাজানোর সময় নয় এটা। মনে হচ্ছিলো, কোন ভয়াবহ কিছু ছুটে আসছে।

'কি হলো ওদের? মনে হচ্ছে ওদের ওপর কোন আপদ নেমে এসেছে?' আব্দুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা আপদের চেয়ে কম কী যে, ওদের প্রাচীন এক গির্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।' যারিয়াব বললো, 'এটা শোকের বাজনা। আমরা তো কারো কান্না বা বিলাপ করতে বাঁধা দিতে পারি না শাহে উন্দলুস! আপনি পেরেশান হবেন না। আমি ওদেরকে সামলে নেবো।'

❋❋❋❋❋

আগুন লাগা গির্জায় পাহাড়ের ওপর হওয়ায় আগুনের শিখা কর্ডোভার মানুষ দেখেছে। ওদেরকেই কয়েক দিন আগে হযরত ঈসা (আ) এর আত্মপ্রকাশ দেখানো হয়েছে এবং তার পয়গামও শোনানো হয়েছে। যাতে হযরত ঈসা ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। রাতে ওরাই আবার হযরত ঈসা (আ) কে দেখতে গিয়েছিলো।

গির্জায় যখন আগুন লাগলো এমন ছুটোছুটি শুরু হলো যে, লোকজন এলেপাথারি পালাতে লাগলো। কয়েকজন তো ছুটন্ত মানুষের ধাক্কা খেয়ে পড়ে চিরাচ্যাপ্টাও হলো। এসব আতংকিত মানুষ সারা শহরেই নয়, উপশহর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভয়ংকর সব গুজব ছড়িয়ে দিলো। এজন্য খ্রিষ্টানরা গির্জার ঢোলের আওয়াজ শুনে গির্জার দিকে ছুটে যেতে লাগলো।

'...........আর তোমরা তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছো? প্রতিটি গির্জায় এসব কথার গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিলো।

প্রত্যেক পাদ্রীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু একটাই,

'আজ তোমাদের ঐ গির্জায় মুসলমানরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, যেখানে খোদার পুত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো। এই গির্জাই তার অনেক প্রিয় ছিলো।

তিনি বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের দুশমনের হাতে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

কোন কোন গির্জা থেকে এরকমও শোনা যেতে লাগলো,

'ঈসা মাসীহ তাঁর এই গির্জাকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে চির দিনের জন্য চলে গেছেন। যাতে তিনি রাতে এসে উপাসনা করতেন।'

গির্জার ঘণ্টা অনবরত বাজতেই থাকলো। যেন এখন এটা সার্বক্ষণিক বাজতেই থাকবে।

আবদুর রহমানের মন যেন এই 'ডন ডানাডন' একঘেয়েমি শব্দে ঝিমুচ্ছিলো। আবদুর রহমান যখন দরবারে প্রবেশ করলেন তখন যেন গির্জার ঘণ্টা আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেলো।

'বন্ধ করো এসব! আমি তো আমার ফয়সালা দিয়ে দিয়েছি।' আবদুর রহমান গর্জে উঠলেন।

দরবারী সিপাহী বরকন্দাজরা শাহে উন্দলুসের হুকুম পালন করতে ছুটাছুটি শুরু করে দিলো। বাইরে ঘোড়া ছুটানোর আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। আর কিছুক্ষণ পর ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেলো।

'ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেছে শাহে উন্দলুস!' এক দরবারী আবদুর রহমানকে জানালো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবদু রহমান বিরক্তিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'আমার তো কান আছে।'

'কিন্তু আপনি এই তুফানকে কি করে বন্ধ করবেন যা গির্জা থেকে উঠছে?' ওযীর হাজিব আবদুল করীম আবদুর রহমানের পাশে বসা থেকে বলে উঠলেন, 'আপনি সেই বিভ্রান্ত মানুষের মুখ কি করে বন্ধ করবেন যারা গির্জার জন্য আর্তনাদ করছে?.....আমীরে উন্দলুস! আমি এই মাত্র শহীদদেরকে দাফন করে এসেছি?'.....

'শহীদ.....শহীদ' আবদুর রহমান ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'আবদুল করীম! অন্য কোন কথা বলো।.....ভাবতে দাও কিছু.....আমাকে কিছু একটা ভাবতে দাও,'.....

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ওযীর, মন্ত্রী, দরবারী সবাইকে দ্বিধান্বিত ও দুশ্চিন্তায় রেখে বেরিয়ে গেলেন দরবার কক্ষ থেকে।

❋❋❋❋❋

সন্ধ্যায় প্রতি দিনের খবরাখবর আবদুর রহমানকে শোনানো হতো। দু'জন উপদেষ্টা এসব খবর শোনাতো। তবে তারা সরাসরি সেসব আবদুর রহমানকে শোনাতে পারতো না। একজন দরবারী হাকিম ছিলো। সে তাদের কাছ থেকে

শুনে কাঁটছাট করে কেবল সে খবরই শোনাতো যা শুনতে আবদুর রহমান পছন্দ করতেন।

এরপর দরবারে যারিয়াব যখন আধিপত্য বিস্তার করলো তখন থেকে যারিয়াব সে হাকিমকে যা বলে দিতো সে খবরই আবদুর রহমানকে শোনানো হতো।

'লোকে তো খলীফার নাম পর্যন্ত জানে না,' সেদিনের রিপোর্ট শোনানোর সময় আবদুর রহমানকে বলা হলো, 'লোকে শুধু শাহে উন্দলুসকেই চিনে।'

'কোথাও থেকে কি বিদ্রোহের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?' আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন।

'বিদ্রোহ?' রিপোর্ট প্রদানকারী হাকিম হয়রান হয়ে জবাব দিলো, 'কিসের বিদ্রোহ? কী মুসলমান, কী খ্রিষ্টান, সবাই তো আপনার নাম শুনলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। বিদ্রোহের চিন্তা করবে এত বড় দুঃসাহস কার?'

প্রতিদিনই তাকে এভাবে খোদার পরের আসনে বসিয়ে দেয়া হয়। এজন্যই আমীরে উন্দলুস দরবারী তোষামোদকারীদেরই চোখে প্রজাদের দেখতেন এবং তাদের কানেই বাইরের সবকিছু শুনতেন।

যেদিন অনবরত গির্জাগুলোয় ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে খ্রিষ্টানদেরকে বিদ্রোহের জন্য উস্কিয়ে দেয়া হচ্ছিলো সেদিন সন্ধ্যায়ও আবদুর রহমানকে এ খবরই শোনানো হলো যে, সবকিছু ঠিক আছে। প্রজারা তার নামে সিজদায় পড়ে আছে।

এসব দরবারীদের কথায় আবদুর রহমানের মতো বিচক্ষণ, দূরদর্শী শাসক, রণকুশীল নেতা, যাকে শাহ লুই ও দ্বিতীয় আলফাঁসো পর্যন্ত ভয় পেতো সেই তিনি তোষামোদকারীদের কথায় সবসময় এতই প্রভাবান্বিত থাকেন যে, তার এই উপলব্ধিও হয়নি, তিনি যা বলছেন, যা করছেন, তাকে দিয়ে যা বলানো হচ্ছে এবং যা করানো হচ্ছে সেটা এক সময় ইতিহাস হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে সেটা হবে ইসলামের ইতিহাস।

ইতিহাস যেমন শোকার্ত দৃষ্টান্ত হয় তেমনি আলোকবর্তিকাও হয়। পরবর্তী প্রজন্ম এতে যেমন পথভ্রষ্ট হয় তেমনি তার গন্তব্যের দিশাও পায়। পথভ্রান্ত হওয়া বা গন্তব্যের দিশা পাওয়াটা নির্ভর করে পূর্বপুরুষরা ইতিহাসের সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে না সত্যবাদিতায় অটল থেকেছে।

যে জাতির ইতিহাসে তোষামোদকারী ও গাদ্দারদের হস্তক্ষেপ থাকে সে জাতির ইতিহাস অতিরঞ্জন আর মিথ্যার পসরায় কলুষিত থাকে। মানুষ মানুষকে আত্মপ্রসাদ লাভকারী বানাতে পারে, বানাতে পারে রাজা বাদশাহ, মন্ত্রী, হাকিম, আমীর উমারা। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ জবাব হয়ে থাকে বড় ভয়ংকর।

মোঘলরা উপমহাদেশের ও বনী উমাইয়ারা উন্দলুসের যে ইতিহাস লিখেছে, তা মূলত দরবারীরা লিখেছে। যা নিয়ে আজ আমরা গর্ব করে থাকি। এদিকে তাজমহল, শাহী মসজিদ, কুতুব মিনার, আর ওদিকে আলহামরা ও কর্ডোভার মসজিদকে দেখে আমরা মিথ্যা আবেগে ভেসে যাই।

সোনালী ইতিহাস নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু এটা খুব কমই চিন্তা করি যে, যারা এসব দৃষ্টি নন্দন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নির্মাতা তারা কেন আজ ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে? তাদের কেন পতন হলো? ইসলামী বিশ্ব কেন ছোট হতে হতে আজ অস্তিত্বহীন আর কংকালসার হওয়ার পথে?

❋❋❋❋❋

সেদিন সন্ধ্যায় আবদুর রহমানকে যে রিপোর্ট দেয়া হলো, তাতে গির্জার আগুনের প্রতিবাদে খ্রিষ্টানরা প্রতিটি গির্জায় কি করছে তার কোন উল্লেখই রইলো না। অবশেষে আবদুর রহমান নিজেই জিজ্ঞেস করলেন,

'খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে কি কোন খবর নেই?'

'এমন বিশেষ কিছু ঘটেনি যে, গুরুত্ব দিয়ে সেটা আপনাকে শোনানো হবে।' তাকে জবাব দেয়া হলো।

আর তখন আবদুর রহমানের পলকেই মনে হড়লো ওযীর আবদুল করীম ও সালার আবদুর রউফের শব্দগুলো, যা তারা সেদিন সকালে বলেছিলেন, 'আপনি বিশ্রাম করুন, আমরা বেঁচে আছি। ইসলামকে আমরা জীবন্ত রাখবো। ইসলামের অজেয় প্রহরী হয়ে থাকবে সে সব শহীদদের পবিত্র আত্মা, যাদের লাশ আপনার দরজায় পড়ে আছে।'

'বিশেষ কিছু যদি ঘটে না থাকে তাহলে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি কেন বাজছিলো অনবরত?' আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো সেসব শহীদদের কথা আজ একবারও উল্লেখ করলে না, যাদেরকে আজকেই মাত্র দাফন করা হয়েছে। লোকেরা নিশ্চয় তাদের জানাযায় শরীক হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো মন্তব্যও করেছে এ বিষয়ে। নিজেদের বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে।'

'শাহে উন্দলুসের এত সময় থাকা উচিত নয় যে, সামান্য সামান্য কথায় তিনি পেরেশান হয়ে উঠবেন।' যারিয়াব বললেন, 'এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব যে মন্ত্রণালয়ের সে মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলে দেয়া হয়েছে। শাহে উন্দলুসের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।'

গির্জার ঘটনায় যে দুই খ্রিষ্টান গ্রেফতার হয়েছিলো সে দিনই রাতে তারা কর্ডোভা থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দুরে ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু, উন্দলুসের সন্ত্রাসী লিডার ইউগেলিসের কাছে অবস্থান করছিলো। মুক্তিপ্রাপ্ত দুই

খ্রিষ্টান ইউগেলিসকে বলছিলো, পরিত্যক্ত সেই গির্জায় ঈসা (আ) এর আত্মপ্রকাশ নিয়ে যে নাটক খেলা হয়েছিলো সেটা ব্যর্থ হয়েছে।

তারা বিস্তারিত শোনালো, গত রাতে গির্জায় কি কি ঘটেছে এবং এতে তাদের সাময়িক ব্যর্থতা হলেও পরিণাম এমন হয়েছে যে, বলা যায় ওদের উদ্দেশ্য খুব ভালো করেই পূরণ হয়েছে। তারা আরো জানালো, গির্জার ঘটনাকে কিভাবে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

'তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়ার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, আবদুর রহমান এ ঘটনাকে তেমন গুত্ব দেননি? ইউগেলিস বললো, 'হুকুমতের কি খবর?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' এক খ্রিষ্টান বললো, 'শাহে উন্দলুসের সামনে আমাদের নিয়ে যাওয়ার আগে যারিয়াব আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বলে দেন আমাদের কি কি করতে হবে। যারিয়াব ও সুলতানা আগেই শাহে উন্দলুসের ধ্যান ধারণা তাদের মতো করে বদলে নিয়েছে। আমরা মজলুমের অভিনয় করে বলি, আপনার মন্ত্রীদের হুকুমে আমাদের গির্জায় আগুন লাগানো হয়েছে।'

'শাহে উন্দলুসের হেরেমের দুই খ্রিষ্টান মেয়ে আমাদেরকে বলে দিয়েছে, আবদুর রহমানের মাথা পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে।' আরেকজন বললো, 'আর এ ঘটনাকে তিনি তেমন কিছু মনে করছেন না।'

'..... আর গির্জাগুলোয় খ্রিষ্টানদের ভিড় বাড়ছে।' একজন বললো, 'ওদেরকে এখন উত্তেজিত করতে করতে আগুন উত্তপ্ত করে দেয়া হয়েছে।'

'মুসলমানদের মধ্যেও আমি এর প্রভাব দেখেছি। অনেক মুসলমানই মেনে নিয়েছে, হযরত ঈসা (আ) এর সত্যিই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো। এই আগুন তারই বদদোআয় লেগেছে।' দ্বিতীয় জন বললো।

'এই আগুন এখন আর আমরা নিভতে দেবো না।' ইউগেলিস সব কথা শুনে বললো, 'তোমরা কর্ডোভা ফিরে যাও। আমি মারীদা যাচ্ছি।'

❋❋❋❋❋

ইউগেলিস এক পাদ্রীর ঠিকানায় উঠেছিলো। পাদ্রী জিজ্ঞেস করলেন, সে কেন মারীদা যাচ্ছে। কর্ডোভা কেন যাচ্ছে না। কারণ, বিদ্রোহের আন্দোলন তো কর্ডোভা থেকেই শুরু হয়েছ। এখন সেখান থেকেই এর তৎপরতা আরো বেগবান হওয়া উচিত।

'পুরো উন্দলুস আমার চোখের সামনে রয়েছে।' ইউগেলিস বললো, 'বর্তমানে মারীদার অবস্থা এমন হয়ে আছে যে, শুধু একটি আগুনের ফুলকি ছেড়ে দিলেই হবে। এজন্য আমার সবচেয়ে কাছের সঙ্গী ইলওয়ার ওখানে গিয়েছে।'

সেখানে একজন মুসলিম হাকিম আছেন, যাকে আমরা বিদ্রোহের জন্য ব্যবহার করতে পারবো। আমি চেষ্টা করছি, বিদ্রোহের অপবাদ আমাদের ওপর আসতে না দিয়ে কোন মুসলমান নেতার ওপর চাপিয়ে দিতে।'

'এমন মুসলমান আপনি কি পাবেন যে নিজের হুকুমতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে?' সে পাদ্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ভয় হয় কোন মুসলমান না আবার আপনার হিতাকাঙ্খী সেজে আপনাকে কয়েদখানা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আপনি না থাকলে এই আন্দোলনও এখানে শেষ হয়ে যাবে। সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে যেন কেউ তার জালে ফাঁসিয়ে ফেলতে না পারে।'

'নারী ও ধন সম্পদের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, এ শক্তি আপনি বাধ্য করতে পারবেন নিজের ইবাদতখানায় আগুন লাগিয়ে দিতে।' ইউগেলিস বললো, 'আমি যতটা পবিত্র ইঞ্জীল বুঝেছি ততটাই কুরআন শরফি বুঝেছি। এই দুই আসমানী কিতাবেই মানুষকে খোদা তাআলা প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।'......

'উভয় কিতাবেই খোদা বলেছেন, যে নারীকে ভালো লাগবে তাকে বৈধ পন্থায় বিয়ে করে ফেলো। বিয়ে ছাড়া কোন নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কুরআন বলে, ব্যাভিচারকারী নারী পুরুষকে পাথর মেরে হত্যা করে দাও। ইঞ্জীলেও এ ধরনের হুকুম দেয়া হয়েছে।'.....

'কেন? এমন কঠিন শাস্তি কেন নির্ধারণ করা হলো? কারণ, একজন রূপসী নারী পুরো একটি দেশ ও জাতিকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে লক্ষ লক্ষ সৈন্যও তা করতে পারে না।.....নারীর মধ্যে রয়েছে এক তীব্র আকর্ষণ, অপ্রতিরোধ্য এক নেশা ও অদৃশ্য এক জাদু। পৃথিবী বিখ্যাত বীর যোদ্ধাকেও রাজ সিংহাসন থেকে নামিয়ে পথের ফকির বানিয়ে দিয়েছে এই নারীই।'.....

'তবে এর চেয়েও ভয়ংকর নেশার জিনিস হলো ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতার। যে কাউকে ক্ষমতার লোভ দেখাবে সে তার সুন্দরী মেয়েদেরকেও নিলামে তুলতে দ্বিধা বোধ করবে না। সে মিথ্যা বলবে। নিজের ধর্ম এমনকি খোদাকেও সে ধোকা দিতে চেষ্টা করবে।

একদিকে সে ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে। অন্যদিকে কয়েদখানার দরজা খুলে দেবে। কাউকে নজরানা আর বখশিষ দিয়ে বিত্তশালী বানিয়ে তার অনুগত করে নেবে। আবার কাউকে কয়েদখানায় ছুড়ে মেরে নিজের ক্ষমতা ও সিংহাসন অক্ষত রাখবে।'

'তারপরও আমার আশংকা হচ্ছে আপনি ধোকা খেতে পারেন।' পাদ্রী বললেন, 'বহু পরীক্ষিত নীতি-দর্শন ও কলাকৌশলও ব্যর্থ হয়ে যায়।'

'যদি আবদুর রহমানের মতো বিচক্ষণ ও দূরদর্শী একজন মুমিন পুরুষ এক নারীর মায়াবী জালে পা দিয়ে এমন বেহুঁশ হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তো দুনিয়ার এমন কোন মানুষ নেই যাকে আমরা মোহগ্রস্ত করে আমাদের দাবার ঘুঁটি বানাতে পারবো না।' ইউগলিস বললো, 'আমি আপনার মুখে এ শব্দ শুনতে চাই না যে, আমি যা বলছি এবং যা করছি তা পাপ।'.....

'আমার এসব তৎপরতা আমার ধর্ম ও দেশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য। দেশ ও ধর্মের জন্য মিথ্যা বলাকে আমি বৈধই নয়, বরং পূণ্যের কাজ বলে মনে করি। আমি নিজের জন্য শাসন ক্ষমতা চাই না, খ্যাতি চাই না। আমি আমার ব্যক্তিগত সত্তাকে মেরে ফেলেছি।'.....

'আমি মুসলমানদের শাহী খান্দান ও বড় বড় হাকিমদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছি যে, তারা তাদের মানবিক ও মানসিক চাহিদাকে যেন জীবিত রাখে। প্রকাশ্যে মনে হবে ওদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে।'

'কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তাদের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চরম বিভেদ সৃষ্টি করে দাও। ঐক্যের নাম নিশানাও মুছে দাও।'.....

'এমন একজন মানুষ হলেন মারীদার মুহাম্মদ ইবনে জাব্বার। যিনি কোন এক সময় অতি নীতিবান হাকিম ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তাকে আমাদের ঝুলিতে পুরতে যাচ্ছি। আমাদের লোকেরা বেশ কিছুদিন ধরে তার পেছনে সময় ব্যয় করে যাচ্ছে। তাকে আমাদের মতো করে গড়ে তোলা হচ্ছে।'

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার আবদুর রহমানের শাসনামলে (৮২২-৮৫২ খ্রিঃ) ইতিহাসের চরম বিতর্কিত ও নিন্দিত এক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন। তবে তিনি নান্দনিক কোন কাজের জন্য নয়, নিন্দিত কাজের জন্যই ইতিহাসের ঘৃণিত এক ব্যক্তিত্বের পরিচিতি পান।

❋❋❋❋❋

আবদুর রহমানের পিতা আল হাকামের যুগে সরকারি ব্যয়ভার এত বেশি বেড়ে যায় যে, সাধারণ নাগরিকদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। অজুহাত হিসেবে বলা হয়, আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা, বিদ্রোহের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য এবং সীমান্ত এলাকায় দুশমনদের হামলার মোকাবেলার জন্য যেহেতু সেনাবাহিনীকে সবসময় অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় কিংবা লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হয়, এজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার বেড়ে গেছে।

বাস্তবে সরকারি বয়্যভার নয়, বেড়ে গিয়েছিলো শাহী মহলের ব্যয়ভার।

বিশেষ করে আবদুর রহমানের সময় তো সরকারি কোষাগার অর্ধেক খালি হয়ে যায়। যারিয়াব, সুলতানা ও আবদুর রহমানের রক্ষিতারা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি করতে থাকে।

আবদুর রহমান নিজেও তোষামোদকারীদের সামান্য সামান্য কথায় দু'হাত ভরে বখশিষ আর নজরানা দিতে থাকেন। যারিয়াব ও সুলতানাও যাকে চাইতো তাকেই এভাবে বখশিষ দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার প্রদর্শন করতো।

রাজস্ব কর, ভূমি করের সবচেয়ে বড় বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় মারীদার লোকদের ওপর। মারীদার অবস্থান উন্দলুসের একটি প্রদেশের মর্যাদায়। সেখানকার হাকিম গভর্ণরের মর্যাদা পেতো। মারীদার হাকিম তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার।

বিভিন্ন খাতের কর আদায়ের জন্য যদিও সরকারিভাবে অনেক লোক নিয়োগ করা ছিলো তবুও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারকে মারীদার বিভিন্ন শহর, উপশহর ও গ্রামে- গঞ্জে যেতে হতো। বেশ নীতিবান হাকিম হিসেবে তিনি তখন সবার কাছে পরিচিত। কর আদায়ে বেশ কঠোরতাও করতেন। লোকজন এ কারণে তাকে বেশ ভয় পেতো এবং সম্মানও করতো।

সরকারি লোকজন ছাড়াও গ্রাম্য এলাকার কিছু অপরাধ জগতের লোকজনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ রাখতে হয়। যারা মারপিট, লড়াই, গুন্ডামি করে বেড়াতো। এরা তাকে কর ইত্যাদি উসুলে অনেক সাহায্য করতো। এজন্য তারা পুরস্কার বা বখশিষ প্রাপ্তির অধিকারী ছিলো। কিন্তু ইবনে আবদুল জব্বার তাদেরকে করের পয়সা থেকে কিছুই দিতেন না। এটাকে জনগণের আমানত মনে করতেন।

তবে এই দলটির প্রধান নেতা এর সমাধান বের করে ফেলে। সেটা হলো, ছিনতাই-রাহাজানি। গুন্ডা দলের প্রধান তাকে বলে, তারা মাঝে মধ্যে দু'একটা কাফেলা লুট করবে। তবে মানুষ মারবে না। একেই তারা তাদের কাজের পারিশ্রমিক মনে করবে। ধরা পড়লে যেন তাদেরকে গ্রেফতার করা না হয়।

এদের ছাড়া ইবনে আবদুল জব্বারের কাজও চলতো না। তাই তিনি একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলেন যে, এর চেয়ে বেশি মালামাল লুট করা যাবে না এবং বড় বড় বাণিজ্যিক কাফেলা ছাড়া সাধারণ কাফেলা লুট করা চলবে না।

গুন্ডা দল সেটা খুশি মনেই মেনে নেয়ার কিছুদিন পর একটি কাফেলা লুট করলো। লুট করা মাল থেকে ইবনে আবদুল জব্বারকে একটি তলোয়ার উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে গেলো। তলোয়ারের বাট অতি দুর্মূল্যের পাথর ও মোতি দিয়ে তৈরী। লক্ষ্য টাকার কম হবে না তলোয়ারের দাম।

এর দেড় দুই মাস পর লুটেরারা কোটি টাকা মূল্যর দুটি হীরা ইবনে আবদুল জব্বারকে দিলো। এভাবে একের পর এক কাফেলা লুট হতে লাগলো, আর ইবনে আবদুল জব্বারের উপঢৌকনের ঝুলিও ভরে উঠতে লাগলো। আর তিনিও সেগুলো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। যদিও প্রথম প্রথম কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন।

কিন্তু কিছুদিন পর সেটাই স্বস্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

❋❋❋❋❋

এ ধারা চলতে লাগলো। ইবনে আবদুল জব্বার লুটেরাদের নজরানা খুশি মনেই গ্রহণ করতে লাগলেন। তবে তিনি উসুলকৃত করের পয়সায় কোন দুর্নীতি করেননি।

একদিন তিনি মারীদা শহর থেকে কিছু দূরের এক মফস্বল এলাকায় রাজস্ব আদায়ের কাজের তদারকি করতে গেলেন। দু'চারদিন তাকে সেখানে থাকতে হবে। রাতে লুটেরা দলের নেতা তার বাংলোতে এসে হাজির। তার সঙ্গে অতি রূপসী দুটি মেয়ে।

'এটা আপনার জন্য বিশেষ নজরানা।' লুটেরা নেতা বললো, 'এদেরকে এক বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে আমরা পেয়েছি। এরা আপনার সেবা করবে খুশি মনে।'

'এ নজরানার প্রয়োজন নেই আমার। এদেরকে নিয়ে যাও।' ইবনে আবদুল জব্বার বললেন।

'আপনি কমপক্ষে ওদের একজনকে রাখুন। আর দু'জনকে রাখতে চাইলে রাখতে পারেন।' লুটেরা নেতা বললেন।

'আমি লুটের মাল থেকে যে উপঢৌকন গ্রহণ করে থাকি তাও এক ধরনের পাপ।' তিনি বললেন, 'কিন্তু এদেরকে গ্রহণ করে আমি কবীরা গুনাহ করতে পারবো না। নিয়ে যাও এদেরকে।'

তখনই একটি মেয়ে তার পায়ে পড়ে গেলো। আরেকজন হেচকি তুলে কাঁদতে লাগলো।

'আপনার অনেক বড় অনুগ্রহ হবে যদি আপনি আমাদেরকে গ্রহণ করেন।' পায়ে পড়ে থাকা মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাদেরকে এই হিংস্র বর্বরদের হাত থেকে বাঁচান।'

মেয়েগুলো দেখলো, এই লোক বেশ চরিত্রবান। এর কাছে থাকলে এ নিশ্চয় তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

'আপনি আমাদেরকে এভাবে গ্রহণ করতে না চাইলে আমরা আপনার স্ত্রী হতে প্রস্তুত।' দ্বিতীয় মেয়েটি বললো, 'আমাদেরকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করুন।'

দু'জনই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারের সামনে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লো আর কেঁদে কেঁদে তার কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো যে, তার মন দ্রবীভূত হয়ে গেলো।

'ঠিক আছে, আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করছি,' ইবনে আবদুল জব্বার বললেন, 'ওদেরকে যদি আমি ওদের মা বাবার কাছে পৌঁছে দিই তোমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারবে না।'

'তাহলে আমাদেরও শর্ত আছে, আমাদেরকে যেন ধরিয়ে না দেয় মেয়ে দু'জন।' লুটেরা নেতা বললো।

'তোমাদেরকে কেউ গ্রেফতার করবে না। তোমরা যাও। ওদের কাছে তোমরা আর এসো না। আমার কাছেই ওরা নিরাপদ থাকবে।' মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার বললেন।

লুটেরা নেতা চলে গেলো।

ইবনে আবদুল জব্বার মেয়েদেরকে বললেন, ওরা এখন নিরাপদ। রাতে ওদেরকে অন্য কামরায় শোয়ানো হবে। তিনি যখন নিজের কাজ থেকে অবসর হবেন তখন তাদেরকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ওদের দু'জনকে ভিন্ন কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। তাদেরকে বলা হলো, তারা চাইলে কামরার দরজা ভালো করে বন্ধ করে রাখতে পারে। তবে ইবনে আবদুল জব্বার এমন সুন্দরী খুব কমই দেখেছেন।

তবুও তিনি নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখলেন।

রাতের দুই প্রহর কেটে গেছে। ইবনে আবদুল জব্বার গভীর ঘুমে অচেতন। কামরায় ঢিম তালে একটি বাতি জ্বলছে। তার চোখ খুলে গেলো। তাকে কেউ মৃদুভাবে ঝাকাচ্ছে। তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তার ঘুম এভাবে মধ্য রাতে ভাঙ্গাতে পারে এত বড় দুঃসাহস কার?

তিনি হড়বড় করে উঠলেন এবং দ্রুত খঞ্জর বের করে ফেললেন। তবে ঘরের অস্পষ্ট আলোয় তার খাটে একটি নারী মূর্তি দেখে তিনি স্থির হয়ে গেলেন।

'কেন এসেছো এখানে? কি চাও?'

'আপনার অনুগ্রহের সামান্য প্রতিদান দিতে?' মেয়েটি মায়াবী গলায় বললো 'আমাকে যদি আপনার উপযুক্ত মনে না করেন তাহলে বলুন কিভাবে আপনার ঋণ আমি শোধ করবো?'

মেয়েটি তার পাশে খাটে বসে পড়লো।

'আমি কোন অনুগ্রহ করিনি মেয়ে!' ইবনে আবদুল জব্বার বললেন, 'আমাকে প্রতিদান না দিয়ে বরং পেরেশান করছো। আমাকে মন্দ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছো তুমি।'

মেয়েটি তার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে চোখে চোয়ালো। তারপর হাতে চুমু খেলো। এরপর দু'হাত তুলে নিজের বুকের ওপর রাখলো। ইবনে আবদুল জব্বারের যৌবনকাল এখন স্মৃতি হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগেও যৌবনের যে উত্তাপ ছিলে সেটা তো এখন আর নেই। কিন্তু মেয়েটি তার সেই ক্ষয়ে যওয়া যৌবনে যেন নতুন করে পানি ঢাললো।

নির্জন রাত, উদ্ভিন্ন যৌবনা অপরূপা একটি মেয়ে। মেয়েটির তীব্র কামনার মায়াবী জাল এসব কিছুই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারের বিবেকবোধ থেকে পরিণতির চিন্তা দুর করে দিলো।

রাত শেষে যখন ভোরের আলো ফুটলো ইবনে আবদুল জব্বারের সামন এক নতুন দুনিয়া উন্মোচিত হলো। তার এত দিনের অভ্যস্ত জীবনে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব ছিলো, নিষ্ঠা ও চরিত্রমাধুরীময় যে জীবন পদ্ধতি ছিলো সে দুনিয়া তার পাল্টে গেলো। আজ তার দুনিয়ার সবকিছুই অপরূপ মনে হতে লাগলো।

যেখানে দু'তিন দিন থাকার কথা ছিলো সেখানে তিনি দশ বার দিন রইলেন। তার তো মারীদায় ফিরে যেতেই হতো। কিন্তু মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। মেয়ে দুটিকে সেখানেই রাখার বন্দোবস্ত করলেন। লুটেরা নেতাকে ডেকে বললেন, ওদেরকে যেন খুব যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়। তিনি সময় পেলেই এখানে আসবেন।

লুটেরা প্রধান ওদের জন্য দু'জন লোক রেখে দিলো।

'মনে হচ্ছে তোমরা বেশ সফলই হয়েছো।' মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার চলে যাওয়ার পর লুটেরা প্রধান মেয়েদের কাছে গিয়ে বললো।

'তুমি তো বলতে এ লোক পাথরের চেয়ে কঠিন। কিন্তু একে মোমের মতো গলাতে বেশি সময় লাগেনি।' এক মেয়ে বললো।

মুহম্মদের সামনে মাত্র পাপের একটি দরজা খুলেছিলো। তারপর একের পর এক দরজা খুলতেই লাগলো। যে কোন পাপের পথে একটি বিবেকের বাঁধা এসে দাঁড়ায়। পূণ্যবানদের জন্য তো সে বাঁধা একটি পাহাড়ের মতো এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতা সেই পাহাড়কে পলকের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়।

যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার সালতানাতে উন্দলুসের রাজস্বকর থেকে একটি পয়সাও এদিক ওদিক করতে রাজি ছিলেন না, সেই তিনিই খ্রিষ্টীয় চক্রান্তকারীদের বড় মনোরম জালে ফেঁসে গেলেন।

তিনি এমন এক পাপের উড়না নিজের ওপর জড়িয়ে নিলেন, যা থেকে প্রতিটি পাপই জন্মগ্রহণ করে। কয়েকদিন পরপরই বিভিন্ন ছুতোয় সেই মফস্বল এলাকায় আসতে লাগলেন যেখানে মেয়ে দু'টিকে রেখে গিয়েছিলেন।

একটি অতি পুরনো পলেস্তারা খসানো বাড়িতে মেয়েগুলোকে রেখেছিলেন। সেই জীর্ণ বাড়িটি ক্রমেই উজ্জল হতে হতে মহলের রূপ নিলো। একে একে মদ, নাচ-গানের উপকরণ সেখানে আসতে লাগলো।

রাজস্ব করের তহবিল দিন দিন শূন্য হতে লাগলো। ওদিকে লুটেরাদের দলও বড় হতে লাগলো। মুহাম্মদ বিশাল এক এলাকার মুকুটবিহীন সম্রাট বনে গেলেন।

❋❋❋❋❋

অনেক দিন পর তিনি জানতে পারলেন তার চারপাশে যারা জড়ো হয়েছে এবং যারা তার গোলাম হয়ে আছে এরা সব খ্রিষ্টান। এদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা সব নও মুসলিম। যারা প্রকাশ্যে মুসলমান হলেও ভেতর ভেতর খ্রিষ্টান।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার যেখানেই যেতেন তার সঙ্গে একটি মুহাফিজ দল থাকতো। এরা সবাই তার নিজের বাছাই করা লোক। এদেরকে তিনি দু'হাত ভরে পয়সা দিতেন এবং মদ-নারীও ভোগ করতে দিতেন।

এই মুহাফিজরা শধু তার প্রাণই নয়, তার এই রহস্যময় জীবনের কথাও হেফাজতে রাখতো।

একবার সেই দলে নতুন এক মুহাফিজ যোগ দিলো। মুহাফিজরা আসে সেনাবাহিনী থেকে। এই মুহাফিজ আসার পর তার পুরনো সঙ্গীরা তাকে শক্ত করে বলে দিলো, হাকিমের সঙ্গে মারীদার বাইরে যেখানেই যাবে সেখানে যা কিছু দেখবে তা যেন কাউকে না বলে। এর বদলে সে বিরাট বখশিষ পাবে।

হাকিম মুহাম্মদের সঙ্গে একবার সেই মুহাফিজও সেই মফস্বলে গেলো। প্রথম রাতেই সে যা দেখলো এতে তার শিরদাড়া খাড়া হয়ে গেলো। নর্তকী দিয়ে নাচ গান, মদপান, অশ্লীল কর্মকাণ্ড সবই তার চোখের সামনে ঘটলো।

সে কারো সঙ্গে এ ব্যাপারে ভালো মন্দ কোন মন্তব্য করলো না।

পর দিন মুহাম্মদ সেখানে রীতি মতো দরবার সাজিয়ে বসলো। অনেক সাক্ষাৎপ্রার্থীই তার কাছে আসলো বিভিন্ন আর্জি নিয়ে। অধিকাংশই এ আর্জি নিয়ে এসেছে যে তাদের কাছে ট্যাক্স, খাজনা ও অন্যান্য কর দেয়ার মতো পয়সা নেই বা থাকলেও যথেষ্ট পরিমাণ নেই। মুহাম্মদ যে ফয়সালা করলেন, সেটা লোকদের পক্ষে গেলেও দেশের অর্থনীতির বিরুদ্ধে হলো।

মুহাম্মদ কাজ শেসে করে মারীদা ফিরে এলেন। সেই মুহাফিজ এক ছুতোয় তার সালারের সঙ্গে সাক্ষাত করলো। মুহাম্মদ মারীদার বাইরে গিয়ে যা করেন তার বিস্তারিত কর্মকাণ্ড তাকে জানালো।

সেনাবাহিনীসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে আগ থেকেই আলোচনা চলছিলো যে, মারীদার অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এর পরের বার মুহাম্মদের সেই মফস্বলের খাস মহলে অভিযান চালানো হলো। তাকে গ্রেফতার না করা হলেও তার পদ থেকে তাকে পদচ্যুত করা হলো। তারপর আরেক নতুন হাকিম নিয়োগ করা হলো।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার লুটেরাদের দলে চলে গেলেন। লুটেরাদের দলটি এখন সেনা ইউনিটের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দলে এখন কয়েকজন সরদার আছে।

তাদেরকে ডেকে মুহাম্মদ বললেন, পুরো এলাকায় হুকুমের মতো করে এ ঘোষণা দিয়ে দাও, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার এখন থেকে মারীদার পরিবর্তে এখানে থাকবেন। কর ইত্যাদির অফিসও এখানে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো এখানে এসে আদায় করতে হবে।

ইউগেলিসের সঙ্গে তখনই তার সাক্ষাত হয়।

'আপনার এটা জেনে রাখা উচিত,' ইউগেলিস মুহাম্মদকে বললো, 'আপনার এখন কোন মূল্যই নেই। আপনাকে যে কোন সময় কতল করা যাবে। কিন্তু আমি চাই, আপনাকে আবার মারীদার আমীর বানাতে। আর মারীদা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশ বনে যাক।'.....

'আপনাকে নও মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা সাহায্য করবে। এরা আপনার ফৌজ হবে। কিন্তু আপনি যদি পূর্বের সেই সরকারি অবস্থান বা পদ বহাল করার জন্য এবং পদমর্যাদা বাগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদেরকে ধোকা দেন তাহলে কল্পনাও করতে পারবেন না, আপনার পরিণাম কী হবে।'

ইউগেলিসের পরামর্শ মতো মুহাম্মদ সবকিছু করবেন এটাই চুক্তি হলো। আর তারা মুহাম্মদকে বাদশাহ বানিয়ে রাখবে। ইউগেলিস চাচ্ছিল, বিদ্রোহের নেতৃত্ব কোন মুসলমানের হাতে থাকবে। সেই মুসলিম নেতা তারা পেয়ে গেলো।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারের এই দ্বিচারী চরিত্রের কথা জানতে পেরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার প্রতি নিন্দাবাদ জানালো এবং এই ঘৃণিত নাম তাদের মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। এক সময় প্রায় ভুলেও গেলো।

মারীদা থেকে নির্বাসিত হওয়ার প্রায় পাঁচ ছয় মাস কেটে গেলো। তবে যে এলাকায় মুহাম্মদ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সে এলাকার ব্যাপারে প্রায় সময়ই খবরাখবর আসতে রাগলো, ওখানে লুটেরারা তাদের রাজত্ব কায়েম করেছে। কিন্তু এরা কারা জানা ছিলো না। ওদের বাদশাহ বনে যান মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার।

নয়া হাকিমের নিয়োগ করা নতুন করপাল এবং কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা ও আরো দশ বারজন মুহাফিজ নিয়ে হাকিম মারীদা থেকে বের হন। উদ্দেশ্য বিভিন্ন এলাকার রাজস্ব আদায়ে তদারকি। তারা মারীদা থেকে কয়েক মাইল দূরের এক পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছলো। একটি মোড় ঘোরার সময় ডান ও বাম দিকে থেকে প্রান্তর বেয়ে এমন তীর বৃষ্টি শুরু হলো যে, একজনও বাঁচতে পারলো না।

তীর খেয়ে যারা ঘোড়া উল্টো দিকে ছুটালো তাদের কেউ বেশি দূর যেতে পারলো না। তাদের লাশগুলো গভীর এক গর্তে ফেলে মাটি ও পাথর দিয়ে চাপা দেয়া হলো।

ট্যাক্স ইত্যাদি উসুল করলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুর জব্বারের লোকজন। মুহাম্মদ সব ধরনের রাজস্বের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। এজন্য তিনি লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি তার ঠিকানা বদলে ফেললেন। কেউ জানতেও পারলো না তার নয়া ঠিকানা কোথায়।

এক দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তার আস্তানা গড়ে তোলা হয়। সেখানে ইউগেলিসেরও যাতায়াত করতে বেশ সুবিধা।

যেদিন নয়া হাকিমের দলটিকে অতর্কিত হামলায় মেরে ফেললো মুহাম্মদের লোকেরা সেদিনই সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ তার সেনাদল নিয়ে কর্ডোভার পথের শেষ মনযিল অতিক্রম করছিলেন। এ সফরে এটাই তার শেষ বিশ্রাম।

•যেখানে তাঁবু ফেলা হলো এর সামান্য দূরে কিছু জনবসতি গড়ে উঠেছে। উবাইদুল্লাহ ফিরতি পথের চারপাশের অবস্থা জরিপ করতে করতে আসছিলেন।

একবার তার ওপর আত্মঘাতি হামলাও হয়। এখানে তাঁবু ফেলার পর তার লোকজন আশপাশের এলাকায় গোয়েন্দা অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। ওরা সাধারণত স্থানীয় গ্রামীন লোকদের পোষাক পড়ে যেতো।

একেবারে কাছের জনবসতিতে যে লোকটি গেলো সে ফিরে এসে উবাইদুল্লাহকে জানালো, ঐ জনবসতিতে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের ইমাম লোকদেরকে বেশ রহস্যজনক কায়দায় ওয়াজ-নসীহত করে।

উবাইদুল্লাহ এশার নামাযের সময় ছদ্মবেশে সেই মসজিদে গিয়ে হাজির হলেন। নামাযের পর লোকজন ঘরে না গিয়ে সেখানেই বসে রইলো। জানা

গেলো, নামাযের পর ইমাম সবাইকে পাঠদান করে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম শিক্ষা দেয়।

'আজ আমি আপনাদেরকে বলবো জিহাদ কী?' লোকদের দিকে ফিরে ইমাম পাঠদান শুরু করলো,

'মুসলমানদের বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের শেষ পরিণতির জন্য কিছু করে যাওয়া। যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করা হোক বা মসজিদে ইবাদত করা হোক উভয়টার সওয়াব সমান। পরকালে এর পরিণামও একই হবে। তাহলে কেন নিজেদের ও অন্যদের বাচ্চাদের এতীম ও নারীদের বিধবা করা হবে? নামাযও একটি জিহাদ। যুদ্ধের ময়দান থেকে মসজিদই উত্তম।'

ইমাম দু'একটি আয়াত পড়লো, কয়েকটি ভিত্তিহীন হাদীস শোনালো। কথায় কথায় বললো, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে কয়েকবার তো এমন হয়েছে যে, তিনি লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একাধারে কয়েকদিন ও কয়েক রাত অনবরত নফল পড়েছেন।

❋❋❋❋❋

'উন্দলুসের বাদশাহ যিনি উন্দলুসকে ইসলামী সালতানাত বলেন এবং আপনাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দেন তিনি বড় বড় পাপের মধ্যে ডুবে আছেন।' ইমাম বললো, 'তিনি মদ পান করেন, সুন্দরী মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে নাচান এবং সবার সামনেই অশ্লীল কর্ম করেন।'.....

'মুসলমান কারো গোলাম নয়। আপনাদের কাছ থেকে যে ভূমিকর, আয়করসহ আরো নাম না জানা কত ধরনের খাজনা আদায় করা হয় এসবের পয়সা আপনাদের বাদশাহর ভোগে বিলাসে খরচ হয়।'

এভাবে ইমাম দেশের বিরুদ্ধে আজে বাজে কথা বলে লোকদের মধ্যে ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে দিতে লাগলো। প্রমাণের স্থলে কিছু কুরআনের আয়াত ও বানোয়াট হাদীসের উদ্ধৃতি দিলো।

তার পাঠদান শেষ হলো। মুসল্লীরা একে একে চলে গেলো। উবাইদুল্লাহ উঠলেন না, বসে রইলেন। তার সঙ্গে দু'জন কমান্ডার ছিলো। তারাও বসে রইলো।

'আপনারা কেন বসে আছেন?' ইমাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো।

'আপনার পাঠদানে এতই মুগ্ধ হয়েছি যে, আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।' উবাইদুল্লাহ বললেন।

'অবশ্যই, অবশ্যই,' ইমাম বললো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছো? আগে তো তোমাদেরকে আর দেখিনি।'

'আমরা মুসাফির । কর্ডোভা যাচ্ছি।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, উন্দলুসের বর্তমান এই পাপিষ্ঠ বাদশাহর বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি? আপনি বলেছেন, বাদশাহ অপকর্ম করে যাচ্ছেন। আর আমাদের পেট কেটে পয়সা নিয়ে ভোগবিলাসে মজে আছেন' ।

'আমার কাছে তো মনে হয় এ ধরনের বাদশাহকে সিংহাসন থেকে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয়াই সবচেয়ে বড় জিহাদ। যাতে খোদার নিরপরাধ বান্দারা তার জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?'

'তোমরা কি আরেকদিন আসতে পারবে?' ইমাম বললো, 'তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

ইমাম উঠে দাঁড়ালো এবং মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো। উবাইদুল্লাহ ও তার কমান্ডাররাও তার পিছু নিলেন। ইমাম যে গলিতে ঢুকতো তারাও তার পিছু পিছু সে গলিতে ঢুকতেন। একবার ইমাম দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমরা আমার পিছু পিছু আসছো কেন?' ইমাম জিজ্ঞেস করলো ভ্রূঁ কুচকে।

'আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা চলতে চাই।' উবাইদুল্লাহ সরল গলায় বললেন।

ইমাম কিছু না বলে আবার হাঁটা দিলো। উবাইদুল্লাহরাও তার পিছু নিলেন। হাঁটতে হাঁটতে ইমাম একসময় জনবসতি থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং খোলা তেপান্তরে গিয়ে উঠলেন। উবাইদুল্লাহ তার পথরোধ করে দাঁড়ালেন।

'ইমাম সাহেব! আপনি কোথায় থাকেন?' উবাইদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এই বসতিতেই থাকি। কিন্তু আমি তো বলেছি একটু বাইরে যাচ্ছি এক কাজে।' ইমাম একটু উষ্ণ গলায় বললো।

'চলুন। এক সঙ্গে আমরাও যাই। অসুবিধা তো আর নেই কিছু।' উবাইদুল্লাহ বললেন।

ইমাম কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে এড়িয়ে যেতে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে উবাইদুল্লাহর চোখের ইংগিতে দুই কমান্ডার খঞ্জর বের করে ফেললো। দুই খ রের ফলা তার দুই পাঁজরে গিয়ে ঠেকলো।

'আমাদেরকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'চালাকি করতে চেষ্টা করবে না। আমার সঙ্গে ফৌজ আছে। বসতির প্রতিটি ঘরে তল্লাসি চালানো হবে। আর বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে তোমার দু'পা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়া হবে।'

রহস্যজনক ইমাম বসতির এক পাশে একেবারে জনবিচ্ছিন্ন একটি বাড়িতে থাকতো। পরে জানা যায় সে বাড়িতে অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিলো না। কারণ বলা হতো, ইমাম সাহেবের কাছে কিছু অশরীরী আত্মা ও জ্বিন পড়তে আসে।

ইমাম উবাইদুল্লাহ ও তার দুই কমান্ডারকে তার সেই বাড়িতে নিয়ে গেলো। বাড়িতে প্রথমেই দুটি অতি সুন্দরী মেয়ে দেখা গেলো। বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর দেখা গেলো, একটি কামরাকে রীতি মতো গির্জা বানিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে ক্রুশ, কুমারী মরিয়াম (আ) ও ঈসা মাসীহের প্রতিমূর্তিও আছে। গির্জাকে যেমন উপাসনার জন্য সাজানো হয় সে কামরাটিকেও খুব যত্ন করে সাজানো হয়েছে।

উবাইদুল্লাহর জিজ্ঞাসাবাদ থেকে জানা গেলো, ইমাম ছয় সাত মাস ধরে মসজিদে ওয়াজ-নসীহতের নামে এভাবে মানুষকে বিকৃত শিক্ষা দিচ্ছে।

কমান্ডাররা সবকিছু উঠিয়ে নিলো। তারপর মেয়ে দুটি ও ইমামকে গ্রেফতার করে ওরা বসতি থেকে বেরিয়ে গেলো। পথ চলতে চলতে ইমাম উবাইদুল্লাহকে লোভাতুর প্রস্তাব দিয়ে বললো,

'আপনারা মেয়ে দু'জনকে নিয়ে নিন। যত টাকা চাইবেন আগামীকালকে পরিশোধ করে দেয়া হবে। চাইলে আপনাদের তিনজনকে এর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে চিরদিনের জন্য দিয়ে দেয়া হবে।'

অন্ধকার রাস্তায় মেয়ে দুটি উবাইদুল্লাহ ও দুই মান্ডারের গায়ে ঘেঁষে ঘেঁষে পথ চলছিলো। নিজেদেরকে অর্ধ উলঙ্গ করে সবরকম জাদু চালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু উবাইদুল্লাহ পাথর হয়ে রইলেন। সঙ্গে দুই কমান্ডারও। তারা কোন কথাই বললো না পথে।

অবশেষে তারা তাদের তাঁবুর শিবিরে পৌঁছে গেলো।

উবাইদুল্লাহ তাদেরকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন।

'তোমরা দু'জন ভালো করে শুনে রাখো,' উবাইদুল্লাহ মেয়ে দু'জনকে বললেন, 'তোমরা এক সেনা তাঁবুতে আছো। তোমাদেরকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তোমরা মিথ্যা বলো তাহলে সৈনিকদের কাছে তোমাদেরকে ছুড়ে দেয়া হবে। এরা সবাই হিংস্র-ক্ষুধার্ত। যে চরম যন্ত্রণা ভোগ করবে সেটা কল্পনা করে দেখো। কখনো তা সহ্য করতে পারবে না। বাঁচতেও পারবে না এবং মরবেও না।'

'আমার প্রস্তাব কি আপনার পছন্দ হয়নি?' ইমাম উবাইদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো। এখন তার সুরে অনুনয় নয়, চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠলো। যেন ধমক দিচ্ছে।

'চুপ বদমায়িশ!' উবাইদুল্লাহ ধমকে উঠলেন, 'এখন আমি তোমাকে তোমার প্রাণ বাঁচানোর প্রস্তাব পেশ করছি। সত্য বলবে তো বেঁচে থাকতে পারবে।'

'সত্য শুনবে?' ইমাম নির্ভয়ে বললো, 'তোমাদের এই সাধের ইসলামী সালতানাতের পতন শুরু হয়ে গেছে। আমরা আমাদের মেয়েদের যৌবনকে ব্যবহার করি বলে আমাদেরকে তোমরা কাপুরুষ বলবে। যা ইচ্ছা তা বলে নাও। কিন্তু আমরা একে কাপুরুষতা মনে করি না।'.....

'এই মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ওরা খুশি মনে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ওদেরকে কেউ বাধ্য করেনি। বরং ওরাই ওদেরকে নিতে আমাদেরকে বাধ্য করেছে। আমরা আমাদের খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিচ্ছি। আমরা এদেশ থেকে মুসলান ও ইসলামকে বের করবোই। আমরা না পারলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্যই সফল হবে।'.....

'আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যে ভয়ংকর ঝড় সৃষ্টি করেছি তার মরণ-ছোবল থেকে তোমরা তোমাদের সালতানাতকে বাঁচাতে পারবে না। আমরা তো তোমাদের ওপর অস্ত্র নিয়ে হামলা করতে পারবো না। তাই তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসকে আমরা পাল্টে দিচ্ছি। পাল্টে দিচ্ছি তোমাদের চিন্তাধারাও।'

'তোমাদের এই দলে কারা কারা আছে এটা কি বলবে না?'

'না' সে জবাব দিলো, 'আমাদের দলে কে বা কারা আছে এটা জেনে কি করবে তোমরা? নিজেদের দলের দিকে মনোযোগ দাও আগে। তোমাদের অনেক মসজিদে মসজিদে ইমামরা লোকদেরকে বিকৃত তাফসীর শোনাচ্ছে। ঐ বেচারাদের জানা নেই, ওরা যে শিক্ষকদের কাছে পড়েছে তারা মুসলমান নয়, খিষ্টান ছিলো।.....

'এখন তোমরা মসজিদগুলোতে বিকৃত তাফসীরই শুনবে। কিছু ইহুদীও আলেম ও ইমামের বেশে তোমাদের ধর্মকে বিকৃত করছে। আর বাকিটা আমার মতো ইমামরা পূর্ণ করছে।'.....

'তোমাকে এত কিছু বলে দিচ্ছি কারণ, তুমি একজন সালার। তোমার জীবন তো লড়াইয়ে লড়াইয়ে কেটেছে। তোমরা নিশ্চয় কুরআন তেলাওয়াত করো। কিন্তু নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তোমরা বুঝেইনি। আমি সেটা বুঝেছি। পবিত্র কুরআন এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান গ্রন্থ।.....

'মুসলমানরা যদি পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা নিয়ে চলতো তাহলে উন্দলুসের সালতানাত এই ইউরোপীয় সমুদ্র থেকে সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করতো যেখানে সূর্য অস্ত যায়।'.....

'কিন্তু এই ইসলামী সালতানাত আজ উন্দলুসেই ভুমিশুন্য হয়ে পড়ছে। এটা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কৃতিত্ব যে, তারা কুরআনকে জাদু ও তাবীজের এক সূত্র

হেসাবে সমাজে প্রচার করে দিয়েছে। তারপর এতে বিভিন্ন বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করে এক একটি আয়াতের একাধিক তাফসীর প্রচার করে দিয়েছে।'

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ নীরবে সব শুনে গেলেন। এখন আর তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। এরা আদাজল খেয়ে ধর্মের বিকৃতি সাধনে নেমেছে। ধর্মীয় সন্ত্রাসী এরা।

উবাইদুল্লাহ মেয়ে দুটিকে তার এক সহকারীর কাছে হাওলা করে দিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। তিনি নিজেও সেই ভূয়া ইমামের কাছ থেকে আরো কিছু জানার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার কাছ থেকে আর বিশেষ কিছুই জানা গেলো না।

রাতের শেষ প্রহরে ছাউনি তুলে কর্ডোভার দিকে কোচ করার হুকুম দিলেন উবাইদুল্লাহ। নকল ইমাম ও দুই মেয়েও সৈন্যদের হেফাজতে দলের সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দিলো।

উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ পর দিন রাতে কর্ডোভায় প্রবেশ করলেন। কয়েদীদেরকে এই হুকুম দিয়ে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন যে, আগামীকাল যেন তার সামনে এদেরকে হাজির করা হয়।

কর্ডোভায় ঢোকার মুখে ওযীর হাজিব আবদুল করীম, সালার আবদুর রউফ, সালার মুসা ইবনে মুসা ও সালার ফারতুন শহরের প্রধান ফটকের বাইরে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমীরে উন্দলুসই এভাবে স্বাগত জানানোর কথা বলে দিয়েছিলেন।

উবাইদুল্লাহ বেশ ক্লান্ত ছিলেন। তবুও ওযীর ও সালারদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন তার হাবেলিতে। পথে যা যা ঘটেছে সবকিছু তাদেরকে সংক্ষেপে শোনালেন। তাকে কিভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো এবং প্রায় অলৌকিকভাবে কি করে তিনি বেঁচে গিয়েছেন তাও জানালেন সবাইকে। কয়েদীদের ব্যাপারেও আলোচনা করলেন।

'তবে একটা জিনিস নিশ্চিত হওয়া গেছে, খ্রিষ্টানরা ময়দানের লড়াইয়ে যেতে চায় না।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'ওরা মাটির নিচ থেকে আমাদের ওপর আঘাত হানতে চাচ্ছে। ফিরতি পথে আমি বহু জায়গায় তাঁবু ফেলি। আর গোয়েন্দা, গুপ্তচর ও টহল সেনা ইউনিট দ্বারা আশপাশ ও দূরদুরান্ত এলাকার অবস্থা জরিপ করি।'.....

'আমি যেসব খবরাখবর পাই এতে আমি নিশ্চিত, আমাদের ভেতর থেকেই কোন বড় ধরনের ফেতনা ফাসাদ লালিত পালিত হচ্ছে। সীমান্ত এলাকার লড়াই

থেকে যে কয়েদী ধরে এনেছি এদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনাসদস্যও আছে। ওদের থেকে কিছু গোপন তথ্য উদ্ধার করেছি। ওরা বলেছে, ফ্রান্সের বাদশাহ লুই উন্দলুসের বিদোহের পেছনে হাওয়া দিচ্ছেন। তার ফৌজ এখানকার খ্রিষ্টানদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।'.....

'আমি তিন তিনবার ইউগেলিস ও ইলওয়ার নামের দু'জন লোকের কথা শুনেছি। জানা গেছে, এরা কট্টর খ্রিষ্টান। খ্রিষ্টধর্মের বড় পণ্ডিত এবং অসম্ভব মেধার অধিকারী। এরা দু'জন এখানকার সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বেশি তৎপর।'.....

'সারা দেশে প্রথমে আমাদেরকে গুপ্তচর বৃত্তির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যমটা যেন খুব দ্রুততর হয়। দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রাম্য এলাকাতেও সেনা চৌকি বসাতে হবে। কারণ, উন্দলুসকে আমি অনেক বড় শংকার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।'

'উবাইদুল্লাহ!' হাজিব আবদুল করীম কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'এখানে তুমি আরো অনেক কিছুই দেখবে। তুমি সীমান্ত অভিযানে চলে যাওয়ার পর এখানে ঈসা মাসীহের আত্মপ্রকাশের নাটকও খেলা হয়েছে।' আবদুল করীম সেই গির্জার পুরো ঘটনা ও এর বিরুদ্ধে তাদের নেয়া পদক্ষেপের কথা শুনিয়ে বললেন,

'আমাদের শাহে উন্দলুস ভয়ংকর সেই অপরাধীদের ছেড়ে দিয়েছেন এবং শহীদদের লাশগুলো পর্যন্ত প্রথমে দেখতে চাননি। তার এই নির্বিকার ভাব দেখে আমরা ভীষণ হয়রান হয়েছি।'

'তোমরা কি তাকে এভাবেই ছেড়ে দিলে?'

'না ভাই! আমি ও আবদুর রউফ তাকে শাহী নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে অনেক কিছুই বলেছি। তাকে লজ্জা দিয়েছি। অতি ক্ষুব্ধ অবস্থায় তার ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।' ওযীর বললেন।

'যারিয়াব ও সুলতানা তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এখন তিনি ওদের মাথা দিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন।' সালার আবদুর রউফ বললেন।

'দরবারে তো তোষামোদকারী চামচা ও তোষামোদে উপদেষ্টাদের শাসন চলছে। অন্ধের মতো নজরানা আর বখশিষ দেয়া হচ্ছে।' সালার মুসা ইবনে মুসা বললেন।

'এর একটাই প্রতিকার।' সালার ফারতুন বললেন, 'এ লোকগুলোর কাউকেই বেঁচে থাকতে দেয়া হবে না। না হয় উন্দলুস থেকে আমাদের সবকিছু নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে।'

'না। সালার উবাইদুল্লাহ বললেন, 'রক্তপাত ও সিংহাসন কেড়ে নেয়ার পরিণাম সাধারণত ভালো হয় না। এতে গৃহযুদ্ধেরও সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে দুশমন তো এর আগুনে তেল-ঘি ঢালতে থাকবে।'.....

'পুরো জাতিই এতে লড়াই করে নিজেদের বৃথা রক্ত ঝরিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। আর দুশমন বড় আরামে আমাদের সীমান্তে ঢুকে পড়বে। তখন আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবো। আমরা যদি আমীরে উন্দলুসকে হত্যা করি তাহলে রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যাবে হত্যা করো আর রাজত্ব করো।'

'কিন্তু এর তো কোন প্রতিকার ভেবে চিন্তে বের করতেই হবে।' সালার ফারতুন বললেন, 'ওদের কাউকে জীবিত রাখা যাবে না। আর না হয় উন্দলুস থেকে আমাদেরকেও জীবিত পালাতে দেবে না খ্রিষ্টানরা।'

'না এতে তো কোন প্রতিকার হবে না এটা আগেই বলেছি।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'তবে একমাত্র প্রতিকার আমার মনে যা আসছে তা হলো আমীরে উন্দলুসকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি গতানুগতিক কোন শাসক হওয়ার কথা ছিলো না। তার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন।'

তার পিতার শাসনামলে সালতানাতের শাসনভার তার হাতেই এক প্রকার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তিনি নিজে লড়াইও করেছেন এবং সেনাদলকে লড়িয়েছেনও। আমি তো বলবো, উন্দলুসে এর চেয়ে যোগ্য কোন শাসক আর পাওয়া যাবে না।'

'আমরা আর কত দিন এর অপেক্ষায় থাকবো?' হাজিব আবদুল করীম বললেন, 'আমরা কিন্তু আবদুর রহমানের মানসিকতায় নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারবো না। আমাদের ঈমান ও স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনা জিবন্ত রাখতে হবে। আমীর কেন খলীফাও যদি বিপথগামী হয়ে যায় তাহলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অনুমতি দেয়। তাকে বাঁধা দিতে বলে। আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু করতে হবে। আবদুর রহমানের সন্তুষ্টি নয়।'

'আমি সকালে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমি ঐ ছদ্মবেশী ইমাম ও তার সঙ্গের মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আমার কথা শুনে তিনি যদি আমার আবেগকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন তখন আমি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে কোন উপায় বের করবো।'.....

'ফ্রান্সের দিক থেকে আমি বেশ শংকিত। ফ্রান্স আমাদের ওপর হামলার করার আগে আমরা যেন ফ্রান্সের ওপর হামলা চালাতে পারি আমীরে উন্দলুসকে এ ব্যাপারে রাজি করতে চেষ্টা করবো।'

'আপনারা সবাই সালার। আপনারা জানেন, দুশমন আপনাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে উঠছে। এজন্যই ওদের ওপর এখনই হামলা করে দিতে হবে। প্রস্তুত

অবস্থায় ওদেরকে পাকড়াও করতে হবে। বড় শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের উন্দলুসকে বাঁচাতে হবে আমাদের। ইসলামের দুর্গকে আমাদের অজেয় রাখতে হবে।'

❋❋❋❋❋

প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহ আবদুর রহমানের সাক্ষাত কামরায় বসে তাকে তার অভিযানের কথা শোনাচ্ছেন। এসব কথা ও ঘটনা সালারদেরকেও একবার শুনিয়েছেন। গির্জায় আগুন লাগার ঘটনার পর আরো কয়েক মাস কেটে গেছে।

'আমীরে উন্দলুস!' উবাইদুল্লাহ বললেন, গির্জাগুলোয় তো হুকুমতে উন্দলুসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা চলে, মসজিদেগুলোতেও এ বিষ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি এক খ্রিষ্টান ও দুটি মেয়েকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছি। এ লোক অনেক দিন ধরে এক মসজিদে ইমামতি করছিলো। আমার দুই কমান্ডার এই খৃষ্টান ইমামকে মসজিদে গিয়ে ওয়াজ করতে দেখে। তারা এসে আমাকে বিস্তারিত জানায়।'.....

'ছদ্মবেশে আমরা সে মসজিদে গেলাম। সে লোকদেরকে প্রতিদিন সবক দেয়। আমি শুনলাম তার সবক। সে পবিত্র কুরআনের বিকৃত তাফসরি করে কুরআনের অবমাননা করছিলো। তারপর সে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করছিলো। তার বাড়িতে তল্লাশি চালালাম। 'বাড়ির এক কামরা থেকে ক্রুশ, ইঞ্জীল, হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আ) এর মূর্তি উদ্ধার করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এই মেয়ে দুটিকেও পাওয়া গেলো।..... ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ওরা জানালো, ওরা খ্রিষ্টান ও ইসলামকে বিকৃত করে প্রচার করছে।'

'তাকে আমি শাস্তি দেবো উবাইদুল্লাহ!' আবদুর রহমান বললেন, 'আপনার এত উত্তেজিত ও পেরেশান হওয়া উচিত নয়। এই এক লোক আমাদের কী ক্ষতি করতে পারবে? ওর সঙ্গী মেয়ে দুটিই বা উন্দলুসের কী বিগড়াতে পারবে?'

উবাইদুল্লাহর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। উন্দলুসের শাসকের এটাও জানা নেই যে, তার হুকুমতের বিরুদ্ধে দেশের আনাচে কানাচে কী তুফান উঠছে। আর তিনি বলছেন, এই এক লোক আর দুটি মেয়ে আমাদের কী ক্ষতি করতে পারবে!

উবাইদুল্লাহ তাকে গির্জার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলে আবদুর রহমান তাকে বললেন, ওযীর আবদুল করীম ও সালার আবদুর রউফ বড়ই ভুল কর্মকাণ্ড করেছে। তারা গির্জায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

'আমীরে উন্দলুস!' প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহ হয়রান হয়ে বললেন, 'আপনি এসব কি বলছেন? মনে হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিতে আপনার আশেপাশে আপনার বিরুদ্ধে কী ঘটছে তা থেকে আপনাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে।'

'আমি তো একজন মানুষের অধিক কিছু নই,' আবদুর রহমান এমন গলায় বললেন যাতে শাহী তেজ বা দাপটের ছিটেফোঁটাও নেই;......

'আমি নিজে গিয়ে তো পুরো দেশের অবস্থা দেখে আসতে পারবো না। আমাকে যা বলা হয় তা আমি সত্য বলে ধরে নিই।'

আবদুর রহমানের সামনে টেবিলের ওপর লম্বা একটি সুবেশী কাগজ পড়ে আছে। এতে বিশাল এক কবিতা লেখা আছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে উবাইদুল্লাহ কবিতাটি পড়ে নিলেন। এটা আমীরে উন্দলুসের প্রশংসায় লেখা হয়েছে। কবিতাটি হাতে নিলেন উবাইদুল্লাহ।

'আমীরে উন্দলুস!' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'উন্দলুস যদি আপনার ব্যক্তিগত কোন রাজত্ব হতো এবং আমি আপনার নিজস্ব কর্মচারী হতাম তাহলে আপনার কাছে এলে প্রথমে ঝুঁকে কুর্ণিশ করতাম, তারপর আপনাকে সিজদা করতাম। এরপর সেসব কথা বলতাম, যা এই কবিতায় আপনার কাল্পনিক প্রশংসায় লেখা হয়েছে।'.....

'আপনার কানে যা কিছু দেয়া হয় তাকেই আপনি সত্য ও সঠিক বলে মেনে নেন।.....কেন? আমীরে উন্দলুস! কেন এমন হবে এবং এমন আর কতদিন চলবে?'

'উবাইদুল্লাহ!' আবদুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, 'তোমাদের কী হয়ে গেলো? আবদুল করীম ও আবদুর রউফকেও মনে হয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি বুঝি ওরা কী বলতে চায়। ওদের মনোভাব সম্পর্কে তো আমি জানি। কিন্তু তোমরা তো দরবারের আদব–শিষ্টাচারের কথাও ভুলে যাও।'

'আর এটাই সেই বিষের বীজ যা আপনি আপনার হাতে উন্দলুসের রগ রেশায় বপন করে চলেছেন।' উবাইদুল্লাহ বেপরোয়া গলায় বললেন, 'প্রথম ভয়াবহ ব্যাপার হলো, আপনি তোষামোদ পছন্দ করেন খুব বেশি। ঐ কবি ও কলমবাজ চাটুকারদের আপনার মনমস্তিষ্কে সওয়ার করে নিয়েছেন, যারা আপনার কেবল স্তুতিই পাঠ করতে জানে।'.....

'আপনার কানে শুধু চাটুকারদের কথাই ঢুকে। আরেকটা বিষের বীজ যেটা আপনি বপন করেছেন। সেটা হলো দরবারের আদব ও শিষ্টাচার। কোন মানুষের কখনো দরবার থাকতে পারে না। ইসলাম একমাত্র আল্লাহর দরবারের কথাই বলে। যাতে আমরা সবাই সিজদাবনত হয়ে থাকি।.....আমীরে উন্দলুস! নিজেকে আপনি খোদা বানাবেন না।'

'উবাইদুল্লাহ! এসব কি বলছো?' আবদুর রহমান গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি কি আমাকে ফেরাউন বানাচ্ছো?'

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এসময় কামরায় যারিয়াব ঢুকলো। প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহকে দেখে প্রথমে থমকে গেলো। তারপর দু'দিকে দুই হাত প্রসারিত করে উবাইদুল্লাহর দিকে এগিয়ে গেলো।

'স্বাগতম! সুস্বাগতম.....বিজয়ী সেনাপতি উবাইদুল্লাহ!'.....যারিয়াব একথা বলে উবাইদুল্লাহর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে এগিয়ে এলো।

উবাইদুল্লাহ কোন পাত্তা দিলেন না। বসে থেকেই শুধু করমর্দন করলেন। যারিয়াব আনন্দ প্রকাশ করতে করতে বললো,

'আমীরে উন্দলুস! আমরা প্রধান সেনাপতির ফিরে আসাতে আনন্দোৎসব করবো। আমার পুরো নর্তকী দল এমন সেরা নাচ নাচবে যা আকাশের নক্ষত্ররাজিকেও নাচিয়ে তুলবে। আমি এমন গান শোনাবো যা আজ পর্যন্ত আপনাকেও শোনাইনি।'

'হ্যাঁ, হাঁ, যারিয়াব!' যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন আবদুর রহমান, 'আমার এই সিংহ, এই উবাইদুল্লাহ ভাই, এতই ক্লান্ত যে, ওর মন মেজায বড় চটে আছে।'

'কিসের উৎসব করবে যারিয়াব!' উবাইদুল্লাহ তীর্যক কণ্ঠে বললেন, 'সে সব শহীদদের শাহাদাত বরণের জন্য উৎসব করবে যাদের ব্যাপারে এখানে দরবারের কারো এটাও জানা নেই যে, ওরা কেন ওদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে?'

এ সময় কামরায় ঢুকলো সুলতানা। সেও যারিয়াবের মতো উবাইদুল্লাহকে দেখে আনন্দে ফেটে পড়ার অভিনয় করে উৎসবের কথা বললো। তারপর আবদুর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়লো।

উবাইদুল্লাহ লক্ষ্য করলেন, তার কথায় আবদুর রহমানের চেহারায় যে থমথমে ভাব ফুটে উঠেছিলো, রাগে প্রায় লালচে দেখাচ্ছিলো। সুলতানার স্পর্শে সে চেহারা অন্যরকম হয়ে উঠলো।

উবাইদুল্লাহর যেন শরীরে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু তিনি নিজের রাগকে বড় কষ্টে চেপে রাখলেন।

'আমীরে উন্দলুস!' তিনি বড় নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে বললেন, 'লড়াইয়ের ময়দানে আত্মবিসর্জনকীদের উৎসব করার আগে আমি আপনার সঙ্গে একা একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।'

উবাইদুল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী লোক। তিনি যারিয়াব ও সুলতানার এই কুট চালের ধরণ বুঝে ফেললেন। তাকে ওযীর আবদুল করীম ও আবদুর রউফ আগেই বলে দিয়েছেন। এরা দু'জন আমীরে উন্দলুসকে একা থাকতে দেয় না। কোন সালার বা কোন উচ্চপদস্থ হাকিম তার সঙ্গে কথা বলতে এলে এরা লেজ তুলে ঠিকই সেখানে পৌঁছে যায়। আর আমীরে উন্দলুসের কান বন্ধ করে রাখে।

ইতিহাস সাক্ষী, উন্দলুসের প্রায় সব শাসকই তোষামোদ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতেন না। তারা ইসলামী খেলাফতের প্রতিনিধি ছিলেন কাগজে কলমে। কিন্তু বাস্তবে তারা রাজকীয় দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। চাটুকারদের পরিবেষ্টনে তারা সবসময় থাকতেন। বাইরের কোন সঠিক রিপোর্ট তাদেরকে দেয়া হতো না।

চাটুকার হাকিমরা ইসলামের কথা বলতো ঠিক, কিন্তু তাদের বাস্তব জীবন ছিলো ইসলাম বিরোধী।

উবাইদুল্লাহ যখন আবদুর রহমানকে বললেন তিনি একান্তে তার সঙ্গে কথা বলতে চান তখন আবার তার চোখ মুখ থমথমে হয়ে উঠলো। দু'জনের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো।

'আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'তবে আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনার দরবার থেকেও আমি চলে যাবো। উন্দলুস থেকে অবশ্য যাবো না। আমি আপনাকে এই মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে যাবো না যে, উন্দলুস আপনার মালিকানাভুক্ত রাজত্ব।'.....

যে পর্যন্ত আমার মধ্যে ও আমার সঙ্গের কমান্ডারদের মধ্যে ঈমান ও স্বাধীনতার আপোষহীন চেতনা উজ্জীবিত থাকবে, সে পর্যন্ত উন্দলুসকে কেউ তার ব্যক্তিগত জায়গীর বানাতে পারবে না।'

'আমি তো তোমার কথা শুনছিই উবাইদুল্লাহ!' আবদুর রহমান বললেন, 'যারিয়াব ও সুলতানার সামনে কথা বললে কোন সমস্যা নেই।'

'আমি ওদের দু'জনের মুখের ওপরই বলে দিচ্ছি, এক দরবারী চাটুকার গায়ক ও হেরেমের এক রূপসী নারীকে যদি আপনি আপনার সালতানাতের স্পর্শকাতর ও গোপন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেন তাহলে না আপনি থাকবেন, না থাকবে উন্দলুস।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আপনি যদি বাদশাহ না হতেন এরা আপনার চেহারাও কখনো দেখতে চাইতো না।'.....

'আর এই লোক যদি এমন চাটুকার গায়ক না হতো এবং এই নারী যদি এমন রূপসী না হতো, আপনি কখনো তাদের দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাতেন না। ওদের মধ্যে এই জাদুই আছে.....একজনের কাছে সঙ্গীত, আরেকজনের কাছে রূপ আর মনভোলানো অঙ্গভঙ্গি.....

'এ ছাড়া অন্যকিছু নেই ওদের মধ্যে। এই জাদুর গুণেই ওদেরকে আপনার একান্ত বিশ্বস্ত মনে হয়।'

যারিয়াব ও সুলতানা একে অপরের দিকে তাকালো। চোখে ইঙ্গিত করলো এবং ওখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেলো যাতে ক্ষোভ আর প্রতিবাদের অঙ্গভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আবদুর রহমান উবাইদুল্লাহর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন।

‘উবাইদুল্লাহ।’ আবদুর রহমান রুক্ষ গলায় বললেন, ‘তুমি চাচ্ছোটা কী? তোমরা কেন ভুলে যাচ্ছে আমি আমীরে উন্দলুস এবং আমাকে ইতিহাস শাহে উন্দলুস বলে স্মরণ করবে। আমার একটি ব্যক্তিগত জীবনও আছে। এতে কেন তোমরা বিঘ্ন ঘটাতে আসো?’

‘এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সালতানাতে ইসলামিয়ার বিশাল এক অঞ্চলের আমীর বানিয়েছেন,’ উবাইদুল্লাহ বললেন, ‘আর আমীরের কোন ব্যক্তিগত জীবন থাকে না। আমীর এই মসনদে বসে–যার ওপর আপনি বসে আছেন– ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন না।

তিনি দেশের পয়সা দিয়ে তোষামুদে গায়ক আর সুন্দরী বেলেল্লা নারীদের লালন পালন করেন না। তিনি পারেন না আনন্দ উৎসব করতে। তার কাছে যদি ব্যক্তিগত জীবন এত প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে তার এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়া উচিত।’

‘উবাইদুল্লাহ! তোমার আসল উদ্দেশ্য কী সেটা বলে ফেলো।’ আবদুর রহমান অসন্তুষ্ট গলায় বললেন।

‘যে মানসিক অবস্থা আপনি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন এ অবস্থায় আসলে কোন উদ্দেশ্য, গুরুত্বপূর্ণ কোন আলোচনাই চলে না।’ উবাইদুল্লাহ বললেন, ‘আমি যুদ্ধের কথা বলবো। লড়াইয়ের কথা বলবো। আপনি কি ফ্রান্সে হামলা করার কথা শুনবেন?.....

‘আপনি সেই বিদ্রোহীদের কথা শুনবেন যারা আপনারই আশেপাশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে? আপনি সেই রক্তদানের কথা শুনবেন যা উন্দলুসের মাটি আমাদের কাছে দাবী করছে?’

আবদুর রহমানের মেজাজ একেবারেই চড়ে গেলো। যতই হোক, তিনি তো একজন বাদশাহই। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

‘এ ফয়সালা করবো আমি, ফৌজ কোথায় যাবে এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে!’ আবদুর রহমান পায়চারী করতে করতে বললেন, ‘আমি কোন সালার বা সেনাপতিকে এ অনুমতি দিতে পারি না যে, সে তার মন মতো যা ইচ্ছা তাই করবে। তুমি তোমার অধীনস্থ সালারদের বলে দাও, আমি যে কোন সময় সবাইকে ডাকবো এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করবো।’

‘পরিস্থিতি এতই উদ্বেগজনক যে, আপনাকে এখনই ফয়সালা করতে হবে।’ উবাইদুল্লাহ শান্ত গলায় বললেন, ‘আমি প্রধান সেনাপতি! পরিস্থিতি সম্পর্কে আমিই সালারদেরকে অবহিত করবো। এটা আমারই দায়িত্ব। আর শিগগিরই আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে।’

'আমার হুকুম ছাড়া ফৌজের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া চলবে না।' আবদুর রহমান এক রোখা গলায় বললেন।

'আমীরে উন্দলুস!' শান্ত ও মৃদুকণ্ঠে বললেন উবাইদুল্লাহ, 'আপনি মুসলিম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করছেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হিন্দুস্তানের কুফরস্তানে ইসলামের আলো পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং ইসলাম ক্রমেই পুরো উপমহাদেশে বিস্তার করছিলো। কিন্তু তখন খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক জ্বলে উঠলেন এ কারণে যে, মানুষ খলীফার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবে এবং এক সেনাপতির গীত গাইবে।'

তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে ভারতবর্ষ থেকে ডাকিয়ে এনে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করলেন। তারপর তার রহস্যজনক মৃত্যু হলো।'

'আমার মনে এমন কোন হিংসা-বিদ্বেষ নেই উবাইদুল্লাহ!'

'উন্দলুসের ইতিহাস নিশ্চয় আপনার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।' উবাইদুল্লাহ আবদুর রহমানের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'যার মধ্যে হিংসা কাজ করে সে নিজেকে অহিংসই মনে করে আত্মতৃপ্তি বোধ করে। উন্দলুসের সীমান্ত সমুদ্র তীরে পৌঁছে নৌযানগুলোকে যে তারিক জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যখন উন্দলুস জয় করলেন তখন সালারে আলা মুসার মনে এ ধরনেরই হিংসাত্মক মনোভাব জেগে উঠলো।'.....

'তিনি তারিক ইবনে যিয়াদের অগ্রগামীতার সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন। শুধু বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন না। বরং কুচক্রী হয়ে তার কাছে কৈফিয়তও চাইলেন, তিনি কেন তার হুকুম ছাড়া এতদূর চলে এলেন'?

তিনি তারিকের হাত থেকে কমান্ডিং নেতৃত্ব নিয়ে নিলেন। কিন্তু তারিক শান্ত মাথায় ব্যাপারটা সামাল দিলেন এবং তাকে এ নিশ্চয়তা দিলেন যে, হুকুম মুসারই চলবে। তারিক তারই অধীনস্থ হয়ে থাকবে। অবশেষে দু'জনের মধ্যে চমৎকার একটা সমঝোতা হয় এবং উভয়ে ফ্রান্সের সীমান্ত পর্যন্ত তাদের বিজয় কেতন ওড়াতে সক্ষম হয়।'

'আমার মনে আছে উবাইদুল্লাহ! এ তো আমার বাপ দাদাদের কথা। আমি এসব ভুলবো কি করে?' আবদুর রহমান বললেন।

❋❋❋❋❋

'না, আপনার সেভাবে কিছুই মনে নেই যেভাবে মনে থাকলে বিবেক কখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে পারে না।' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমি আপনাকে

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনার পূর্ব পুরুষরা কী কী পদস্খলনের শিকার হয়েছিলো।.....

'যখন মুসা ও তারিক বিন যিয়াদ ফ্রান্সের সীমান্তে পৌছে গেছেন তখন খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের হুকুম এসে গেলো, তাদের দুজনকে বাগদাদে ফিরে যেতে হবে। আর সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

এদের জনপ্রিয়তার কারণে তিনিও তার খেলাফতকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছিলেন। মুসা জিদ ধরেছিলেন তিন ফিরে যাবেন না। কিন্তু তারিক বলেছিলেন, তিনি খেলাফতের হুকুমকে অমান্য করার মতো পাপ করবেন না। তিনি চলে গেলেন বাগদাদে। তারপর মুসাকেও যেতে হলো।'

'তারপর কি হয়েছিলো আমি জানি ইবনে আবদুল্লাহ।' আবদুর রহমান ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'খলীফা মুসার সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেছিলেন। আর তারিকের অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু হয়।'

আমীরে উন্দলুস আবদুর রহমানের অবস্থা এখন এমন হয়ে গেলো যেন তিনি সেনাপতি উবাইদুল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের কাছাকাছি চলে এসেছেন। সেনাপতি তাকে তার পিতৃপুরুষের ইতিহাস শুনাচ্ছেন। তার শোনানোর ভঙ্গিতে একে তো ছিলো তিক্ত বাস্তবতা, তারপর তিনি আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন।

এই আবেগে ক্রোধ থাকলেও তাতে আগ্রাসী মনোভাব ছিলো না।

উবাইদুল্লাহ তাকে দোষারোপ করছিলেন না। তার দৃঢ় কণ্ঠের বক্তব্যে একটি সংকল্পই ফুটে উঠছিলো। সেটা হলো, আমীরে উন্দলুস কিছু না করলে তিনি নিজেই উন্দলুসকে বাঁচাতে যুদ্ধের সব ধরনের পদক্ষেপই নেবেন।

আবদুর রহমান তাকে চুপ করাতে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং আবেগ ও নতুন এক স্বংকল্পময় ক্ষুব্ধতায় ভেসে গেলেন। তার রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা এবং তার ব্যক্তিত্ব এই উবাইদুল্লাহর ব্যক্তিত্বে যেন একাকার হয়ে গেলো।

উবাইদুল্লাহ তাকে বনী উমাইয়ার ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন। আবদুর রহমান তো বনী উমাইয়ারই এক উজ্জ্বল শাসক পুরুষ ছিলেন এক সময়।.....

উবাইদুল্লাহ তাকে শুনিয়ে যাচ্ছেন অক্লান্ত। তিনি তাকে কোন গল্প কাহিনী শোনাচ্ছিলেন না। এটা সেই শতাব্দী এর আগের শতাব্দীরই খেলাফত ও উন্দলুসের ইতিহাস। .....

এই ইতিহাসই আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। আমরা সেই ইতিহাসকে উপেক্ষা করতে করতে আজ অধঃপতনের চরমে পৌছেছি।

❋❋❋❋❋

'আমীরে উন্দলুস!' উবাইদুল্লাহ বলে গেলেন, 'আপনি বলছেন, সিপাহসালার মুসার সঙ্গে খলীফা খুব বাজে ব্যবহার করেছিলেন। এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে

না। মুসা ও তারিক যখন দামেশকের কিছুটা দূরে তখন খলীফা ইবনে আবদুল মালিকের ভাই সুলাইমান তার সঙ্গে এসে সাক্ষাত করলেন। খলীফা তখন মৃত্যু শয্যায়। আর কয়েকদিনের মেহমান মাত্র তিনি।'.....

'সুলাইমান তাদেরকে বললেন, তারা এ অবস্থায় যেন দামেশকে না যায়। তার খেলাফতের গদির দাবীদার একের অধিক। এর মধ্যে সুলাইমানও একজন। তিনি মুসা ও তারিককে তার দলে ভিড়িয়ে অর্থাৎ সেনাবাহিনীকে হাত করে খেলাফতের গতি দখল করতে চান।'.....

মুসা তাকে বললেন,

'খেলাফতের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি কিংবা তারিক আমরা কেউ খলীফা হতে চাই না। আমাদেরকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। আমরা ফিরে এসেছি। আমরা খলীফার কাছে তো অবশ্যই যাবো। তাকে না পেলে কমপক্ষে তার জানাযায় তো শরীক হতে পারবো।'

'সুলাইমান মূসাকে রাজি করাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে মুসা তাকে এই জবাব দিয়ে চুপসে দিলেন যে, কোন সিপাহসালার বা সালারের রাজনীতির ব্যাপারে কোন আগ্রহ থাকা উচিত নয়। আর আমি ফৌজেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করতে দেবো না। সুলাইমান এ কথা শুনে রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।'.....

'অবশেষে সিপাহসালার মুসা ও তারিক খলীফার সামনে গিয়ে হাজির হলেন। তার সামনে উপহার-উপঢৌকনের স্তুপ আর কাড়ি কাড়ি টাকা পয়সা রাখা হলো। খলীফা ওয়ালিদ তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি তো খুশি হয়ে গেলেন। কিন্তু তার ভাই সুলাইমান জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে রইলেন। তারপর মাত্র চল্লিশ দিন ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক বেঁচে ছিলেন।'.....

'কিন্তু মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য যে, খেলাফতের গতিতে বসলেন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক। তিনি সিপাহসালার মুসা থেকে সেই প্রতিশোধ নিলেন যা, বনী উমাইয়ার ইতিহাসকে চিরদিন লজ্জা দেবে।

'মুসার বিরুদ্ধে নিজের লোকজনকে লেলিয়ে দিয়ে নিজের মতো করে অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁর সব অর্জনকে তছনছ করে দিলেন। তার বিরুদ্ধে সাজানো, মিথ্যা দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হলো।'.....

'তার বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ পরবর্তীতে এক অক্ষরও কেউ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারেনি। তার ওপর এমন বিশাল অংকের ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেয়া হলো যে, তিনি সেটা পরিশোধ করতে পারলেন না।'......

সেফাট নামে এক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলাইমান সিপাহসালার মুসার ওপর এক লাখ দীনার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দায়ের করে। কেউ কেউ দেড় লাখ দীনারের কথাও উল্লেখ করেছেন।

'একজন সৎ, নির্লোভ সিপাহসালার এত টাকা কী করে পরিশোধ করবেন?' উবাইদুল্লাহ বলছিলেন 'কিন্তু সুলাইমান তার বিরোধী পক্ষ থেকে বড়ই পৈশাচিক প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। যে ব্যবহার তিনি মুসার সঙ্গে করলেন তা শুনে আজো অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। উত্তপ্ত বালিতে একটি কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন 'নরপিশাচ' সুলাইমান।'.....

'আপনি কি জানেন তখন মুসার বয়স কত ছিলো?.....আশি বছর বয়সে তিনি তারিককে সঙ্গে নিয়ে উন্দলুস জয় করেন। এর পুরস্কার তিনি এই পেলেন যে, একাধারে কয়েক দিন মরুর আগুন ঝরা সূর্যের নিচে ফুটতে থাকা বালির ওপর খালি পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। তারপর তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হলো।'.....

'আপনি কি জানেন আমীরে উন্দলুস! সিপাহসালার মুসার এক যুবক ছেলে ছিলেন আবদুল আজীজ। তিনিও ছিলেন মুসলিম সেনাদলের একজন সালার। খলীফা সুলাইমানের এই ভয় ছিলো, মুসার এই ছেলে তাঁর বাপকে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে পারে। সুলাইমান আবদুল আজীজকে এক মুনাফিক সন্ত্রাসী আরব দিয়ে তখন খুন করিয়েছেন যখন তিনি তার সেনাদলকে নিয়ে ফজর নামায পড়ছিলেন। আর তিনি ইমামতি করছিলেন।'.....

'ইতিহাস থেকে আপনি এই কুৎসিত অধ্যায় কি করে মুছে ফেলবেন যে, আবদুল আজীজ সুরা ফাতেহা শেষ করে সুরা ওয়াকিয়া শুরু করেছিলেন। এ সময় সুলাইমানের পাঠানো সেই খুনী তাকে হত্যা করে।'.....

'নরাধম সুলাইমান এতেই ক্ষান্ত হলেন না। বরং আবদুল আজীজের কর্তিত মাথা তাঁর পিতা কিংবদন্তী বীর মুসার কাছে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। মুসা সন্তানের এই কর্তিত মাথা দেখে চিৎকার করে বললেন, 'ঐ হতভাগা এমন এক মানুষকে খুন করলো যে দিনে জিহাদ করতো, আর রাত কাটিয়ে দিতো ইবাদতে.....মুসা আশি বছর বয়সেও এই চরম আঘাত বুক পেতে নিলেন।'.....

❋❋❋❋❋

উবাইদুল্লাহ কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কান্না চাপা কণ্ঠে বলে গেলেন,

'৯৭ হিজরীর হজ্জের কথা মনে করুন আমীরে উন্দলুস! সে বছর ইসলামের দু'মুখী সাপ, মুনাফিক সুলাইমান হজ্বে গিয়েছিলেন। তিনি সেই বৃদ্ধ সিপাহসালার মুসাকে পায়ে শিকল বেঁধে তার সঙ্গে নিয়ে যান। তারপর তাকে সেই বুদ্ধ-ভিক্ষুকদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেন যারা হাজিদের কাছ থেকে ভিক্ষা

চাইতে থাকে। সুলাইমান তাকে বলেন, ভিক্ষা চাও, আর জরিমানা আদায় করো এবং মুক্ত হয়ে যাও।'.....

'সে বছরের হাজিরা দারুন আনন্দিত ছিলো। একে অপরকে মোবারকবাদ দিচ্ছিলো এ কারণে যে, সালতানাতে ইসলামিয়ায় উন্দলুসের মতো এত বড় একটি দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কারো জানা ছিলো না, উন্দলুস বিজয়ের অন্যতম রূপকার শিকল বাঁধা পায়ে ভিখিরীদের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।'.....

'অবশেষে আল্লাহ তাআলারও তার ওপর রহম হলো। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলেন।.....আর তারিক ইবনে যিয়াদ গুমনাম হয়ে এই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। পশুত্ব বরণকারী সুলাইমান তাকে আর কোন অভিযানে যেতে দেননি।'

আবদুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। তিনি অস্থির হয়ে কামরায় পায়চারী করতে লাগলেন।

'আল্লাহর দেয়া কানুন আর বিধি বিধানকে নিজের হাতে নেয়ার চেষ্টা করবেন না আমীরে উন্দলুস!' উবাইদুললাহ বললেন, 'আপনি চাইলে আমার সঙ্গে সে ব্যবহার করতে পারেন যা খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, সিপাহসালার মুসা ও সিপাহসালার তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে করেছেন।'

'কিন্তু আপনাকে এও বলে দিচ্ছি, আমি ও আমার কোন সালার সত্যের আওয়াজ ও সত্যপথ থেকে এক চুল পরিমাণও হটবো না। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনার পরিণাম হবে ভয়াবহ।'

এতটুকু বলে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ উঠে পড়লেন এবং আর কিছু না বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আবদুর রহমান নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে দরজা দিয়ে তার প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ধুপধাপ পায়ে বেরিয়ে গেছেন।

উবাইদুল্লাহ সেই তাল-তরঙ্গ ছিড়ে দিয়ে গেছেন যেটা ব্যবহার করে যারিয়াব ও সুলতানা তাকে বাস্তবতা থেকে দূরে নিস্তব্ধ-শীতল রাখতে চেষ্টা করতো। তিনি দাঁড়ানো থেকে বসে পড়লেন। মাথা নামিয়ে এক হাত কপালে ঠেকিয় গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

❋❋❋❋❋

তিনি কাঁধের ওপর কারো হাতের মৃদু স্পর্শ অনুভব করলেন। মাথা উঠিয়ে দেখলেন, মুদ্দাসসিরা।

মুদ্দাসসিরা এক সময় তার পরিচারিকা ছিলো। এখন তার স্ত্রী। রূপ যৌবনে সুলতানার চেয়ে বেশি না হলেও কম নয়। তার মুখের ভাষায় বাচ্চাদের মতো কেমন নিষ্পাপ এক সরলতা রয়েছে। সুলতানা আসার আগে আবদুর রহমানের সবচেয়ে প্রিয় ছিলো এই মুদ্দাসসিরা। এখনো কম প্রিয় নয়।

'আপনি কি হেরে গেছেন?' মুদ্দাসসিরা আবেগদীপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি সে আবদুর রহমান নন যিনি তার পিতার শাসনামলে সীমান্ত এলাকায় কয়েকবারই ফ্রান্সীয়দেরকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন?'

'আপনি কি আর সে আবদুর রহমান নন যিনি সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শারলেমীন সালিবীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন। শারলেমীন যখন তার পরাজয়ের প্রতিশোদ নিতে ওরতুশা অবরোধ করলো, তখন এমন শক্তিশালী ও নিশ্চিদ্র অবরোধ কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন?.....আবদুর রহমানই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন।.....হ্যাঁ, আপনিই।'

আবদুর রহমান তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার এই সরল ও নিষ্পাপ সজীব–পেলবতায় ভরা মুদ্দাসসিরাকে বেশ ভালো লাগলো।

মুদ্দাসসিরাকে একবার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু মুদ্দাসসিরা তখন তীব্র বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। আবদুর রহমান স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু তার ভেতর এক ঝড় দানা বেঁধে উঠতে লাগলো।

মুদ্দাসসিরা কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরে এলো। তার হাতে কোষবদ্ধ তলোয়ার। তলোয়ারটি খাপ থেকে এক ঝটকায় বের করে ফেললো মুদ্দাসসিরা। তারপর খাপটি এত জোরে একদিকে ছুড়ে মারলো যে, সেটি দরজার বাইরে গিয়ে পড়লো। মুদ্দাসসিরা তলোয়ারটি আবদুর রহমানের মুখের কাছে নিয়ে ধরলো।

'এর ঘ্রাণ নিন আগে', মুদ্দাসসিরা বললো, 'একে ভালো করে দেখুন। সেসব কাফেরদের রক্তের গন্ধ পাবেন যাদেরকে এই তলোয়ার দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হত্যা করেছেন। এই তরোয়ারের চকচকে দীপ্তিতে সেসব কাফেরদের দুর্গগুলো দেখতে পাবেন যেগুলো আপনার তলোয়ারের আঘাতে জয় করেছিলেন। এই তলোয়ার ভোতা হয়ে যায়নি। এতে ঝং ধরেনি। আপনি কেন এভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলবেন?'

'তুমি কি শোনোনি এ লোক আমকে কী সব কথা বলে গেছে?' আবদুর রহমান বললেন অনেকটা অভিমানী গলায়।

'এক সিংহকে জাগাতে এবং তাকে গভীর গুহা থেকে বের করতে হলে সেই গুহার সামনে আগুন জ্বালাতে হয়।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'প্রধান সেনাপতি আপনাকে যা বলেছে তার প্রতিটি শব্দ আমি শুনেছি। আমি তো আপনাকে

আমার ভালোবাসার দোহাই দিতে পারবো না। কারণ, আপনি আপনার ভালোবাসা একাধিক নারীর মধ্যে বণ্টন করে রেখেছেন।'.....

'আপনাকে আমি সেই দুই বাচ্চার দোহাই দিয়ে বলছি, যাদেরকে আপনি জন্ম দিয়েছেন। আপনার সেই সন্তানদেরকে এবং তাদের অনাগত সন্তানদেরকে আপনার সামনে রাখুন। তাদেরকে ইতিহাসের সেই পাথেয় দিয়ে যান যা আপনার পূর্বপুরুষরা দিয়ে যেতে পারেনি। তাদেরকে তো বনী উমাইয়ার কিংবদন্তী সালার ও বিজয়ী সিপাহসালারদের নিকৃষ্ট হন্তারক বলা হয়। তাদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন আপনার দ্বারা না হয়।'

মুদ্দাসসিরা তলোয়ারটি তার কোলে রেখে দিলো এবং তার চেহারা দু'হাতে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

'কিন্তু ওরা চাচ্ছেটা কী?' আবদুর রহমান সজাগ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কাছে যে সালাররা আসে তারা কিছু বাঁকা ও তীর্যক কথাবার্তা ছুড়ে চলে যায়।'

'গোথাক মার্চ এক শক্তি হয়ে উঠছে,' মুদ্দাসসিরা বললো, 'ফ্রান্সের শাহ লুই তাকে মসদদ দিচ্ছে.....আপনার নিজের এক রাজ্য মারীদায় বিদ্রোহের অঙ্গার জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'তোমাকে একথা কে বলেছে?'

'তাঁরাই বলেছেন যাদের কথা আপনি শুনতে চান না।'

'আর আমার কাছে এসব কথা কে গোপন করছে?'

'আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবো না।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'না হয় আপনি সতীন বিদ্বেষ ও হিংসার অপবাদ আমার ওপর আরোপ করবেন। কে জানে আপনি না আবার বলে দেন, মুদ্দাসসিরা তুমি আর যাই হও একজন পরিচারিকাই তো ছিলে। তুমি অপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির মেয়ে।

'আপনাকে আমি রাজত্ব ও নেতৃত্বের উচ্চাসন থেকে টেনে হেঁচড়ে নাময়ে অধঃপতনের নোংরা আঁস্তাকুড়ে ফেলতে চাই না। আপনার প্রিয় লোকদের কেউ কেউ মনে প্রাণেই তা চায়। যাদের প্রেম-ভালোবাসায় আপনি আজ উন্মত্ততা আর অন্ধত্ব বরণ করে ভাবছেন আপনি ও আপনার রাজত্ব নিরাপদ রয়েছে। আপনার অন্তরে শুধু এই তলোয়ারেরই প্রেম ভালোবাসা লালন করা উচিত।'

আবদুর রহমান তলোয়ারটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুদ্দাসসিরাও নিশ্চুপ তার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো।

আবদুর রহমানের মুখের বর্ণ ক্রমেই দীপ্তিময় হয়ে উঠলো। আচমকা তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রহরীকে আওয়াজ দিলেন। প্রহরী দৌড়ে এলো।

'সিপাহসালারকে গিয়ে বলো তার সব সালার ও নায়েবে সালারকে নিয়ে যেন এখনই আমার কাছে চলে আসেন।'

মুদ্দাসসিরার দিকে তাকিয়ে তার মুখটি এক হাতে তুলে কপালে একটি গভীর চুম্বন একে বললেন,

'মুদ্দাসসিরা! তুমি এখন যাও। তলোয়ারটি নিয়ে যাও। সময় হলে আমি এটি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।'

মুদ্দাসসিরার দু'চোখ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কান্নার প্রবল একটা বেগ সামলে সে আর কিছু বলতে পারলো না। ধীর পায়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

*****

সিপাহসালার ও সব সালাররা যখন তার সামনে গিয়ে বসলেন আবদুর রহমান তখন একজন বদলে যাওয়া মানুষ।

তিনি কামরায় পায়চারী করছিলেন। যেন এক বিজয় সালার দৃঢ় পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তিনি সালারদের সামনে গিয়ে বসলন। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন এক দৃষ্টির বিচ্ছুরণ ঘটলো যে, সালারদের ওপর সেই আগের আবদুর রহমানের শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত ভালোবাসা বিস্তার করলো।

'সালারে আলা উবাইদুল্লাহ!' তিনি বললেন, 'আমাকে সীমান্তের সঠিক খবর শোনান যা ফ্রান্সের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমাকে বলুন আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী? এও বলুন ফ্রান্সের ওপর হামলা করতে গেলে কী কী সমস্যায় পড়তে হবে?'

'দৃঢ় সংকল্প করে নিলে কোন সমসাই সমস্যা হয়ে সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' উবাইদুল্লাহ বলেন, 'বাস্তবতা ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আমদে মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতি দরকার।

উবাইদুল্লাহ আবদুর রহমানকে বিস্তারিত সব শোনালেন, বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে উন্দলুস কত বড় বিপদের মধ্যে রয়েছে। অন্যান্য সালাররাও আরো অনেক কিছু জানালেন। সবকিছু শুনে আবদুর রহমান যখন কথা বললেন তখন সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

'আমরা ফ্রান্সের ওপর হামলা করতে যাচ্ছি।' আবদুর রহমানের দৃঢ় গলা আন্দোলিত হলো, 'যেখানে ফেতনা আর ফ্যাসিবাদ লালিত পালিত হচ্ছে আমরা সে জায়গা একেবারে ধ্বংস করে দেবো।'

সালারদের নিস্তব্ধতা নির্ভার হাসির মুখরতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠলো। ওরা তো সবাই রণাঙ্গণের স্বপ্নপুরুষ। এই হুকুম শোনার জন্যই তো তারা ব্যাকুল ছিলেন। আবদুর রহমান হামলার পরিকল্পনা, কৌশল ও দিক নির্দেশনা দিতে শুরু করলেন।

'যে সেনা ইউনিটগুলো অভিযানে বের হতে ও যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত তার থেকে কয়েকটি ইউনিট সালার মুসা ইবনে মুসার নেতৃত্বে কাল সকালে 'গোথাক মার্চ' এর দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে।' আবদুর রহমান দৃঢ় কণ্ঠে বলে গেলেন,

'কয়েকটি ইউনিট সালার আবদুর রউফের কমাণ্ডে ফ্রান্সের সীমান্ত অভিমুখে কোচ করবে।'.....

'মুসা ইবনে মুসা গোথাক মার্চের ওপর হামলা করবে। আর আবদুর রউফ সীমান্ত এলাকায় ছোট ছোট হামলা করবে এমনভাবে যাতে মনে হয় সীমান্ত পর্যন্ত এসব হামলা সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি নিজে তোমাদের পেছন পেছন রওয়ানা হয়ে যাবো। আমার সঙ্গে উবাইদুল্লাহ, আবদুল করীম ও ফারতুনের সেনা ইউনিটগুলো থাকবে।'.....

'এদেরকে নিয়ে আমি ফ্রান্সের ওপর তীব্র হামলা চালাবো। তারপর সবগুলো ইউনিট আমার ডানে বামে এসে হামলা করে ফান্সের জয় পূর্ণ করবে।'

'ওখানকার অভিযান শেষ হলে আমরা আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। সবার আগে জরুরি হলো, প্রতিবেশী যেসব দেশ থেকে এসব চক্রান্তের কলকাঠি নাড়া হচ্ছে তাদেরকে আগে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা। আমি এই যুদ্ধকে চূড়ান্ত যুদ্ধ হিসাবে দেখতে চাই।'

সালাররা সবাই এ পরিকল্পনা পছন্দ করলেন। কিছু পরামর্শ দেয়া হলো। কিছু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। তারপর এমন এক কুশলী পরিকল্পনা নেয়া হলো, যার দ্বারা ফ্রান্সের সালতানাতে ইসলামিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা সুনিশ্চিত বলে দেখা যাচ্ছিলো।

❋❋❋❋❋

তারপর আবদুর রহমানের বিন্যাস অনুযায়ী সেনাবাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো সীমান্ত এলাকা অভিমুখে। তাদের গন্তব্যে পৌছতে কমপক্ষে বিশ দিন লেগে যেতে পারে। সালার মুসা ইবনে মুসা ও সালার আবদুর রউফ এর সেনা ইউনিট আগেই রওয়ানা হয়ে গেছে। দুদিনের বিরতিতে আমীরে উন্দলুস আবদুর রহমানও তার ইউনিট নিয়ে কোচ করলেন।

প্রায় অধিকাংশ সেনা ইউনিট নিয়ে যখন পুরো সেনাবাহিনী কর্ডোভা থেকে রওয়ানা করছিলো তখন এক ঘোড়সওয়ার সপাটে ঘোড়া ছুটাচ্ছিলো। তার গন্তব্য মারীদা।

যারিয়াব, সুলতানা, আবদুর রহমানের অন্যান্য প্রণয়নী রূপসী মেয়েরা এক উঁচু প্রান্তরে দাঁড়িয় অপসৃয়মান সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়েছিলো। শহরের হাজারো লোক সেনা দলকে খোদা হাফেজ জানাতে বাড়ির ছাদে উঠে দু'হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিলো।

'লোকটি কি সময়মতো পৌছতে পারবে?' যারিয়াবকে সুলতানা জিজ্ঞেস করলো।

'সময়ের আগেই পৌছে যাবে।' যারিয়াব বললো।

'আবদুর রহমানকে এই হামলার জন্য উস্কে দিতে মুদ্দাসসিরার অনেক বড় হাত রয়েছে।' সুলতানা বললো, 'আবদুর রহমান এখনো তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মুদ্দাসসিরাকে আমি জীবিত রাখবো না।'

'চিন্তা ভাবনা করে যা কিছু করার করো সুলতানা!' যারিয়াব বললো, 'মহলে এমন কোন আচরণ করবে না যাতে আবদুর রহমান সন্দিহান হয়ে উঠেন। তুমি মনে হয় এখনো বুঝতে পারোনি, আবদুর রহমান কতটা দূরদর্শী এবং দুঃসাহসী। চিন্তা করো না, তাকে মাঝ রাস্তা থেকেই ফিরে আসতে হবে।'

যে ঘোড়সওয়ার একা উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো তাকে যারিয়াবই পাঠিয়েছে।

মারীদা থেকে বিতাড়িত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার এখন এক যুদ্ধ শক্তি হয়ে উঠেছে। হাজারো খ্রিষ্টান তার দলে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে সেসব নওমুসলিম আছে যারা প্রকাশ্যে মুসলমান এবং গোপনে খ্রিষ্টানই রয়ে গেছে। এদেরকে বলা হতো মুআল্লিদীন।

এরা উন্দলুসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে এবং সেটাকে বিদ্রোহ আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। ইতিহাসে যাকে 'তাহরীকে মুআল্লিদীন' বলা হয়েছে।

ঘোড়সওয়ার রাতেই পৌছে গেলো মারীদা পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে। সেখানে তাদের দল নেতাকে সংবাদ দিলো, আবদুর রহমান ফ্রান্সের ওপর হামলা করতে যাচ্ছেন।

আবদুর রহমান তার এই অভিযানের কথা এক প্রকার গোপনই রেখেছিলেন। কিন্তু যেখানে তোষামোদকারীদের অস্তিত্ব আছে সেখানে তারা জামার আস্তিনে লালিত পালিত ভয়ংকর সাপ হয়ে উঠতে সময় নেয় না।

পনের ষোল দিন পর সালার মুসা ইবনে মুসা ও সালার আবদুর রউফ যার যার নির্ধারিত রণাঙ্গনস্থলে পৌছে গেলেন। আবদুর রহমানও তার পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্ধেক পথ অতিক্রম করে গেছেন।

এ সময় মারীদা থেকে এক সেনা কমান্ডার পথিমধ্যে আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। সে তাকে ভয়ংকর এক সংবাদ দিলো যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার মারীদার ওপর হামলা করেছে। মারীদার গভর্ণরকে গ্রেফতার করেছে। আর খ্রিষ্টানরা সারা শহরে লুটপাট চালাচ্ছে। সেখানে এখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারের হুকুম চলছে।

আবদুর রহমান ফ্রান্সের দিকে তার অগ্রগামীতা স্থগিত করে দিলেন। পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে তিনি মোটেও বিলম্ব করলেন না।

দ্রুত গতির এক সংবাদবাহককে এই পয়গাম দিয়ে সালার আবদুর রউফের দিকে পাঠালেন যে, তিনি সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিযান মুলতুবী রেখে যেন তীব্র বেগে মারীদা অভিমুখে রওয়ানা দেন। আবদুর রহমান আরো নির্দেশ দেন, মারীদা পৌঁছেই কাল বিলম্ব না করে মারীদা অবরোধ করে নেবে।

আবদুর রহমান ফ্রান্সের ওপর হামলা মুলতুবী রেখে ঝড়ো বেগে তার সেনা ইউনিটগুলো নিয়ে মারীদার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

উন্দলুসের কালনাগিনী ইতিমধ্যে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পুরুষকে তার ভয়ংকর ছোবল হানতে সফলই হয়েছে।

❃❃❃❃❃

'ক্রুশ'-কে কেন্দ্র করে সেদিনই ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো যেদিন গির্জার পূজারীরা অনুভব করলো ক্রুশের ওপর কালেমায়ে তায়্যিবার প্রাধান্য বিস্তার শুরু হয়ে গেছে।

এটা সুলতানা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীরও অনেক আগের কথা। ইসলাম যখন রোম সাগর অতিক্রম করে খ্রিষ্টজগতে মহাজাগরণ হয়ে প্রবেশ করলো তখন থেকেই ক্রুশের পূজারীরা কোমরে গামছা বেঁধে ইসলামের বিরুদ্ধে আদা জল খেয়ে লেগে পড়ে।

প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে ময়দানে নেমে পড়ে। যেটা আগে ছিলো রাজায় রাজায় যুদ্ধ সেটাকে বলা হতে লাগলো দুই ধর্মের যুদ্ধ।

মুসলমানরা সবসময় একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে হাতে তলোয়ার নিয়েছে। যুদ্ধের কলা কৌশল ও নেতৃত্ব-দানে তারা বিশ্বজোড়া দক্ষতা-খ্যাতি অর্জন করে অল্প সময়েই। প্রতিটি রণাঙ্গনে তারা তাদের অসাধারণ রণাঙ্গনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।

নিপুণ নেতৃত্বদান ও গেরিলা কৌশল এবং অদৃশ্য বিজয়ী স্পৃহা স্বল্পসংখ্যক সেনাদল নিয়ে পাঁচ থেকে দশগুণ সেনা শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকে মুসলমানরা।

মুসলমানরা যে এলাকা জয় করতো সে এলাকা তলোয়ার দিয়ে নয়, প্রেম, ভালোবাসা, চারিত্রিক মধুরিমা দিয়ে সে এলাকার মানুষের মন জয় করে নিতো।

খ্রিষ্টজগত ইসলামের অপ্রতিরোধ্য বিজয় ও সাফল্য দেখে নিজেদের যুদ্ধ শক্তির সঙ্গে অন্যান্য কলা-কৌশলও ব্যবহার করতে শুরু করলো। সেটা হলো মাটির নিচ থেকে চক্রান্তের জাল বিস্তার করা। মানুষের মানবিক দুর্বলতা, নারীর রূপ-সৌন্দর্য, শাসন ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের লোভকে গির্জার পূজারীরা ব্যবহার করতে শুরু করলো।

মুসলিম আমীর উমারা, ওযীর, হাকিম, সালার, সিপাহসালারদের মধ্যে নারী ও সম্পদের লোভ জাগিয়ে ক্রমেই তাদেরকে জাতির গাদ্দারে কাতারে নিয়ে দাঁড় করালো।

ইসলামের সবচেয়ে বড় ও ভয়ংকর শত্রু ইহুদীরা মাটি ফুঁড়ে উঠা এসব ষড়যন্ত্র ও পায়তারার পক্ষে সর্বশক্তিতে হাওয়া দিয়ে গেলো। ইহুদীরা খ্রিষ্টানদেরকে নতুন নতুন ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টির মাল মশলা জোগাড় করে দিলো। নিজেদের অতি সুন্দরী ও চরিত্রহীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা অসংখ্য মেয়ে সরবরাহ করলো।

খ্রিষ্টানরা এই মায়াবী কৌশলের সাফল্য দেখে নিজেদের মেয়েদেরকেও এ কাজে ব্যবহার করতে শুরু করলো এবং তাদেরকে মুসলিম আমীর উমারাদের মহলে ঢুকিয়ে দিলো।

ইসলামের মূল ভিত্তিকে বিকৃত করার জন্য ওরা এমন এমন আলেম শ্রেণী গড়ে তুললো যারা কুরআন হাদীসের শিক্ষা নিয়ে মসজিদে মসজিদে ইমামের ছদ্মবেশে ঢুকে পড়লো এবং মনগড়া তাফসীর ও জাল হাদীস শুনিয়ে মুসল্লীদেরকে বিভ্রান্ত করতে লাগলো।

এভাবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওরা চিন্তা-চেতনা, আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শিক সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়।

আর এর বিপরীতে মুসলিম পথনির্দেশক ও শাসক শ্রেণীর চিন্তা-চেতনা তিমির থেকে তিমিরেই তলিয়ে যেতে থাকে।

ইহুদী-খ্রিষ্টানদের পাতা মায়াবী জালে তারা বড় আয়েশী ভঙ্গিতে পা দিতে থাকে। নিজেদের ওপর ক্ষমতার নেশা সওয়ার করে তাতেই বুঁদ হতে থাকে। অনেক সালার ও সিপাহসালারকে ক্ষমতার লোভী বানিয়ে তাদেরকে গৃহ-যুদ্ধে নামিয়ে দেয়।

যারা এসব গৃহ-যুদ্ধের অবতারণা করে দেশের ছোট-বড় অংশের ক্ষমতা পেলো তারা সে অঞ্চলগুলোকে এত দুর্বল করে ছাড়লো যে, সেটা দেশ ও জাতির

অতি রুগ্ন অংশ হয়ে উঠলো। রণাঙ্গন ছেড়ে ওরা প্রশাসন চালাতে এসে চরম অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিলো।

এদের মধ্যে যাদের সামান্যতম মেধা-বুদ্ধি ছিলো তাও তোষামোদকারীরা অকেজো করে দেয়। কল্পজগতে তাদেরকে প্রজাপ্রিয় ও সপ্ত মহাদেশের বাদশাহ বানিয়ে দেয়।

মতাদর্শিক ও বিশ্বাসগত স্নায়ুযুদ্ধে জয় হয় সে জাতি, যাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের কোন ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থ কাজ করে না।

যারা নিজেরা ব্যক্তির উর্ধ্বে উঠে সব চিন্তা চেতনাকে কার্যকর করে এবং বাইরের কোন প্রভাব, উস্কানি কিংবা কোন লোভ লালসার সামনে নিজেদেরকে বিকিয়ে দেয় না। তারা শত্রুকে শত্রুই মনে করে। নিজেদেরকে বাদশাহ মনে করে তৃপ্ত থাকে না।

কিন্তু মুসলিম শাসকদের মধ্যে এ গুণটি খুব কম সময়েই দেখা গেছে। আল্লাহ তাআলার দেয়া শাসন ক্ষমতাকে তারা ব্যক্তিগত শাসন ক্ষমতা মনে করতে লাগলো। আর ইসলামের দুশমনরা তো তাদের মধ্যে এ মনোভাবই জাগিয়ে তুলতে চাইতো।

❋❋❋❋❋

৮২২ থেকে ৮৫২ খ্রিঃ উন্দলুসের এক উত্তাল কাল। সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ, ওযীর ও সালার হাজিব আবদুল করীম, সালার আবদুর রউফ, সালার মুসা ইবনে মুসা, সালার ফারতুন উন্দলুসের শাসক আবদুর রহমানকে এমনই এক মায়াবী জালের ভেতর থেকে টেনে তুলেন।

অবশ্য এতে মুদ্দাসসিরা নামের অতি রূপসী ও ঈমানদীপ্ত এক নারীর কথা না বললে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। মুদ্দাসসিরার পবিত্র স্পর্শেই আবদুর রহমান অনেকটা জেগে উঠেন।

যারিয়াব ও সুলতানার মায়াবী জালের কঠিন নিগড় থেকে তারা ছাড়া আর কেউ মুক্ত করে আবদুর রহমানকে রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে পারতেন না।

আবদুর রহমান যখন সেনাবাহিনির মূল অংশ নিয়ে ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিলো, এই সেই আবদুর রহমান নন যিনি মহলের মাদকীয় আচ্ছন্নতায় বিভোর হয়ে থাকেন।

তার চোখ মুজাহিদীনে ইসলামের উজ্জল দীপ্তিতে পূর্ণ ছিলো। তার দেহের ভাষা ছিলো ঋজুততায় দৃঢ়। তিনি আপাদমস্তক সিপাহসালার বনে গিয়েছিলেন। তার মন-মস্তিষ্ক কর্মতৎপর সালারের মতো ধারালো হয়ে উঠলো।

তার কাছে যখন খবর পৌঁছলো মারীদায় বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং এর নেতৃত্ব দিচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার, তার চেহারায় তখন সামান্যতম দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েনি। যেন তার জন্য এ খবর প্রত্যাশিতই ছিলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন এবং ফ্রান্সের দিকে অগ্রসরমান অভিযান মুলতবী রাখলেন।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারকে যখন দুর্নীতির অভিযোগে মারীদার গভর্ণরের পদ থেকে পদচ্যুত করা হলো তখন খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের সবচেয়ে বড় দুই লিডার ইউগেলিস ও ইলওয়ার মারীদায় পৌঁছে গেলো।

তারা সেখানে অনেকটা গা ঢাকা দিয়ে রইলো। গোপন এক জায়গায় মারীদার সব গির্জার পাদ্রীদের ডেকে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে দিলো।

তাদের দিক নির্দেশনা মতে পাদ্রীরা লোকদেরকে বলতে লাগলো, মারীদার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে গোলাম বানানোর জন্য অনেক বড় ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টানরা যদি এ বোঝা মাথা পেতে নেয় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই এই বোঝার নিচে চাপা পড়ে তারা ভিখিরী হয়ে যাবে।

লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। আর মুসলমানরা সহজেই তাদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেবে। এর একমাত্র প্রতিকার হলো, কর্ডোভায় কেউ যেন ট্যাক্স না দেয়। প্রতিটি গির্জায় রাত দিন এভাবে ক্ষোভ ছড়িয়ে দিতে লাগলো পাদ্রীরা।

এর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার তার লুটেরা বাহিনী দিয়ে ট্যাক্স উসুলকারী সরকারি কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করায়। এর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিয়ে দেয়, এখন থেকে ধার্যকৃত ট্যাক্সের অর্ধেক দিলেই চলবে এবং তার লোকেরা ট্যাক্স উসুল করবে।

ট্যাক্স উসুলকারি কর্মকর্তাদেরকে শহরের বাইরে জঙ্গুলে এলাকায় হত্যা করে সেখানেই লাশ দাফন করে দেয়া হয়।

তারা যখন সময়মতো অফিসে ফিরে আসলোনা তখন সংশ্লিষ্ট অফিসের লোকেরা তাদেরকে খুঁজতে শুরু কররো। কিন্তু কোথাও তাদের কোন হদিস পাওয়া গেলো না। এদিক ওদিক লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন সদুত্তর মিললো না।

কিছুদিন পর জানা গেলো, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার ট্যাক্স উসুল করে নিয়েছে। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। সাধারণ লোকেরাও যেহেতু অর্ধেক পয়সা বেঁচে যাওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলো তাই তারাও তার কোন হদিস দিলো না।

ইউগেলিস ও ইলওয়ার শহরের আনাচে কানাচে ও দূর দুরান্তের গ্রামে ঘুরে লোকদেরকে ধর্মের নামে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে উস্কে দিতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো,

'আমাদের বাদশাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার। এখন মারীদা ও আশপাশের এলাকা স্বাধীন। তাই প্রত্যেকে যেন আজ থেকেই সৈনিক হয়ে যায়। মারীদার বর্তমান গভর্ণর আমাদের হাতে বন্দি। এজন্য এখন কর্ডোভা থেকে ফৌজ আসবে। এই ফৌজের মোকাবেলা করা আমাদের এখন বড় কর্তব্য কাজ। নিশ্চয় উন্দলুসকে মুসলমানদের কবল থেকে মুক্ত করার সৌভাগ্য মারীদার লোকদেরই হবে।'

লোকেরা দলে দলে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারের ঝান্ডাতলে জমা হতে লাগলো। গোপনে চলতে লাগলো তার জঙ্গি প্রস্তুতি। মারীদার প্রশাসন এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ রইলো। অবশ্য তাদের লোকবলও খুব বেশি ছিলো না।

❋❋❋❋❋

এক রাতে প্রতিটি ঘরে বড় গোপনে খবর পৌঁছে গেলো, কাল সকালে 'নাকারা' বেজে উঠতেই লোকেরা যেন সশস্ত্র হয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। তারপর গভর্ণর মহলে হামলা করে গভর্ণরকে গ্রেফতার করা হবে।

মারীদার গভর্ণ তো এটা জানতে পেরেছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার এ অঞ্চলের পুরো ট্যাক্স উসুল করে নিয়েছেন। কিন্তু তার এতটুকু সন্দেহ কোন দিন হয়নি যে, মারীদার লোকেরা মুহাম্মদের ফৌজ বনে গেছে। যেকোন সময় এর বিস্ফোরণ ঘটবে।

মারীদার অধিকাংশ এলাকাতেই খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য রয়েছে। যেসব খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে তারাও গোপনে খ্রিষ্টানই রয়ে যায়। আরব থেকে আসা মুসলিম পরিবারগুলো ভিন্ন অভিজাত এলাকায় থাকে। শহরে কি হচ্ছে সেটা তো তাদের জানার কথা নয়।

ঐতিহাসিকরা পরিস্কার ভাষায় লিখেছেন, আরব থেকে যে সব মুসলমানরা সরকারি বিভিন্ন পদে চাকরি নিয়ে উন্দলুসে এসেছে তাদের আচার ব্যবহার ছিলো আপত্তিজনক।

এরা নিজেদেরকে উন্দলুসের বিজয়ী ও শাসক শ্রেণীর লোক বলে মনে করতো। রাজকীয় ঢঙে চলাফেলা করতো। খ্রিষ্টান নাগরিকদের থেকে নিজেদেরকে বেশ দূরত্বে রাখতো। তাদেরকে এড়িয়ে চলতো। আর কেউ মুসলমান হয়ে গেলে মুসলমান হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করতো না। তাদের সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলতো, সামান্য ছুতোয় রূঢ় আচরণ করতো।

এই আপত্তিজনক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নওমুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা না জন্মে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। যেটা ক্রমেই ঘৃণা এবং বিদ্রোহের পরিণতিতে পৌঁছে।

খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠি যখন কোন বিশৃংখলা করতো, কোন চক্রান্ত করতো তখন সেটা দেখার মতো কিংবা তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যেতো না। তারা মাটির নিচ থেকে সর্বত্র চক্রান্তের জাল বিছিয়েও মুসলমানদের কাছ থেকে তা গোপন রাখতে পারতো।

তাদের সাফল্যের এটাই ছিলো সবচেয়ে বড় কারণ।

আর গভর্ণরের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এতই দুর্বল ছিলো যে, তারা এটাও অনুসন্ধান করে জানতে পারতো না শহরে কী হচ্ছে।

মারীদার গভর্ণরের নিরাপত্তা বাহিনী সংখ্যায়ও ছিলো কম। কয়েকজন বডিগার্ড ও আধা ইউনিট সেনা সদস্য। মারীদার মতো শহরের জন্য এ পরিমাণ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য যথেষ্টই কম বলা যায়।

❋❋❋❋❋

এখনো মাঝ রাত পেরোয়নি। গভর্ণর মহল ও আরব্য মুসলমানদের এলাকা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শহরের এক অংশ ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শহরের বড় এক অংশ তখনো জেগে আছে। প্রতিটি ঘরে প্রত্যেক সদস্য সশস্ত্র হয়ে নিচ্ছে। বাইরের বিশাল এক ময়দান সশস্ত্র লোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার দরবেশের ছদ্মবেশে আগেই শহরে এসে বসে আছে। সে পর্যন্ত তার সশস্ত্র লোকের সংখ্যা (ঐতিহাসিকদের মতে) চল্লিশ হাজারে পৌঁছে গেছে।

জানা কথাই, এ এক অনিয়মিত ফৌজ। যাতে শহরবাসীই বেশি এবং ছাটাই করা পুরনো কিছু সেনাবাহিনীর সদস্যও এ দলে আছে।

অর্ধেক ফৌজ শহরের বাইরে শহরের প্রধান ফটক খোলার অপেক্ষায় রয়েছে।

আচমকা শহরের ভেতর শোরগোল উঠলো। যেটা গভর্ণরের মহলের কাছে গিয়ে চিৎকার চেচামেচি ও উদ্ধত শ্লোগানে পরিণত হলো। মারীদার গভর্ণরের বডিগার্ডরাও সামান্য যে সেনা সদস্য ছিলো তারা পুরোপুরি জেগে উঠারও সুযোগ পেলো না।

গভর্ণরের চোখ যখন খুললো তখন তার চারপাশে আট দশজন লোক। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। তারা তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গেলো।

বাইরে এমন হৈ চৈ, চিৎকার চেচামেচি যে, নিজের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

হাজার হাজার মশালের জ্বলন্ত ফুলকি যেন এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য ঘোড়া চারদিকে ছুটাছুটি করছে। মুসলমানদের বাড়িগুলো থেকে ওঠা আগুনের শিখা যেন আকাশকে ছাড়িয়ে যেতে যাচ্ছে। মুসলমানদের বাড়ি ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর আগে সেখানে লুটপাট চালানো হয়েছে।

'আমার মুহাফিজরা কোথায়? এসব কী হচ্ছে?' মারীদার গভর্ণর গর্জন ছেড়ে বললেন।

'ওদেরকে তোমার আগেই কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।' এক বিদ্রোহী নেতা বললো, 'আর তোমার হাতে গোনা ফৌজকে নিরস্ত্র করে এদের আশেপাশে প্রহরা দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে।.....এটা বিদ্রোহ হচ্ছে। তোমাদের সব শাসন ক্ষমতা খতম হয়ে গেছে। তুমি এখন আর আমীর নও, আমাদের হাতে–বন্দি।'

তাকে বড় একট রাজকীয় কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ফানুস জ্বলছে। এটা গভর্ণরের এজলাস কক্ষ। সেখানে এখন কয়েকজন লোক বসে আছে। তাকে একজনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। গভর্ণর লোকটিকে দেখে চমকে উঠলেন।

'তুমি?' তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার?.....আরে ডাকাতের গোদা! এসব তোমারই শয়তানি?'

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার হো হো করে হেসে উঠলো।

'আমার কাছে জবাবাদিহি চওয়ার সময় এখন আর নেই,' মুহাম্মদ হাসতে হাসতে বললো, 'তোমার রাগ–অভিমান এখন কচুর পাতা.....বাকি জীবন তোমার কয়েদখানায় পড়ে থাকতে হবে।'

'হায়রে বেকুব গাদ্দার!' মারীদার আমীর বললেন, 'নিজের পরিণামের কথা এভাবে ভুলে যেয়ো না। গাদ্দাররা কোন বাদশাহকে কতল করতে পারে ঠিক; কিন্তু বাদশাহ হতে পারে না। মাত্র কয়েকদিনই ক্ষমতার নেশা উপভোগ করে নিতে পারবে। তারপর নিজের পরিণাম নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'.....

'যারা আজ তোমাকে কাঁধে করে এ পর্যন্ত এনে এই আসনে বসিয়েছে তারাই একদিন তোমাকে আমাদের অনুগ্রহ আর করুণার ওপর একলা ফেলে রেখে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে যাবে।'

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার এখন বিজয় ও ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। গভর্ণরকে সে কোন পাত্তা দিলো না। তার কথা শুনবে কখন! চোখেমুখে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বললো,

'ওকে নিয়ে যাও।.....ওর সারা খান্দানকে কয়েদখানায় ছুঁড়ে মারো।'

গভর্ণরের সীমিত সেনা সদস্যদের নিরস্ত্র করে তাদেরকে সশস্ত্র প্রহরার বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে। যে দিকেই চোখ যাচ্ছে সেদিকেই আগুনের জ্বলজ্বলে শিখা দেখা যাচ্ছে।

গভর্ণরের এক সেনা কমান্ডার একটি গাছের ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ লুকিয়ে রইলো। তারপর সুযোগ বুঝে গাছে চড়ে বসলো। শহর জুড়ে তখন কেয়ামতের বিভীষিকা চলছে। মুসলমানদের ও বিত্তশালী খ্রিষ্টান ব্যবসায়ীদের ঘরে লুটপাট চলছে। জ্বলছে বহু বাড়ি ঘর।

কমান্ডার গাছের ওপর বসে পালানোর পরিকল্পনা করতে লাগলো। এর নিচে এক ঘোড়সওয়ার প্রহরী টহল দিচ্ছে। কায়দা করে প্রহরীর ঘোড়ার ওপরই লাফিয়ে পড়লো কমান্ডার। পর মুহূর্তেই তার হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিলো এবং তার ঘাড়ের অর্ধেক এক কোপে কেটে ফেললো। প্রহরী ঘোড়া থেকে কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে করতে পড়ে গেলো। কমান্ডারও ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো উর্ধ্বশ্বাসে।

শহরের ফটক তো তখন অবারিত। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল জব্বারের বাইরে থাকা সশস্ত্র ফৌজ শহরের ভেতর ঢুকছে। শহরের ভেতরের আতংকিত–ভীতসন্ত্রস্ত লোকজন বাইরে যাচ্ছে। লুটপাট ছুটাছুটির মধ্যে কে কোথায় যাচ্ছে আসছে সেদিকে তাকানোর মতো অবস্থা নেই কারো।

কমান্ডার এই চরম হুলুস্থুল অবস্থার মধ্যে নির্বিঘ্নে শহর থেকে বেরিয়ে গেলো। কর্ডোভার দিকে ঘোড়া ছুটালো। তার সামনে দীর্ঘ পথ। দ্রুত পৌঁছে মারীদার বিদ্রোহের খবর দিতে হবে তাকে। বাকি রাত ঘোড়া ছুটিয়েই কাটালো সে।

সকাল হলো, সূর্য মাথার ওপর উঠে এলো। কিন্তু সে থামলো না।

এক জায়গায় সে উন্দলুসের দুই সেনা সদস্যকে দেখতে পেলো। তাদের কাছে গিয়ে জানতে পারলো, তারা বিশেষ কাজে কর্ডোভা থেকে অন্য এক শহরে যাচ্ছে। তাদেরকে মারীদার অবস্থা জানিয়ে বললো, সে এখন কর্ডোভায় এ সংবাদ জানাতে যাচ্ছে।

'কর্ডোভা গিয়ে কী করবে?' এক সৈনিক বললো, 'আমীরে উন্দলুসকে তুমি ফ্রান্সের পথে পাবে। ফ্রান্সের ওপর হামলা করতে যাচ্ছেন তিনি পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে। তুমি সেদিকে চলে যাও। পথ চেনা আছে তো?'

'হ্যাঁ, চেনা আছে।'

অনবরত সফরে কমান্ডারের ঘোড়া তখন বেশ ক্লান্ত। তারা তাদের একটি তাজাদম ঘোড়া দিয়ে দিলো। তাজাদম ঘোড়া পেয়ে এবার তার ছুটার গতি আরো তীব্রতর হয়ে উঠলো। ঘুম, ক্লান্তি, ক্ষুধার উর্ধ্বে উঠে সে প্রায় উড়ে চললো।

অবিশ্বাস্য কম সময়ে আমীরে উন্দলুস আবদুর রহমানকে সে পেয়ে গেলো। আবদুর রহমান তার সেনাবাহিনীর অভিমুখ করে দিলেন মারীদার দিকে।

❋❋❋❋❋

সালার আবদুর রউফকে ফ্রান্সের অভিযান থেকে ফিরে আসতে হলো। তীব্র গতিতে তিনি এগিয়ে আসতে লাগলেন। তিনি সবচেয়ে বেশি মারীদার কাছে ছিলেন। ওদিক থেকে আবদুর রহমনও যথাসম্ভব দ্রুত তার সেনাদল নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

আবদুর রহমান সৈনিকদের মধ্যে যারা তবলা, নাকারা বাজাতে পারে, যুদ্ধ সঙ্গীত গাওয়ার মতো যাদের সুকণ্ঠ রয়েছে তাদের সেনাবাহিনীর মাঝখানে অবস্থান দেয়া হলো। যাতে তাদের আওয়াজ দলের শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত পৌঁছে।

সারেঙ্গীবাদকদেরকে বলা হলো, তারা যেন এমন উত্তেজক বাদ্যযন্ত্র বাজায় যাতে রক্ত টগবগ করে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলোও উত্তেজিত ও তীব্র গতির হয়ে উঠে। সৈনিকদের তো রক্ত গরম করা এমন উত্তেজক সঙ্গীত ভালোই জানা ছিলো।

কিছুক্ষণ পরই রক্ত টগবগ করা বাদ্যের দামামা ও যুদ্ধ সঙ্গীতের অনলবর্ষী ছন্দায়িত গর্জনে যেন কাছে-দূরের পাহাড়গুলোও হেলে উঠতে লাগলো।

ওরা গাইছিলো এক আরবী সঙ্গীত। উন্দলুসের বিজয় উপলক্ষ্যে শতবর্ষ আগে এক বিখ্যাত কবি খাদ্দান তুসী এটা রচনা করেন।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ভরা তরঙ্গ
মহাসাগরের একেকটি পর্বতীয় ঢেউ চতুরঙ্গ
মন্থন করে, পায়ে পিষে
খোদার সিংহপুরুষ যারা ছিলেন
রণ-হাওয়ার শাহবাজ হয়ে যারা এলেন
রাসূলের (সা) প্রতি উৎসর্গ প্রাণ
অকাতরে করে গেলো দান
ভয় পায়নি সমুদ্রের চোখ রাঙানি
বিন্দু বিন্দু করে দিয়েছে সিন্ধু,
ঢেউ, তরঙ্গের পাহাড় খন্ড।
সাইক্লোন, ঝড়, টর্নেডো থাকেনি আর অখন্ড।
থমকে গেছে আকাশের বিদ্যুৎ চমক
যখন শুনেছে তারেক অগ্নি সেনাদের বজ্রধমক।

এগিয়ে এসেছে সমুদ্র তীর যেন পায়ে হেঁটে
সিজদাবনত হয়ে–বিনীত কণ্ঠে বলে,
মুজাহিদরা! বিশ্বজয়ী বীর যোদ্ধারা!
ছিলো তো তোমাদেরই প্রতীক্ষা
শতাব্দীর অগ্নিপরীক্ষা।
ফেলে আসা পথের দিকে আর তাকিয়ো না
ওখানে লেখা নেই তোমাদের জন্য কোন গৌরবনামা
তারেকের ভেতর কুদরতী হাত জ্বেলে দিলো এই অগ্নিবীনা।
দৃপ্ত পদের মুজাহিদরা!
জ্বালিয়ে দাও স্মৃতি তাড়ানো ঐ কিশতীগুলো
ফিরে যাওয়ার রাহা রুদ্ধ,
শুধু সামনে এগিয়ে যাও, প্রত্যেকেই হয়ে যাও
ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঝড় অপ্রতিরোধ্য।
ফিরে যেতে হলে–
প্রাণ যাবে না–যাবে না বুকের এক ফোঁটা নিঃশ্বাস
যাবে নিঃসাড় লাশ।
তারপর তো এগিয়ে যাওয়ার গল্প
সৈন্য সংখ্যা তো ছিলো বড় স্বল্প
লড়তে লড়তে, কাটতে কাটতে
মরতে মরতে, মারতে মারতে
আছড়ে পড়লো কিছু এখানে,
ঝাঁপিয়ে পড়লো কিছু সেখানে।
তাণ্ডবলীলা করতে করতে প্রাচীর হয়ে এগিয়ে এলো
জালিম আর কুফরের পাহাড়–
ফেটে গেলো, হটে গেলো
হাজারো জয়ের বন্ধ পথ খুলে দিলো
অবিরত অগ্রসরমান মুজাহিদ দল
চূড়াস্পর্শী সংকল্প, কী ভীষণ
ঈমানের শক্তি-বল।
উন্দলুসের মাটি–উঠলো হেলে দুলে,
আজানের মর্ম সুরে
কুরআনের গভীর আহ্বানে

রাসূলের (সা) জীবন্ত অনিঃশেষ বাণীতে।
সেই সুরের মধুর গুঞ্জরণ, আওয়াজের স্মারক
লেখা হয়েছে মুজাহিদদের তপ্ত রক্তে।
আমাদের ওপর রয়ে গেছে রক্তের করজ
এটা আমাদের ফরজ
সেই রক্তের ঋণ শোধ দাও
মুজাহিদরা!
বাঁধভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের মতো এগিয়ে যাও।
জালিম-কুফরের পাহাড় আজ
আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, ভেঙ্গে পড়ছে,
চ্যালেঞ্জ ছুড়ছে
ঈমানের দীপ্তিতে সেজে নাও
রণ সাজ।
মুজাহিদ! মুজাহিদ!
তছনছ করে দাও – চূর্ণ বিচূর্ণ
মুখ-মুখরিত রাখো–আল্লাহ আল্লাহ।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!!

❃❃❃❃❃

এই ঐতিহাসিক যুদ্ধসঙ্গীত মুজাহিদদের জোশ–জযবা, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুললো। আবদুর রহমান এটাই চাচ্ছিলেন। ঘোড়াগুলোর চলায় যেন ক্ষুরাঘাতে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো।

আবদুর রহমানের দেহেও যেন নব উদ্যোমের রক্ত ও ভরে দিয়েছে। দারুণ সতেজ তিনি।

তিনি ঝাণ্ডাধারীর হাতে ধরে রাখা ঝান্ডাটির দিকে তাকালেন। সেটা এমন পত পত করে উড়ছে যেন সৈনিকদের রণসঙ্গীত ও দৃপ্ত হুংকার এর মধ্যেও নতুন প্রাণ ভরে দিয়েছে। কাপড়ের এই টুকরোর মধ্যেও যেন এই উপলব্ধি জেগে উঠেছে, কুফুরের ঐ কালো পাহাড়ের হৃদপিন্ড ভেদ করে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে।

আবদুর রহমান চলন্ত অবস্থায় তার বাম দিকে তাকালেন। তার চোখ পড়লো সালারে আলা উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ওপর। আব্দুর রহমান তার ঘোড়া উবাইদুল্লাহর ঘোড়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

'উবাইদুল্লাহ!' আব্দুর রহমান বললেন, 'যেদিন এমন রক্ত বিশুদ্ধ করা ঈমান জাগানিয়া রণসঙ্গীত থেকে মুসলমানরা মুখ ফিরিয়ে নেবে সেদিনই মুসলমানদের পতন শুরু হয়ে যাবে।'

'সঙ্গীতে এমন এক শক্তি আছে যে, তা ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলে,' উবাইদুল্লাহ বললেন, 'কিন্তু সঙ্গীতে এই অপশক্তিও আছে যে, জাগ্রত আত্মাকে তা চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রক্ত যেমন উত্তপ্ত করে তুলে তেমনি রক্ত হিম শীতলও করে দেয়। এটা শ্রোতার ওপর নির্ভর করে যে, সে কোন ধরনের সঙ্গীত পছন্দ করে।'

'এমন শক্তি রয়েছে নারীর মধ্যেও'। আব্দুর রহমান বললেন, 'একজন নারী তলোয়ারের তীক্ষ্ম ফলার মতো। আবার কোষবদ্ধ তলোয়ারও একজন নারী। তীব্র ধারযুক্ত তলোয়ারকে অকেজো করে দিতে পারে একজন নারী। দুই রূপেই আমি নারীকে দেখেছি। আমার হাতে তো মুদ্দাসসিরা নামের এক নারীই তলোয়ার উঠিয়ে দিয়েছিলো'।

'আর আপনার তলোয়ার কোষবদ্ধ করে কে রেখেছিলো?'

আব্দুর রহমান উবাইদুল্লাহর এ কথায় চমকে উঠে তার দিকে তাকালেন। যেন বেখেয়ালে কথা বলতে বলতে আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন।

উবাইদুল্লাহ তার মুখের বিব্রত অবস্থা দেখে এ বিষয়ে আর এগুলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন, আব্দুর রহমানের স্মৃতির পাখা উড়ে গেছে তার মহলের দিকে। যেখানে যারিয়াবের মাতাল করা সঙ্গীত ও সুলতানার অবাধ্য রূপ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

উবাইদুল্লাহ মারীদা অবরোধের ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলেন। আব্দুর রহমান লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে যাননি এটা দেখে উবাইদুল্লাহ বেশ স্বস্তিবোধ করলেন।

মারীদার বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে আব্দুর রহমানও বেশ উৎসাহ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর কথার সুরে দারুণ এক আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া অনুভব করলেন উবাইদুল্লাহ।

মারীদা এখনো বেশ দূর। কর্ডোভার সেনাদল অবিরত তাদের চলার গতিতে। একটা ছাউনি ফেলা তো জরুরী হয়ে উঠেছে।

*****

মারীদার রাষ্ট্রীয় কোষাগার এখন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বারের দখলে। ইবনে আব্দুল জব্বার এখন মারীদার একচ্ছত্র আমীর বনে গেছেন।

ওখানকার অধিকাংশ নও মুসলিমই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্ট ধর্মে ফিরে গেছে। এটা 'তাহরীকে মুআল্লিদীন- ধর্মত্যাগী আন্দোলনকারীদের প্রথম সাফল্য। নও মুসলিমদের দু'মুখো সাপের আচরণে অবতীর্ণ করতে পেরে ওরা এখন অন্যরকম এক বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করছে।

ইউগেলিস ও ইলওয়ার মারীদাতেই বসে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের হাতে গড়া ফৌজের সংখ্যা এখন চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মারীদা দখলের পর এদের সৈন্য সংখ্যা হো হো করে বাড়তে থাকে। তবে এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত কোন সৈন্য নয়।

এরা সবাই এই শহরের নাগরিক। বিচ্ছিন্নভাবে এরা লড়তে জানে। কিন্তু সেনাবাহিনীর আকারে দলবদ্ধ হয়ে এরা কখনো লড়াই করেনি।

তারপরও এরা খুব সহজেই মারীদা জয় করে নেয়। এজন্য ওদের আনন্দ বাঁধ ভাঙ্গা আকার ধারণ করেছে। ওরা এখনো লুটপাট চালিয়ে তাদের বিজয় উৎসব করছে। মুসলমানদের ঘর বাড়িগুলো একেবারেই তছনছ হয়ে গেছে। মুসলিম নারীদের তো কোথাও কোন হদিস নেই। কে কোথায় আছে, এটা কেউ জানে না।

যারা বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়েছে তাদের স্ত্রী, বোন বা মেয়েরা চলে গেছে বিদ্রোহীদের দখলে।

মারীদা শহরের মধ্যাংশে বিশাল বড় এক ময়দান রয়েছে। এখানে ঘোড় দৌড়, সৈনিকদের কুচকাওয়াজ হয় এবং প্রেডগ্রাউন্ড হিসাবেও এ ময়দান ব্যবহৃত হয়।

লুটেরা প্রশাসনের ডাকে শহরের সবাই সেই ময়দানে জমায়েত হলো। একটু পর ইউগেলিস ইলওয়ার ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার ঘোড়ায় চড়ে সমবেত মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো।

'মারীদার বিজয়ী লোকেরা!' ইউগেলিস তার ঘোড়ার রেকাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে অতি উচুঁ আওয়াজে বললো, 'তোমাদের সবাইকে স্বাধীনতার উষ্ণ শুভেচ্ছা। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার মারীদার আমীর ও এবং সুলতানও। বাদশাহও। তোমাদের বাদশাহ এখন তোমাদরে মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন...।

'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল জব্বার জিন্দাবাদ!'

'ঈসা মাসীহ জিন্দাবাদ!'

'উন্দলুস আমাদেরই দেশ!'

'এখানে মুসলমানদের কোন স্থান নেই।'

'পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের জায়গা নেই।'

'পুরো পৃথিবী খ্রিষ্টানদের।'

হাজার হাজার মানুষের এ ধরণের বিভিন্ন শ্লোগানে মারীদার যমীন ও আসমান কেঁপে কেঁপে উঠছে। খ্রিষ্টান মেয়েরাও এই বিজয় উৎসবে যোগ দিয়েছে।

একটু পর দেখা গেলো, নারী-পুরুষ এখানে একাকার হয়ে গেছে। তারপর শুরু হলো অশ্লীলতা আর নির্লজ্জ প্রদর্শনী। যেন ওখানে কোন মানুষ নেই। সব চতুষ্পদ জন্তু। যাদের কখনো লাজ-শরম বলতে কোন কিছু ছিল না।

❋❋❋❋❋

'বন্ধুরা!' নানা চিৎকার চেচামেচি অশ্রাব্য শব্দের ভেতর থেকে ইউগেলিসের কণ্ঠ শোনা গেলো। সবাই ধীরে ধীরে নীরব হয়ে গেলো। ইউগেলিস বললো,

'আমীর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার প্রমাণ করে দিয়েছেন ধর্ম কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তিনি তোমাদেরকে স্বাধীনতা উপহার দেয়ার জন্য নিজের হুকুমত ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন'...।

'আজ তোমরা মারীদা জয় করেছো। একদিন তোমরা কর্ডোভাও দখল করে নেবে। উন্দলুস তোমাদের কাছে অনেক বড় কুরবানী চাচ্ছে।'

এসময় এক ঘেড় সাওয়ার ছুটতে ছুটতে ভিড় চিড়ে সেখানে এসে দাঁড়ালো, যেখানে তিন নেতা দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়সওয়ারের চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। তিন নেতা ঘোড়সাওয়ারের কথা শুনলো। কথা শেষ হলে ইউগেলিস আরেকবার ঘোড়ার রেকাবিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে বলতে লাগলো,

'মারীদার বীর বাহাদুররা! তোমাদের পরীক্ষা দেয়ার সময় এসে গেছে। এই মাত্র খবর এসেছে, আমীরে উন্দুলুসের ফৌজ এদিকে ধেয়ে আসছে। শহরের ফটকগুলো ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও। সাহসী লড়াকুরা অধিক সংখ্যায় শহরের প্রাচীরে গিয়ে উঠো। শত্রুপক্ষ কাছে আসলেই তীর বৃষ্টি শুরু করে দেবে'।

'আকাশ ফাটানো শ্লোগান আর মেঘ গর্জনের আঘাত হেনে দুশমনকে বরণ করে নেবে। কর্ডোভার সৈন্যরা প্রাচীরের কাছে ঘেষলে ওপর থেকে বর্শা মেরে মেরে ওদেরকে শেষ করে দেবে। অবরোধ দীর্ঘ হয়ে গেলেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এই শহরে খাবার দাবারসহ অন্যান্য রসদ পত্রের কমতি নেই।'

ইউগেলিসের কথা শেষ হলে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার গর্জে উঠলেন,

'মারীদার সিংহরা! বিজয় অবশেষে তোমাদেরই হবে। তবে মনে রেখো, তোমাদের মোকাবেলা হবে এক অভিজ্ঞ সেনাদলের সঙ্গে। আব্দুর রহমানের ফৌজ কেল্লা জয় করতে জানে।'

'তোমরা কেবল শ্লোগানের উন্মত্ততা দিয়ে এই ফৌজকে পরাজিত করতে পারবে না। তবুও ওরা যতই শক্তিশালী হোক ওদেরকে পরাজিত করা খুব কঠিন

কাজ নয়; যদি তোমরা জমিয়ে নির্ভয়ে লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারো। তবে হামলার সময় কিন্তু তোমরা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসো না।'

'যেদিক থেকেই দুশমন আসবে সেদিকেই তোমরা তীর বৃষ্টি শুরু করে দিবে। মনে রেখো, এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। কর্ডোভার ফৌজ যদি একবার কেল্লার ভেতরে আসতে পারে তাহলে তোমাদের যে কী পরিমাণ হবে সেটা তোমরা এখন চিন্তাও করতে পারবে না।'....

'এ ফৌজ তো এক সময় আমারই ফৌজ ছিলো। তাই আমি ভালো করেই জানি, এই ফৌজ যখন দুশমনের ওপর চড়াও হয় তখন একজন সিপাহীর মনেও সামান্যতম করুণা থাকে না। হিংস্র প্রাণী হয়ে উঠে। কেল্লায় ওরা ঢুকতে পারলে তোমাদের পাইকারী ধরে হত্যা ছাড়া আর কিছুই হবে না'।...

'শুধু কি তাই, তোমাদের স্ত্রী-কন্যারা কর্ডোভার সিপাহীদের তাবুতে চলে যাবে বিনামূল্যে পাওয়া পণ্যের মতো। যে স্বাধীনতা তোমরা পেয়েছো এর মূল্য বুঝার চেষ্টা করো। এই স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদেরই।'

লোকদের জোশ-জযবা, লড়াইয়ের স্পৃহা আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেলো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বারের বক্তৃতায়। শ্লোগানে শ্লোগানে তারা চারদিক মুখরিত করে তুললো।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর জব্বার, ইউগেলিস ও ইলওয়ার দক্ষ লড়াকু ও যোদ্ধাদের বেছে বেছে আলাদা করে লড়াই ও লড়াই পরিচালনার স্কিম বানাতে শুরু করলো।

❋❋❋❋❋

সালার আব্দুর রউফ ও সালার মুসা ইবনে মুসার সেনা ব্যটালিয়ান ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। তিন দিনের দূরত্ব তারা দুই দিনেই অতিক্রম করে।

আব্দুর রহমান তার নিজের কিছু সেনা ব্যাটালিয়ান নিজের সঙ্গে রেখে পথেই এক জায়গায় সাময়িক তাবু ফেললেন এবং কয়েক ব্যাটালিয়ান সৈন্যসহ উবাইদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহকে মারীদার দিকে এগিয়ে যেতে বললেন।

'আপনার নিশ্চয় জানা আছে উবাইদুল্লাহ!' আব্দুর রহমান বললেন, 'ঐ লুটেরা বিদ্রোহীদের আসল মাথা ফ্রান্সের শাহ লুই। আমি আমার সেনা ইউনিট নিয়ে ফ্রান্স ও মারীদার পথে ঘাপটি মেরে থাকবো। মারীদা অবরোধ করলে ফ্রান্সের ফৌজ অবরোধ ভাঙ্গতে পেছন থেকে এসে আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। আর এমন ঘটলে ফ্রান্সীরা যেন পথেই কচু কাটা হয় এখানে থেকে আমি সে ব্যবস্থা করবো।'

'কিন্তু ফ্রান্সের ফৌজ যদি এসেই পড়ে তাহলে আপনার সামান্য এই সেনাদল সম্ভত: ওদেরকে রুখতে পারবে না; উবাইদুল্লাহ বললেন, 'সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সেনা সাহায্য চেয়ে পাঠাবেন।'

'মুসলমান সবসময় সংখ্যায় কমই ছিলো উবাইদুল্লাহ!' আব্দুর রহমান আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'আর সবসময় সংখ্যায় স্বল্পই থাকবে মুসলমানরা। আমার এই সামান্য ফৌজই ফ্রান্সীদের রুখে দেবে।'

'তবে আমরা সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবো না। ছোট ছোট দলে ফৌজকে ভাগ করে ওদের ওপর গেরিলা হামলা চালিয়ে যাবো। এই এলাকাতেই চোর পুলিশ খেলার মতো ফ্রান্সীদের সঙ্গে আমরা খেলে যাবো এবং এখানে ওদেরকে আটকে রাখবো। আপনি এগিয়ে যান উবাইদুল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

এটাই ছিলো উন্দলুসের আমীর আব্দুর রহমানের আসল রূপ। তিনি এই দেশের বাদশাহ। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে এসে হয়ে গেলেন লড়াকু সিপাহী।

তার এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিকরা দারুণ দূরদর্শী এক সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গীতের মাতাল করা সুর আর নারীর উন্মত্তরূপ তাকে এমনভাবে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়াতে সবসময় মুখিয়ে থাকতো যে, তার এই অমিত সংগ্রামী পুরুষটি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তো। বাস্তব এই দুনিয়া থেকে তিনি পরাবাস্তব এক দুনিয়ায় হারিয়ে যেতেন।

মারীদায় কর্ডোভার অনুগত যে সামান্য ফৌজ ছিলো ওরা তা বিদ্রোহীদের হাতে প্রথমেই বন্দি হয়ে পড়ে। তবে একজন কমান্ডার তখনই পালাতে সক্ষম হয়। কমান্ডার খ্রিষ্টান এক প্রহরীকে খতম করে তার পালানোর পথ সহজ করে নেয়। বিদ্রোহীরা এজন্য অন্য বন্দি ফৌজদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং তাদের প্রহরা আরো নিচ্ছিদ্র করে রাখে।

এই কমান্ডারই মারীদা বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাওয়ার খবর কর্ডোভায় নিয়ে যায়। এরই ভিত্তিতে কর্ডোভার ফৌজ জরুরি ভিত্তিতে রণ প্রস্তুতি নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

যেদিন মারীদায় খবর পৌঁছলো, কর্ডোভার ফৌজ আসছে সেদিন তো শহর জুড়ে দারুণ অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো। বিদ্রোহীদের এক কমান্ডার বন্দি ফৌজের কাছে এলো এক প্রস্তাব নিয়ে।

'আগামী কাল নাগাদ কর্ডোভার ফৌজ মারীদা অবরোধ করে নিবে।' বিদ্রোহী দলের কমান্ডার বন্দি মুসলিম সিপাহীদেরকে বললো, 'তবে আমরা কোন মূল্যেই এই অবরোধকে সফল হতে দেবো না। যদি অবরোধ কোন কারণে সফল হতে থাকে এবং কর্ডোভার ফৌজ শহরে ঢুকে পড়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে তোমাদেরকে সবার আগে আমরা শেষ করে দেবো।'....

'তবে এক শর্তে তোমরা তোমাদের প্রাণ বাঁচাতে পারো। সেটা হলো, আমাদের সঙ্গে তোমরা হাত মেলাও এবং অবরোধ ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে তোমরা ভূমিকা রাখো। কর্ডোভার ফৌজ অবরোধ উঠিয়ে চলে গেলে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে। তখন যেখানে ইচ্ছা তোমরা চলে যেতে পারবে।

আসলে বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার দরকার। তাই ওরা এই প্রস্তাব দিয়ে একটা চাল চাললো।

বন্দীদের মধ্যে মাত্র চারজন সেই কমান্ডারের প্রস্তাবে রাজি হলো। এর মধ্যে একজন আবী রায়হান। সে গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার ছিলো। বাকি তিনজন দক্ষ সিপাহী। অন্যান্য বন্দিরা আবী রায়হান ওদের সেঙ্গ হাত মেলানোতে খুবই বিস্মিত হলো। বিশেষ করে আবি রায়হানের ব্যাপারে। কারণ, বরাবরই আবী রায়হান কর্ডোভার দারুণ অনুগত এক কমান্ডার এবং দায়িত্বশীল মুসলমান।

আবী রায়হান তার তিন সিপাহীকে নিয়ে বিদ্রোহী কমান্ডারের সাথে চলে গেলো। অন্যান্য বন্দি সিপাহীরা ওদেরকে খুব তিরস্কার করলো। গাদ্দার, বেঈমান, মুনাফিক, হারামখোর কাপুরুষ ইত্যাদি যা মুখ দিয়ে আসলো তাই বললো। কিন্তু কোন কিছুই ওদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারলো না।

❋❋❋❋❋

বিদ্রোহী কমান্ডার আগে আগে চলছে। আর তার পেছনে যাচ্ছে এই চারজন। যখন ওরা একটা গলির মোড় ঘুরলো আবী রায়হান ইচ্ছে করেই একটু পেছনে রয়ে গেলো। কমান্ডার সামনে এগিয়ে গেলো। আবী রায়হান পেছন ফিরে একটু হেঁটে অন্য গলিতে ঢুকে পড়লো।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর বিদ্রোহী কমান্ডার টের পেলো, ওদের চারজনের একজন গায়েব। কিন্তু ততক্ষণে আবী রায়হান বেশ দূরে চলে গেছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পুরো শহরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে কর্ডোভার ফৌজ আসছে। শহরের প্রত্যেকেই তাই নিজের নিরাপত্তা চিন্তায় নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত। আবী রায়হানের মতো সাধারণ এক বন্দি লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার খবর এখন কে রাখতে যাবে।

মারীদা বিশাল এক শহর। শহর প্রাচীরের ভেতর বেশ কিছু এলাকা এবড়ো খেবড়ো খানাখন্দ ও খাল বিলে ভরা। এগুলোর মধ্যে শহরের বাইরে বয়ে যাওয়া এক নদীর পানির প্রবাহ রয়েছে। বাইরের নদী ও ভেতরের এই গভীর খানাখন্দ শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুরক্ষা দিয়েছে।

এই খন্দাখন্দ এলাকায় প্রাচীন কালের বেশ কিছু দালান কোঠার ধ্বংস্তুপ রয়েছে এর ব্যাপারে বেশ ভীতপ্রদ নানা কাহিনী এই শহরে প্রচলিত রয়েছে। তাই

ওখানে কেউ যাওয়ার সাহস করে না। এখানে ঝোপঝাড় ও বড় বড় গাছের এলো মেলো এক জঙ্গলও আছে।

আবী রায়হান তার বন্দি সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলো না। সে কেল্লা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা চালালো কিছুক্ষণ। কিন্তু কর্ডোভার ফৌজ আসার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফটকগুলোর আশেপাশে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শহরের কোথাও তো আবী রায়হানের ঠিকানা হওয়ার কথা নয়। তাই সে ঐ পরিত্যক্ত এলাকার দিকে রুখ করলো। সূর্যাস্তের পর ওখানে গিয়ে পৌছলো আবী রায়হান। হাঁটতে হাঁটতে সে পোড়া বাড়ি ঘরের ধ্বংস্তুপের ভেতরে চলে গেলো।

তখনই তার মনে পড়লো, এ জায়গা তো ভৌতিক এলাকা হিসাবে পরিচিত। কোন কিছু থেকে থাকলে তো ওকে ছাড়বে না। তারপর আবার শীতের প্রচণ্ডতা রয়েছে এখানে। রাত যত গভীর হবে শীতের প্রকোপও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকবে।

চার দিকেই মৃত্যুর বিভিষিকা আর অশরীর নাচ দেখতে পেলো আবী রায়হান। তার বেঁচে থাকার একমাত্র পথ হলো, বিদ্রোহী কমান্ডারের কাছে চলে যাওয়া। তারপর ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়া। কিন্তু এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শীত ওকে বেশ ভোগাতে শুরু করলো। সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলো, সে ধ্বংস্তুপের ছাদের কিছু অংশ অখন্ড রয়ে গেছে; সে ধ্বংস্তপের এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলো।

❃❃❃❃❃

আল্লাহর নাম আর পবিত্র কুরআনের আয়াতের অবিরাম উচ্চারণ তার মুখে। সব ভরসা তার আল্লাহর ওপর। অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতার হচ্ছে। চার দিকে যমধরা নির্জনতা। অশরীরি কোন কিছুর অস্তিত্ব এখনো সে টের পায়নি।

শীতে এখন সে রীতিমতো ঠক ঠক করে কাঁপছে। বড় বড় পাতায় ভরা এক বৃক্ষের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো আবী রায়হান। এ সময় শুনলো আবী রায়হান একটা আওয়াজ।

যেন কোন শিশু কাঁদছে। আরো কান পেতে শুনলো। হ্যাঁ, কোন শিশুই কাঁদছে। এখানে কোত্থেকে বাচ্চা আসবে? এ নিশ্চয় কোন প্রেতাত্মার নাকি কান্না। আবী রায়হান বুঝলো, এখন শুধু কোথাও লুকানো বা শীতের থাবা থেকেই বাঁচাই নয়, এই শহর থেকে বের হওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ।

একটা রাস্তা তার জানা আছে। সে সেনা কমান্ডার। এই শহরে সে বহুদিন ধরে আছে। তাই সে জানে, শহর প্রাচীরটি বেশ মজবুত হলেও নিশ্চয় কোথাও কোন দুর্বল জায়গা আছে কিনা। সে জানে, শহরের ড্রেনেজ পানি ও বৃষ্টির পানি এই বড় নালা দিয়ে শহর প্রাচীরের নিচ দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে।

সে ভেবে দেখলো, এই নালা দিয়ে শহরে থেকে বেরোনো যাবে কিনা। নালা এত চওড়াও নয়।

প্রাচীন ভৌতিক ধ্বংসাবশেষ। প্রেতাত্মার নাকি কান্না। বিভিন্ন ভৌতিক শব্দ তার শরীরের শক্তি অর্ধেক শুষে নিয়েছে।

আবী রায়হান কুরআন শরীফের একটি আয়াত উচুঁ আওয়াজে পড়তে পড়তে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে একটা সরু গলি দিয়ে ঢুকে পড়লো। দুই কামরার মাঝখান দিয়ে এটি একটি রাস্তা। এর ওপর ছাদও আছে। তবে সামনের দিকে ছাদের এক অংশ ধ্বসে পড়ে আছে।

তার কাছে মনে হলো, ওপর থেকে কেউ যেন জোরে শিষ দিচ্ছে কিংবা নিঃশ্বাস ফেলছে।

প্রেতাত্মার উপস্থিতিতি যেন সে টের পেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, পা ঘেষটে ঘেষটে তার পেছন পেছন কে যেন আসছে। সে নিশ্চিত হয়ে গেলো তার পেছন পেছন কেউ একজন আসছে। জনহীন বিরাণ ভূমিতে ভূত-প্রেত আর মৃত আত্মা ছাড়া এখানে আর কে আসতে পারে।

আবী রায়হান পেছন ফিরে তাকালো না। দ্রুত পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেলো। রাস্তার বাম দিকে মোড় নিলো। বাম দিকে সে মোড় নিয়ে এত ভেতরে চলে গেলো যে, বাইরের আওয়াজ এখন আর ভেতর আসছে না। এতক্ষণে তার অস্থিরতা কিছুটা কমলো।

পোড়া বাড়ি থেকে আচমকা একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। স্পষ্ট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। নাকি কোন সুর নেই এই আওয়াজে। বাচ্চা এক নাগাড়ে কেঁদে যাচ্ছে। আবী রায়হান পেছনে যে ফিরে যাবে সে সাহসও পাচ্ছে না। কারণ, পেছনে আবার কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আচমকা থেমে গেলো। কোন নারীর চাপা কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেলো। কোন ধরনের চেষ্টা ছাড়াই তার ভেতর একটা পরিবর্তন এসে গেলো। মৃত্যু অবধারিত সে এটা জেনে গেছে। তাই তার ভয়-ডর সব চলে গেছে। সে এখন নিঃশংক

তবে তার হাত দুটি খালি। লুটেরা বিদ্রোহীরা তার ও তার সঙ্গীদের সব অস্ত্র শস্ত্র এমনকি ছোট ছোট খঞ্জর আর চাকু গুলিও নিয়ে নিয়েছে। সে নিজেকে

বললো, এই ভূত-প্রেত বা অশরিবী যেই আসুক আমার কিছুই করতে পারবে না। নিজেকে আবার বললো,

'এই বেটা! আমি কোন চোর ডাকাত নই। আল্লাহর সিপাহী। আল্লাহর নামে লড়াই করি। কাফেরদের কয়েদ থেকে পালিয়ে এসেছি। এখন ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবো। ওদের সামনে আত্মসর্ম্পণ করবো না। প্রাণ গেলেও না।'

প্রেতাত্মাকেও সে আল্লাহর কোন সৃষ্টি বলে জানে। তাই তার আশা আল্লাহ তাআলা তার এক নগণ্য সিপাহীকে ওদরে হাত থেকে বাঁচাবেন।

বাচ্চার কান্নার আওয়াজ সে আরেকবার শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষালী কণ্ঠও শোনা গেলো। পরিস্কার আরবী ভাষায় কথা বলছে লোকটি।

'ওকে দুধপান করাও, না হয় গলা টিপে দাও।'

তারপর এক নারীর কণ্ঠ শোনা গেলো। এও আরবী ভাষায় কথা বলছে।

'আহা! আস্তে কথা বলো। ব াইরে যেন আওয়াজ না যায়।'

আবী রায়হান একে জীবিত কোন মানুষের কণ্ঠ বলে মনে করছে না।

❋❋❋❋❋

তবুও আবী রায়হান পা টিপে টিপে সামনে এগিয়ে গেলো। আলোর হালকা রেখা যেন ওকে ধোকা দিলো। নাকি এখানে কোথাও প্রদীপ জ্বলছে।

আবী রায়হান ধীর কদমে সামনে এগিয়ে গেলো। সে এখন ভয়ংকর ও রহস্যময় কোন প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

আবী রায়হান একটু সামনে এগোলো। তখনই তার পেছন থেকে আওয়াজ ভেসে এলো,

'এখানেই দাঁড়াও। এক পাও এগোবে না। কে তুমি?'

সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার বা খঞ্জরের ফলা তার পিঠে এসে লাগলো। আবী রায়হান জায়গা থেকে নড়লো না। স্থির হয়ে রইলো।

'কে তুমি?' আবী রায়হান আরবীতে প্রশ্নের জবাবে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে প্রাণে মারার আগে আমার কথা শুনে নাও। আমি মারীদার মুসলিম ফৌজের একজন কমান্ডার। আমাদের সবাইকে নিরস্ত্র করে কয়েদ করা হয়েছিলো। আমি পালিয়ে এসেছি। তারপর থেকে কেল্লা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

এসময় তার সামনে একটা প্রদীপ ধরা হাত ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। যে প্রদীপ ধরে রেখেছে তার অন্য হাতে তলোয়ার। এ লোকটিও জিজ্ঞেস করলো,

'কে এসেছে এখানে?'

'আমার নাম আবী রায়হান। আমি মারীদার ফৌজের কমান্ডার।'

'তোমরা কি মৃত আত্মা না জীবিত মানুষ?' আবী রায়হান সংশয়ের সুরে জিজ্ঞেস করলো, ' তোমরা যাই হওনা কেন আমাকে সব খুলে বলো। তোমরা যদি প্রেতাত্মাও হও তবুও তোমরা আরবী। আরবদের মৃত আত্মা মন্দ হতে পারে না। তোমরা অবশ্যই কোন ভালো মানুষের আত্মা।'

'তাই তোমরা আমাকে সাহায্য করো। আমাকে কেল্লা থেকে বের হতে সাহায্য করো। আমি আমার ফৌজকে নিয়ে কেল্লায় ঢুকবো এবং ঐ লুটেরাদের কাছ থেকে মারীদা আবার ফিরিয়ে নেবো।'

'সামনে চলো।'

❃❃❃❃❃

কামরাটি একটি গুহার মতো। ভেতরে দুটি প্রদীপ জ্বলছে। এখানে বার তেরজন যুবতী মেয়ে এবং তিন চারজন মহিলা বসে আছে। এরাও প্রায় যুবতী। এক মহিলা এক বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে। পুরুষ দু'জনই মাত্র এখানে। যারা আবী রায়হানকে এখানে নিয়ে এসেছে। এ ছাড়া পুরুষ বলতে একজন বৃদ্ধ রয়েছে।

'ওদেরকে দেখে নাও।' একজন আবী রায়হানকে বললো, 'এরা আমাদের মুসলমানদের মেয়ে। মারীদার আধিবাসী আরবদের কন্যা ওরা। ওদের কারো বাবা, মা, কারো ভাই, কারো মা-চাচা কারো বোন শহীদ হয়েছে লুটেরাদের হাতে। আমাদের কিছু মেয়ে তো লুটেরাদের হাতে বন্দি। এদেরকে বড় কষ্টে উদ্ধার করে এনে এখানে লুকিয়েছি।

'কার পাপের শাস্তি আমরা ভোগ করছি?' বৃদ্ধ আরব বললেন, 'এখানে বেঈমান নও মুসলিম আর খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার মারীদা দখলের পায়তারা করছেন। অথচা কর্ডোভার কোন খবর নেই। ওরা এখানে একটি ফৌজও বাড়ায়নি। আর আমীরে মারীদা কোন মরণ ঘুম ঘুমিয়েছিলেন কে জানে! এত বড় ঝড় যে তার চারপাশে বয়ে যাচ্ছে সেদিকেও তিনি চোখ রাখতে পারলেন না।'

'এসব কথা বলার সময় এখন নয়।' আবী রায়হান বললো, 'বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে তোমরা সম্ভবত: খুব একটা জানো না।'

'না, এক লোক বললো, 'বাইরের অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তোমরা হয়তো জানো। কতদিন হয়ে গেলো। আমরা এভাবে পোকা-মাকড়ের

মতো এখানে বসবাস করছি। এই মেয়েগুলো তো আমাদের জন্য অনেক বড় পরীক্ষা। ওদের ইজ্জ্যত আবরু রক্ষা করে আমরা এখান থেকে বেরোতে চাই।'

'আমি এ শহর থেকে একাই বেরোতে চেষ্টা করছিলাম।' আবী রায়হান বললো, 'কিন্তু এই মেয়েগুলো এখন আমার জন্যও অনেক বড় ব্যাপার। ওদেরকে না নিয়ে আমি এখান থেকে যাবো না। আমি সর্বাবস্থায় তোমাদের সঙ্গ দেবো।'

'আর এই পরিত্যক্ত দালান-কোঠার বাইরের খবর হলো, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার মারীদার বাদশাহ বনে গেছেন। খ্রিষ্টানরা তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। খ্রিষ্টানদের বড় দুই নেতা ইউগেলিস ও ইলওয়ারই তার সবেচেয় বড় শক্তি। আজকের সর্বশেষ খবর হলো, কর্ডোভার ফৌজ মারীদার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর তারা মারীদা অবরোধ করবে।'

'শহরের ছোট ছোট শিশুরাও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। অবস্থা এমন থাকলে সম্ভবত: অবরোধও সফল হবে না। এক বিদ্রোহী কমান্ডার এসে আমাদেরকে বললো, ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কর্ডোভার ফৌজকে পরাজিত করতে পারলে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর যারা হাত না মেলাবে তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে।'......

'এই প্রস্তাবে মাত্র তিনজন রাজি হলো। অন্যরা অস্বীকার করলো। আর চতুর্থ বক্তি আমি। আমি এ উদ্দেশ্যে ওদের সঙ্গ দিয়েছি যে, আমি পালানোর কোন একটা উপায় বের করে নেবো। তা আমি বের করে পালাতেও পেরেছি। তারপর এখানে লুকাতে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা। তোমাদেরকে আমি মৃত আত্মা মনে করছিলাম।'

'এখন তো আমরা প্রেতাত্মা হওয়ার মতো অবস্থাতেই পৌঁছে গেছি।' বৃদ্ধ বললেন, 'বাদশাহদের পাপের শাস্তি আমরা এখন ভোগ করছি।'

'মুহতারাম! বৃদ্ধের কথার জবাবে বললো আবী রায়হান, 'এটা আপনাদের নিজেদের কৃত কর্মের শাস্তি। এদেশে যত আরব মুসলমান আছে তারা নিজেদেরকে এখানকার খ্রিষ্টানদের বাদশাহ মনে করে আসছে। খ্রিষ্টানদের সাথে আপনাদের আচার-ব্যবহার এতই অবহেলার যে, ওদেরকে আপনারা কেবল ঘৃণা আর লাঞ্চনাই দিয়ে এসেছেন।'....

'আপনারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াকেই ইসলামের চূড়ান্ত মনে করেন আর বলেন, আপনারা আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা বনে গেছেন। যারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসে তাদেরই আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। এটাই ইসলামের আসল বৈশিষ্ট্য। আপনারা ইসলামের এই অমোঘ বৈশিষ্ট্যকে আস্তকুঁড়ে ছুড়ে মেরেছেন। নও মুসলিমদের সঙ্গে আরবের মুসলমানদের ব্যবহার কখনো ইসলাম সম্মত ছিলো না।'

'আরবের মুসলমানদের মধ্যে এই বোধ কখনো জন্মালো না যে, জনগণের আবেগ চেতনা নিয়ে যখন শাসক শ্রেণীর লোকেরা খেলায় মেতে উঠে তখন একদিন না একদিন জনগণ আগুনের অঙ্গার হয়ে জ্বলে উঠে। সেই আগুনেই পড়েছেন আপনারা। আপনাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা জাহান্নামেই আপনারা জ্বলছেন।'

'আল্লাহর দরবারে দুআ করুন। আমাদের ফৌজ যেন এসে মারীদা অবরোধ করে নেয়। তবে আমার মনে হয় না আমাদের ফৌজ এত তাড়াতাড়ি শহরে ঢুকতে পারবে। কারণ, শহরের সবাই ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।'

'তবে ভেতর থেকে দরজা বা শহরের ফটক খুলে দেয়ার মতো সুযোগ পাওয়া গেলে অন্যরকম চিত্র দাঁড়াতে পারে। আমার তো আশংকা হচ্ছে, বিদ্রোহীরা আমাদের বন্দি সিপাহীদেরকেও কতল করে দিতে পারে।'

'যে কোন কুরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।' দুই জনের একজন আবী রায়হানকে বললো, 'ভেতর থেকে ফটক খোলার কিংবা তোমার সিপাহীদেরকে কোন ধরণের সাহায্য করার পথ বের করতে পারবে না তুমি? তুমি তো অভিজ্ঞ সৈনিক। কমান্ডারও। অনেক কিছুই তো জানো তুমি।'

'আমি শুধু সাধারণ সৈনিকের ট্রেনিং নিইনি, গেরিলা সৈনিকও আমি।' আবী রায়হান বললো। 'কিন্তু আমাদেরকে এই মেয়েদেরও হেফাজতের চিন্তা করতে হবে। এরা না হলে অবশ্য এখনই কাজে নেমে পড়া যেতো।'

'আমরা মেয়ে বলে তো আমাদের শরীর মোমের তৈরি নয়; এক ঘোড়ষী মেয়ে বললো, 'তোমরা আমাদেরকে সিপাহীদের মতো লড়াতে চাইলে আমরা তোমাদেরকে হতাশ করবো না।'

'আমরা পালিয়ে এখানে এজন্য লুকিয়ে বসে আছি যে, দুশমনের সংখ্যা পঙ্গপালের মতো।' এধরনেরই আরেকটি মেয়ে বললো, 'লড়াই যদি পৃথক পৃথক হয় তাহলে কাবার রবের শপথ! আমরা পালানোর কথা মোটেও চিন্তা করবো না। আমরা বীর লড়াকু মুসলমানদের মেয়ে। কমান্ডার! তুমি কোন পরিকল্পনা ভেবে দেখো। আমাদের সৈনিক মনে করো। আমাদের ইযযত আবরুর কথা চিন্তা করো না।'

'এখন তোমরা এখানেই থাকো।' আবী রায়হান বললো, 'খবর সঠিক হলে আজ রাতেই মারীদা অবরোধ হওয়ার কথা। আমাকে ভাবতে দাও। তোমাদের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র কী আছে?'

‘এখন আমরা এখানেই থাকবো। আর আমাদের কাছে আছে চারটি বর্শা, নয়টি তলোয়ার, কয়েকটি খঞ্জর, তিনটি ধনুক এবং অনেকগুলো তীর’ আছে। কেউ একজন জবাবে বললো’

‘এতো বলতে গেলে মাশাআল্লাহ্ অনেক।’ রায়হান খুশি হয়ে বললো। ‘খ্রিষ্টানরা নিজেদের মেয়েদেরকে মাটির নিচ দিয়ে, রাতে দুশমনের শয়নগৃহে এবং তাদের রূপ যৌবনকে চরম অস্ত্র বানিয়ে ব্যবহার করে। কিন্তু আমি তা করবো না। আমরা মুসলমান। আমি তোমাদেরকে সিপাহী বানিয়েই লড়াই করবো। এটাই ইসলামের শান-অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য।’

‘খ্রিষ্টানদের মেয়েরা যেমন করে মুসলিম মেয়েরা দুশমনের সামনে তেমন করে নেচে গেয়ে, অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি করে দুশমনকে জাদুমুগ্ধ করে না। তারা তলোয়ারের ঝলক আর নির্ভীকতা দিয়ে দুশমনকে কুপোকাত করে দেয়। তৈরি থেকো আমার প্রিয় বোনেরা! আর কয়েকদিন অভুক্ত থাকার জন্যও প্রস্তুতি নিয়ে রাখো।’

❋❋❋❋❋

সে রাতেই মারীদা অবরোধ হয়ে গেলো। মারীদার লোকেরা এরাতে মুহূর্তের জন্যও দু’চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

সূর্যাস্তের পর থেকেই খবর আসতে থাকে কর্ডোবার ফৌজ শহরের কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন থেকেই লোকেরা যার যার ঘরে খাদ্য সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমা করতে থাকে। যাতে শহরে খাদ্য সংকট দেখা না দেয়।

শহরের চারটি প্রধান ফটকই ভেতর থেকে সিলগালা করে বন্ধ করে দেয়া হলো। অস্ত্র ধরতে জানে এমন প্রত্যেকেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। প্রত্যেকেই তীরে পূর্ণ তিন চারটি করে তুনীর নিজের সঙ্গে রাখলো।

শহরের প্রাচীরের ওপর বড় বড় পাথরের অনেকগুলো স্তুপ রাখা হলো। অনেক জ্বালানি কাষ্ঠও স্তুপিকৃত করে রাখা হলো।

কর্ডোভার সিপাহীরা শহর প্রাচীরের কাছে ঘেষলে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত লাকড়িও তাদের ওপর ছোড়া হবে। যদি সিড়ি বা ঝুলন্ত রশি লাগিয়ে প্রাচীর বেয়ে ওপরের উঠার চেষ্টা করা হয় তাহলে জ্বলন্ত আঙ্গারসহ ফুটন্তপানি ছিটানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিটি ফটকের চারপাশে অসংখ্য লোক তীর ও বর্শা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলো ফটক ভেঙ্গে হামলা চালালে হামলাকারীরা যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে। শহরের প্রচীর থেকে অবরোধকারীদেরকে দূরে হটিয়ে রাখার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে।

মারীদার সামান্য দূরে থাকতেই সালার আবদুর রহউফের ইউনিটের দেখা পেয়ে যান সিপাহসারার উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ। সালার আব্দুর রউফের সেনা ইউনিটগুলোর নেতৃত্বও তিনি নিয়ে নিলেন।

উবাইদুল্লাহ সেনা ইউনিটগুলোকে পূণর্বিন্যাস করে প্রয়োজনীয় কিছু সৈন্যকে সাধারণ কৃষকের বেশে আগেই মারীদার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মারীদার বিদ্রোহী বাহিনী যদি শহরের বাইরে এসে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয় তাহলে ওরা এসে সিপাহসালারকে সেটা জানাবে।

কিন্তু উবাইদুল্লাহর কাছে খবর আসতে থাকে শহরের বাইরে দুশমনের ফৌজের নাম নিশানাও নেই।

'বন্ধুরা আমার।' উবাইদুল্লাহ তার সালারদের বললেন, 'মারীদার লুটেরা বিদ্রোহীদের মধ্যে যদি রণ কৌশলের সামান্যতম ধারণা থাকতো তাহলে ওরা শহর থেকে বেশ দূরে থাকতেই আমাদেরকে বাঁধা দিতো এবং এ লড়াই দীর্ঘ করতে বাধ্য করতো। এমন তো নয় যে, আমাদের ফৌজ আসার খবর ওরা জানে না। ওরা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতই মজবুত করে নিয়েছে যে, অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করতেই ওরা বেশি নিরাপদ মনে করছে।'

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ তার ফৌজকে আরো বিস্তীর্ণ করে দিলেন। সম্মুখভাগের ইউনিটগুলোকে দারুণ শক্তিশালী রাখলেন। যাতে কোথাও গুপ্তঘাতক থাকলে সমুচিত জবাব দিতে পারে। কিন্তু যতই তারা এগিয়ে যেতে লাগলো গুপ্তঘাতক বা অযাচিত লড়ায়ের সম্ভাবনা বা আশংকা কমে আসতে লাগলো।

যতই রাত বাড়তে লাগলো শীতও তত তীব্র হতে লাগলো। এর মধ্যেই সেনারা তাদের চলার গতি অব্যাহত রাখলো। অবশেষে মারীদার প্রাচীরের ওপর জ্বলন্ত মশালের আলো ছায়া দেখা যেতে লাগলো।

উবাইদুল্লাহ সালার আব্দুর রউফকে হুকুম দিলেন, তিনি তার ইউনিটকে আরো দ্রুত যেন চলার হুকুম দেন এবং মারীদা শহর অবরোধের আওতায় নিয়ে নেন। আর ওযীর হাজিব আব্দুল করীমকে বললেন, তিনি যেন তার ইউনিটগুলোকে অবরোধকারীদের পেছনে নিয়ে পজিশনে দাঁড় করিয়ে দেন।

রাতের প্রথম প্রহরে মারীদার প্রাচীরের ওপর থেকে শোর গোল উঠলো,

'দুশমন এসে গেছে, শহর অবরোধ হয়ে গেছে, আমরা এখন এ শহরে অবরুদ্ধ, খবরদার! হুশিয়ার!!

তখনই প্রাচীরের ওপর থেকে কর্ডোভার ফৌজের ওপর তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু ফৌজ তীরের নাগালের অনেক বাইরে। অসংখ্য তীর বৃথাই ছোড়া হতে লাগলো। সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ উচুঁ আওয়াজে ঘোষণা করলেন,

'আমরা মারীদার বিদ্রোহীদের ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ দিচ্ছি। শহরের দরজা খুলে দাও। আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। কাউকে গ্রেফতার করা হবে না।'

'সাহস থাকলে সাহস দেখাও মুসলমানের বাচ্চারা।' প্রাচীরের ওপর থেকে জবাব এলো, 'এগিয়ে এসে পারলে দরজা খুলে নাও।'

কর্ডোভার এক কমান্ডার প্রধান ফটকের একেবারে কাছে চলে গেলো। কমান্ডার মারীদার বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে বললো,

'আমীরে উন্দলুস এই অবরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যদি অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পন না করো তাহলে'....

কমান্ডার এতটুকু বলতেই চাঁর-পাঁচটি তীর দেহে বিদ্ধ হয়ে গেলো।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ যখন দেখলেন বিদ্রোহীরা কোনোভাবেই আত্মসমর্পন করবে না। তিনি হুকুম দিলেন, ফটকগুলোর ওপর হামলা চালাও। কিন্তু বিদ্রোহীরা প্রাচীরের ওপর থেকে জ্বলন্ত কাঠ আর আগুনের অঙ্গার ফেলতে শুরু করলো। প্রথম হামলায় যারা গেলো তারা আগুনে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এলো।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ শহরের আভ্যন্তরীণ অবস্থান সম্পর্কে জানেন। তিনি দুটি বড় মিনজানীক প্রস্তুত করলেন। তারপর শহরের ভেতর পাথর নিক্ষেপের হুকুম দিলেন।

❋❋❋❋❋

প্রাচীরের ওপর এত বেশি শোরগোল যে, সে আওয়াজ শহরের প্রাচীন ধ্বংস স্তুপে লুকানো লোকেরাও শুনতে পাচ্ছে।

আবী রায়হান একটি বর্শা ও একটি তলোয়ার নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে দেখতে চাচ্ছে ফটকগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি আছে কিনা। এখন আর তার ধরা পড়ার আশংকা নেই। চার দিকেই সবাই ব্যতিব্যস্ত।

লোকজন ছুটোছুটি করছে হন্যে হয়ে। কে কার পাশ দিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকানোর ফুরসত নেই কারো। কেউ কাউকে কখন জিজ্ঞেস করবে তুমি কে এবং কোথায় যাচ্ছো।

আবী রায়হান চোখমুখ চাদরে ঢেকে এই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো। প্রত্যেকটি ফটকের কাছে গিয়ে দেখলো। শত শত প্রহরী ফটকগুলোর চারপাশে পজিশন নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। ভেতর থেকে কোন ফটকই খোলা সম্ভব নয় এবং কোনটার ফাঁক গলেও বাইরে যাওয়া অসম্ভব।

আবী রায়হান দেখলো, একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী শ্লোগান দিতে দিতে প্রাচীরের দিকে যাচ্ছে। সেও কর্ডোভার ফৌজের বিরুদ্ধে ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে এবং মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করতে করতে প্রাচীরের দিকে চলে গেলো।

সেখানে শহরবাসীদের ভিড়ের চাপ এত বেশি যে, দাঁড়ানোর মতো জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়লো। এখানে ভিড় করা সশস্ত্র লোকদের অধিকাংশই বাইরে কর্ডোভার ফৌজি শিবিরের দিকে তীর ছুড়ছে।

এ সময় অবরোধকারীদের দিক থেকে মিনজানীক দিয়ে ছোড়া একটি ভাড়ী পাথর প্রাচীরের ওপরে এসে পড়লো। পুরো প্রাচীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। দশ বারজন প্রাচীর থেকে তখনই খসে পড়লো নিচের দিকে। দু'তিনজন প্রাচীরের ওপরেই পাথরের আঘাতে চিরা-প্যাপ্টা হয়ে মারা পড়লো।

আবী রায়হান খুশি হলেও নিজে কিছুই করতে পারেনি বলে হতাশ হয়ে ওখান থেকে চলে এলো।

❋❋❋❋❋

আবী রায়হান আবার প্রাচীন ধ্বংস গাঁথায় ফিরে এলো। ওখানে যারা লুকিয়ে আছে ওদেরকে জানালো, রাতের অন্ধকারে বাইরের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

'তবে যে করেই হোক আমার ফৌজের জন্য আমি যে কোন একটি ফটক খোলার চেষ্টা চালাবোই। এতে জানের বাজি লাগাতে হলেও লাগাবো।' আবী রায়হান বললো।

'তোমার সঙ্গে আমরাও জানের বাজি লাগাতে চাই।' ওদের একজন বললো।

'হ্যাঁ, আমরাও পিছিয়ে থাকবো না।' মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো।

'বন্ধুরা! সুযোগ এলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের বীরত্ব প্রতিভা দেখাতে পারবে। কিন্তু এখনই এর প্রয়োজন পড়বে না।' আবী রায়হান বললো।

সকাল হতেই আবী রায়হান বেরিয়ে পড়লো। ওর চেহারা কাপড়ে ঢেকে নিলো। প্রাচীরের ওপর গিয়ে চড়লো। নিজের ফৌজকে এবার ভালো করে দেখতে পেলো। শহরবাসীদের শস্যক্ষেত ও ফল বাগান বেশির ভাগই শহরের বাইরে। এগুলো এখন কর্ডোভার ফৌজের দখলে।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ হুকুম দিলেন। ক্ষেতের সব ফসলগুলো কেটে ফেলো। বাগানগুলোও পরিস্কার করে দাও। হাজারো তলোয়ার পাকা আধাপাকা ফসলগুলোর ওপর উঠানামা করতে লাগলো। এগুলো ঘোড়ার দানাপানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একত্রিত করা হতে লাগলো। বিভিন্ন ফলের বৃক্ষও কুড়াল দিয়ে কাটা হতে লাগলো।

আবী রায়হান লক্ষ্য করলো, কর্ডোভার ফৌজের সিপাহীরা প্রাচীরে রশিযুক্ত আংটা প্রাচীর গাত্রে গাঁথার জন্য এগিয়ে আসছে। তাদের পেছনে তীরন্দাযরা পজিশন নিচ্ছে। যাতে প্রাচীরের ওপরের দুশমনরা এদের তীরান্দাযীর কারণে মথা তুলতে না পারে। এবং প্রাচীর সুড়ঙ্গকারীরা অক্ষত অবস্থায় প্রাচীর পর্যন্ত পৌছাতে পারে।

কিন্তু বিদোহীরা দারুণ নির্ভীকতার সঙ্গে এর মোকাবেলা করছে। কর্ডোভার ফৌজ চারো ফটকের ওপর হামলা করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি ফটকের ওপরই বুরুজ রয়েছে। যেখন থেকে নিক্ষেপিত তীর আর বর্শা হামলাকারীদেরকে রক্তাক্ত করে পিছু হটিয়ে দিচ্ছে।

আবী রায়হান প্রাচীর থেকে নেমে এলো। তার মাথায় নতুন একটি চিন্তা এলো। এখন সেটা বাস্তবায়ন করতে হলে কাগজ কলম দরকার। সে একটি বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় টোকা দিলো। এক মহিলা দরজা খুলে দিলো। সশস্ত্র লোক দেখে মহিলা বুঝলো, এ লোক সিপাহী ছাড়া অন্য কেউ নয়।

'এই যে আপা! তিন চারটি কাগজ, কলম, আর কালি দরকার। এক কমান্ডার পাঠিয়েছেন। তাড়াতাড়ি করুন।' আবী রায়হান জরুরি গলায় বললো।

ওখানে তো লোকজন নিজেদের রক্ত পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। মহিলা দ্রত কাগজ, কলম, কালি নিয়ে এলো।

'আর কিছু কি লাগবে ভাই?' মহিলা জিজ্ঞেস করলো ব্যাকুল হয়ে।

'না, ধন্যবাদ।'

আবী রায়হান সেগুলো নিয়ে বহুপথ ঘুরে প্রাচীন ধ্বংস গাঁথায় চলে গেলো। ওখানে যারা আছে এর মধ্যে বেশ কয়েকজন মেয়ে শিক্ষিত এবং হাতের লেখাও বেশ পরিস্কার ও গুছানো। তাদেরকে দিয়ে তিনটি কাগজের ওপর একই কথা লেখালো। লেখা ছিলো এরকম,

'দক্ষিণমুখী ফটকের কাছ থেকে সব ফৌজ সরিয়ে নিন। অধিক সৈন্য প্রধান ফটকের আশে পাশে মোতায়েন করুন। এতে বিদ্রোহীরা দক্ষিণমুখী ফটক থেকে তাদের সব মনোযোগ হটিয়ে প্রধান ফটকের ওপর নিবদ্ধ করবে। রাতে আমরা দক্ষিণ প্রান্তরের ফটক খোলার চেষ্টা করবো।'

লেখার নিচে রায়হান নিজের নাম লেখলো এবং পদবীও উল্লেখ করলো।

লিখিত কাগজ তিনটি ভাঁজ করে প্রত্যেকটি তীরের মধ্যে সুতা দিয়ে বেঁধে দেয়া হলো। প্রত্যেকটি তীরের সঙ্গে একটা করে কাপড় বেঁধে দেয়া হলো। যার অর্থ হলো, এই তীরের সঙ্গে বিশেষ পয়গাম রয়েছে।

আবী রায়হান তীর তিনটি তুনীরে ভরে ধনুক নিয়ে পোড়া এলাকা থেকে বেরিয়ে এলো। সেখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এলো যে, সতর্ক চোখও তাকে দেখতে পেলো না।

❋❋❋❋❋

রায়হান প্রাচীরের ওপর উঠে গেলো। সে দেখলো, অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তারা মূলত শহরবাসী। নিয়মিত ফৌজের সিপাহী নয়। তাদেরকে সরাসরি কমান্ড করার মতো কেউ নেই। আর না ওদের আছে কারো কমান্ড মেনে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা। সেও ওদের দলের অংশ হয়ে গেলো।

রায়হান প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে গেলো এবং লিখিত কাগজ বাঁধা একটা তীর বের করলো। ওর ধনুকটি বেশ মজবুত। ধনুকটি এমনভাবে টেনে ধরলো, যাতে তীর অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে যায়। ধনুক যতটুকু টানার টেনে তীর ছুড়ে দিলো।

এই তীর সেসব তীরের মিছিলে যোগ দিলো যেগুলো বিদ্রোহীরা ওপর থেকে ছুড়ে মারছে। আবু রায়হান তার ছোড়া তীরটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তীরটি কার্ডোভার ফৌজি ছাউনির প্রায় মাঝখানে গিয়ে পড়লো।

রায়হান ওখান থেকে সরে প্রাচীরের ওপর দিয় হেঁটে হেঁটে একটু দূরে গিয়ে দ্বিতীয় তীরটি ছুড়লো। এভাবে আরেকটু দূরে গিয়ে লিখিত পয়গাম বাঁধা তৃতীয় তীরটি ছুড়লো।

কর্ডোভার এক সিপাহীর সামনে একটি তীর গিয় পড়লো। এর মধ্যে কাগজ বাঁধা দেখে সিপাহীর কৌতুহল হলো। সে এটি তুলে তার ইউনিট কমান্ডারকে দিলো। কমান্ডার সুতোয় বাঁধা কাগজটি সুতোমুক্ত করে ভাজ খুলে পয়গামটি পড়লো।

পয়গামটি পড়ে সালার আব্দুর রউফের কাছে নিয়ে গেলো। আব্দুর রউফ সেটি সিপাহসালার উবাইদুল্লাহর কাছে নিয়ে গেলেন।

'এটা ধোকাও হতে পারে।' উবাইদুল্লাহ এটি দেখে বললেন।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।' আব্দুর রউফ বললেন, 'একটি ধোকা তো এই হতে পারে যে, আমরা দক্ষিণ দিকের ফটকের সামনে থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলে বিদ্রোহীরা সেই দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আমাদের ওপর হামলা করতে পারে। আর এমন ঘটলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, এ থেকেও আমাদের যথেষ্ট ফায়দা উঠাতে পারি। বিদ্রোহীরা বাইরে এলেও ওদেরকে আমরা ভেতরে আর যেতে দেবো না। সেই ফটক দিয়ে আমরাই ভেতরে ঢুকে পড়বো।'

'আরেকটি ধোকা এই হতে পারে যে, ফটক খোলা দেখে আমরা যখন ভেতরে ঢুকবো তখন হতে পারে, চারপাশ থেকে গুপ্ত ঘাতকরা আচমকা আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে।' উবাইদুল্লাহ বললেন।

'আমরা ভেতরে ঢোকার পর কীসের সম্মুখীন হতে হবে সেটা ভাবনার বিষয় নয়।' আব্দুর রউফ বললেন, ' যে করেই হোক আমাদের যে কোন একটি ফটক খোলা চাই। তখন আমার পূর্ণ এক ইউনিট সেনা বাঁধ ভাঙ্গা জ্বলোচ্ছাসের মতো ভেতরে ঢুকে পড়বে। তখন গুপ্ত ঘাতকরা এমনিতেই ভেসে যাবে। ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।'

সিদ্ধান্ত হলো ঝুঁকিই নেয়া হবে।

সূর্যাস্ত হচ্ছে। এ সময় রায়হান প্রাচীরের ওপর থেকে দেখলো, দক্ষিণমুখী ফটকের সামনে থেকে কর্ডোভার মোতয়েনকৃত ফৌজ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। যেন অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে।

ওদিকে প্রধান ফটক ও পশ্চিম প্রান্তের ফটকের ওপর অবিরাম হামলা চালানো হচ্ছে। প্রাচীরের ওপর তীরান্দাযদের বিশাল ভিড় লেগে আছে। এরাও ওই ফটকগুলোর আশে পাশে গিয়ে ভিড় করতে লাগলো।

এখানে অবস্থা বা পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটলে প্রাচীরের লড়াকুরা উঁচু আওয়াজে সেটার ঘোষণা করে দেয়। এবার তাদের একটি ঘোষণা শোনা গেলো,

'দুশমন দক্ষিণ মুখী ফটক থেকে সরে গেছে। অন্যান্য ফটকগুলোর প্রতি সবাই মনোযোগ দাও। হুশিয়ার! সাবধান!

সূর্যাস্তের পর রায়হান প্রাচীন ধ্বংস গাঁথায় চলে গেলো।

'আমার পয়গাম পৌছে গেছে। রায়হান সবাইকে জানালো, 'দক্ষিণের ফটক থেকে আমাদের ফৌজ সরে গেছে। তবে আমদের সালারের নজর এই ফটকের ওপর নিবদ্ধ থাকাবে। তাই আজ রাতেই ফটক খুলতে হবে। কিন্তু আমি যে

পরিকল্পনা করেছি এর জন্য শুধু আমাদের এই তিনজন লোকই যথেষ্ট নয়। কম পক্ষে দশজন দরকার।'

'এই প্রয়োজন আমরা পূরণ করবো' এক মেয়ে বললো। 'কমান্ডার! তুমি কি করতে চাও সেটা শুধু বলো।'

'হ্যাঁ, ওদেরকে নিয়ে যাও। এ ছাড়া উপায়ও নেই অবশ্য।' বৃদ্ধ লোকটি বললেন।

'তবে পুরষদের পোষাক পরে যেতে হবে ওদের। কারো সামান্যতম সন্দেহ হলেও এর যে কী পরিণতি হবে তা তো বুঝতেই পারছো তোমরা।' রায়হান বললো।

'এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন যদি আমরা হই তাহলে আমরাও কাউকে কোনো সুযোগ দেবো না। প্রাণ বাজি রেখে লড়বো। তারপর প্রাণ দেবো'। এক মেয়ে বললো।

আবী রায়হান তার পরিকল্পনার কথা ওদেরকে জানালো।

আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান এখনো মারীদা থেকে বেশ দূরে। তাঁর সৈন্যদেরকে তিনি দূর দূরন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। দ্রুতগামী পত্রদূতের মাধ্যমে সবার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। এই বাহিনীর গেরিলা ইউনিটের সৈন্যরা প্রায় সারাক্ষণ ঘোড়ার ওপর সাওয়ার থেকে টহল দিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে সাধারণ কৃষকের পোষাকে কিছু অভিজ্ঞ সৈন্য দুশমনের চৌকি পর্যন্ত মোতায়েন রয়েছে।

আব্দুর রহমান যদিও এক জায়গায় তার অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছেন। কিন্তু তার অধিক সময়ই ঘোড়ার পিঠের ওপর কাটছে। প্রতিটি ইউনিটের কমান্ডারদের কাছে গিয়ে রিপোর্ট নিচ্ছেন। কিছু বলার থাকলে বলছেন। এটা ওটার নির্দেশ দিচ্ছেন। মুসাইবিনে মুসা ও ফারতুন এই দুই সালার সব সময় ছায়ার মতো তার সঙ্গে রয়েছেন।

অতন্দ্র-সজাগ এক সৈনিক বনে গেছেন এখন আব্দুর রহমান। যেন যুদ্ধের ময়দানেই তাঁর জন্ম এবং এই ময়দানেই তিনি প্রাণ নজরানা দিয়ে রেখেছেন। সঙ্গীতের মাদকীয় সূরে আর রূপ-যৌবনের অপার মোহে ডুবে থাকা আব্দুর রহমান এখানে এসে এমন সতর্ক আর স্বত:স্ফূর্ত যেন চিতা তার শিকারের পেছন ধাওয়া করে যাচ্ছে।

তার আত্মিক শক্তি আর দুঃসাহসিক চেতনা এখন সতত জাগ্রত। তিনি যেন তার অজান্তেই মানবীয় স্বভাবের এই প্রকৃতিকে উন্মোচন করছেন যে, মানুষ যখন

চাইবে, স্বংকল্প করবে তখন তার আত্মিক ও দৈহিক শক্তি জাগ্রত করে আকাশের বিদ্যুৎকেও হার মানাতে পারে।

'ঐ লুটেরা কাফেরের দল যদি এই চেষ্টায় থাকে যে, আমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে তাহলে তারা দারুণভাবে হতাশ হবে।' আবদুর রহমান একদিন রাতে তার দুই সালারকে বললেন, 'সালতানাতে ইসলামিয়া সংকুচিত হবে না; বরং সম্প্রসারিত হবে। ক্রমেই এর সমৃদ্ধিই ঘটবে। উন্দলুস শহীদদের আমানত। উন্দুলসের আবরু ইযযত ইসলামেরই সম্ভ্রম। নাপাক রক্ত থেকে এর মাটিকে আমরা পবিত্র রাখবো।'

তাঁর দুই সালার তার এই জযবাদীপ্ত অবস্থায় একথা বলতে ইতস্ত করলেন যে, আপনি যারিয়াব ও সুলতানার মায়াজাল থেকে বেরিয়ে আসুন। তাঁদের আশংকা, যারিয়াব ও সুলতানার কথা শুনে যদি তিনি বলে উঠেন, যারিয়াব ও সুলতানাকে এখানেই ডেকে নিয়ে এসো।

'ফ্রান্সের শাহেলুইকে আমাদের চিরতরে খতমকরে দিতে হবে।' আবদুর রহমান অনঢ় সংকল্পের গলায় বললেন, 'ফেতনা আর ষড়যন্ত্র যেখন থেকে মাথাচাড়া দেবে সেখানে আল্লাহর বজ্র হুংকার হয়ে ঝাপিয়ে পড়ো।'.....

'মারীদার বিদ্রোহীদেরকে যখন হাতে পাবো। কারো প্রতিই করুণা করবো না। ইসলামের শত্রু ও মুসলমানদের ধ্বংসকামীদেরকে যদি ক্ষমা করে দিই তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও এর সমুচিত শাস্তি দেবেন।'

'কিন্তু আল্লাহর পথে তার দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে আমি ফরজ বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহর দুশমন কাফেররা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পন করবে। জান ভিক্ষা চাইবে, বন্ধুত্বের জনস্য তোমাদের পায়ে মাথা ঠুকবে তবুও কখনো তাদেরকে বিশ্বাস করবে না।'

'কিন্তু আমীরে মুহতারাম!' সালার ফারতুন বললেন, 'কুরআনের হুকুম হলো, দুশমন সন্ধির জন্য হাত বাড়ালে তোমরা সন্ধি করে নাও।'

'এটাও কুরআনের হুকুম যে, ওদের ওপর কখনো বিশ্বাস রাখবে না।' আব্দুর রহমান বললেন, 'ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ দিয়েছে কুরআন। কারণ, ওরা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি না করে ক্ষান্ত হয় না। ওদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করলে ওরা যখন দেখবে নিজেদের স্বার্থ হাসিল হয়ে গেছে ওরা তখন তোমাদেরকে না জানিয়েই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলবে।'....

'তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো না এরা আমাদেরকে নিয়ে যেমন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। মারীদার বিদ্রোহ তখন হয়েছে যখন ফ্রান্সের দিকে অভিযান চালাতে

যাচ্ছিলাম। এরা ফ্রান্সকে আমাদের হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য মারীদার লোকজনকে ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহ করিয়েছি।'

'আপনি কি জানেন! মারীদার বিদ্রোহের কল-কাঠি কে নেড়েছে?' সালার মুসা ইবনে মুসা জিজ্ঞেস করলেন।

'মারীদার বিদ্রোহ তো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বারের হাত ধরে পুর্ণতা পেয়েছে।' আব্দুর রহমান বললেন, 'তবে ওর পেছনে ঘুঁটি নাড়ছে খ্রিষ্টান নেতারা।'

'এদের একজন হলো ইউগেলিস আরেকজন ইলওয়ার।' মুসা ইবনে মুসা বললেন।

'ওদের দু'জনকেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। মারীদা থেকে নতুন খবর আসছে না। তবে আমার বিশ্বাস উবাইদুল্লাহ ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই শহরে ঢুকে পড়বে।'

✻✻✻✻✻

সালারে আলা উবাইদুল্লাহ যত দ্রুত সম্ভব শহরে ঢোকার জন্য সব চেষ্টার অতীত করে যাচ্ছেন। সৈন্যরা যে কোন মূল্যে প্রাচীরে সুড়ঙ্গ করতে শহীদ আর যখমী হচ্ছে। কিন্তু শহর প্রাচীরের ওপর থেকে বৃষ্টির মতো তীর আসছে। বর্শা, ভারী পাথর, জ্বলন্ত অঙ্গার, জ্বলন্ত কাঠখন্ডও তাদের ওপর ছুড়ে মারা হচ্ছে। কখনো কখনো মনে হচ্ছে, পাথরের প্রাচীর আগুনের পাহাড় হয়ে গেছে।

কমান্ডার ও সিপাহীদের অদম্য জোশ-জযবা আর অবিরাম হামলার দৃশ্য দেখে উবাইদুল্লাহ আশা করছিলেন কয়েক দিনের মধ্যেই তারা শহরে ঢুকে পড়তে পারবেন। তিনি সালার ও কমাণ্ডারদেরকে বলতেন, আমার সিপাহীরা ফটক ভাঙ্গতে না পারলেও বিদ্রোহী শহরবাসীর মনোবল ভেঙ্গে দেবে ঠিকই।

কর্ডোভার মিনজানীকও দুশমনের তেমন ক্ষতি করতে পারছে না। কারণ, মারীদার তীরান্দাজরা এমন উপযুক্ত জায়গায় মিনজানীক স্থাপন করতে দিচ্ছে না, যেখান থেকে মিনজানীক দ্বারা নিক্ষেপিত পাথর শহরের ভেতর গিয়ে পড়তে পারে।

শহরের ভেতর তো রায়হান তার সতীর্থ ফৌজের জন্য রাস্তা পরিস্কার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরাও তার সঙ্গ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

তাদের তো পুরুষালী পোষাকে যাওয়া ভীষণ জরুরি। কিন্তু ওখানে রায়হান ও বৃদ্ধ লোকটি ছাড়া মাত্র দু'জন পুরুষ রয়েছে। তাদের পোষাক তো নিজেদের জন্যই দরকার। তলোয়ার, বর্শা ও খঞ্জর যথেষ্ট পরিমাণ না হলেও কাজ চলে যাওয়ার মতো আছে।

অগত্যা সবার কাছে যে পরিমাণ চাদর, অতিরিক্ত কাপড় ছিলো সেগুলো কাজে লাগিয়ে মেয়েদের মুখ, বুক, কাঁধ ইত্যাদি চাদরে ঢেকে নেয়া হলো। রাতের অন্ধকারও অবশ্য ওদের জন্য সবচেয়ে বড় পর্দা। অনেক বড় এক ঝুঁকিতে ওরা পা দিতে যাচ্ছে।

মাঝ রাতের কিছু আগে আবী রায়হান তাদের ভুতুড়ে আস্তানা থেকে বের হলো। তার সাথে রয়েছে দু'জন পুরুষ ও দশটি মেয়ে। ওদের জন্য এখন দরকার শহরের ভেতরে হৈ-হুলুস্থুল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া।

ঘটনাক্রমে শহরের লোকজনের মধ্যে হুলস্থূল বেঁধে গেছে। কারণ, কর্ডোভার ফৌজ মিনজানীক এখন এমন জায়গায় স্থাপন করতে পেরেছে যেখান থেকে নিক্ষেপিত পাথর প্রাচীর টপকে শহরের ভেতরে এসে পড়ছে।

কয়েকটি ভারি পাথর বাড়ি ঘরের ছাদে গিয়ে পড়লো। ভেতরের লোকজন 'বাবাগো-মাগো বাঁচাও বাচাঁও, বলে বেরিয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিলো। এদেরকে দেখে শহরের লোকদের মধ্যেও হুল্লোড় লেগে গেলো। বাড়ি-ঘর দালান কোঠা থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগলো। শহরময় হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেলো।

❋❋❋❋❋

রায়হানের রুখ দক্ষিণ ফটকের দিকে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গীদের এবং মেয়েদেরকে শেষবার বলে দিলো তাদের কী করতে হবে। কোথায় কোথায় সতর্ক থাকতে হবে।

'এখন প্রত্যেকে এতটুকু দূরত্বে থেকে সামনে বাড়বে যেন একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোন সম্পর্ক নেই। আর হাঁটতে হবে প্রায় ছোটার মতো করে। কারণ, সবাই কিন্তু ছুটোছুটি করছে। ধীরপদে চললে লোকে সন্দেহ করতে পারে।' আবু রায়হান তাদেরকে বলে দিলো।

দুক্ষিণমুখী ফটকের সামনে এসে গেলো ওরা। ওখানে চার পাঁচটি মশাল জ্বলছে। শহরে হুলুস্থুল আরো বেড়ে গেছে। ফটকের সামনে ও ডানে বামে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের ওপর বুরুজে তীরান্দাজরা রয়েছে। তবে এখন ওদের মধ্যে বেশ ঢিলেটালা ভাব। কারণ, এদিক থেকে কর্ডোভার ফৌজ সরে গেছে।

আবী রায়হান তার গেরিলা দলটিকে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখলো।

তারপর নিজে ফটকের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুট লাগালো। ওদের স্থানীয় ভাষা সে ভালোই জানে। তাদের ভাষায় বেশ ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বললো,

'এখানে এতগুলো মানুষ কি করছে? এই ফটকের সামনে তো দুশমনের কোন ফৌজ নেই। আর ওদিকে প্রধান ফটক ভেঙ্গে ফেলছে দুশমনরা। মুসলমানদের তো ভেতরে ঢুকতে আর দেরি নেই। আমাকে শুধু এতটুকু বলে তোমাদের দিকে দৌড়ানো হয়েছে যে, ওদের সবাইকে প্রধান ফটকের দিকে নিয়ে এসো। বলা হয়েছে, এখানে চার পাচজন থাকলেই চলবেক। বাকিরা সবাই ওদিকে চলে যাও... তাড়াতাড়ি এসো হতভাগারা! শহর তো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

ওরা নিজেরাই জরুরি ভিত্তিতে ফায়সালা করলো, কে কে ফটকের সামনে থাকবে। আর বাকিরা প্রধান ফটকের দিকে দৌড় লাগালো। দক্ষিণ ফটকে মাত্র চারজন লোক রইলো। বাকিরা এতক্ষণ বেশ দূরে চলে গেছে। আবু রায়হানও ওখান থেকে সরে এলো।

রায়হান ফিরলো তার নিজের লোকজন নিয়ে। এরা এই চারজনের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। মেয়েরা তাদের তলোয়ার আর বর্শার আঘাতে ওদেরকে শেষ করে দিলো।

তারপর ওরা সবাই মিলে ফটকের এক দিক খুলে ফেললো।

'আমি আমাদের ফৌজকে খবর দিতে যাচ্ছি। রায়হান বললো, সবাই তোমরা এই ফটকে থাকতো। কেউ এদিকে এসে ফটক বন্ধ করতে চাইলে যাতে তা না পারে।

ফটকের ওপরের বুরুজ থেকে তিন চারজন লোক নিচে নেমে এলো। সেখানে কয়েকটি মশাল জ্বলছে। ওরা দেখলো ফটক সামান্য খোলা। রায়হান তখনই বাইরে বের হচ্ছিলো। সেটাও ওরা দেখে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে দেখলো, ফটকের সামনে চারটি মানুষ তাজা রক্তে ডুবে আছে।

এক লোক রায়হানের দিকে বর্শা ছুড়ে মারলো। সেটা রায়হানের গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। মেয়েরা আর দেরি করলো না। মুহূর্তের মধ্যেই ওরা বুরুজ থেকে নেমে আসা লোকদেরকে খতম করে দিলো। ওদিকে আবু রায়হান শত চেষ্টা করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। পড়ে গেলো।

'তোমাদের একজন আমাদের ফৌজের কাছে যাও।' রায়হান আহতগলায় বললো, 'সামনে গিয়ে ডান দিকে যাবে। সেখানে আমাদের ফৌজের লোকজনকে পাবে। ওদেরকে বলবে। দক্ষিনের ফটক খোলা হয়েছে।'

দলের দু'জন পুরুষের একজন দৌড়ে গেলো। দলের অন্যরা সবাই এদিক লুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। কেউ যদি এদিকে আসে তাকে ওরা সঙ্গে সঙ্গে খতম করে দেবে।

এক অদম্য জলোচ্ছাসের দৃশ্যধারণ করলো সেখানে। মানুষ ও ঘোড়ার সম্মিলিত ঝড় হয়ে দক্ষিণ ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বৃষ্টি হচ্ছে। এতে কর্ডোভার কয়েকজন ফৌজ ঘায়েলও হলো। কিন্তু এখন কোন তীর বা বর্শার আঘাত এই ফৌজকে রোখার জন্য যথেষ্ট নয়।

এরা নিয়মিত সৈন্য। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা এদের অনেক দিনের। বড় কেল্লা এবং কেল্লা বেষ্টিত শহর জয় করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এদের। প্রত্যেক সৈন্য জানে তাকে কি করতে হবে। প্রত্যেকেই কমান্ডারের নির্দেশ পালন করতে জানে।

পুরো এক ইউনিট সেনা ভেতরে ঢুকে পড়লো। কিছু সৈন্য মশাল জ্বালিয়ে প্রাচীরের ওপর চলে গেলো। এবার বিদ্রোহী বাহিনীর তীরান্দাযরা কচুকাটা হতে লাগলো। ইতিমধ্যে যারা ভেতরে চলে এসেছে তারা আরেকটি ফটক খুলে দিয়েছে। এবার তো বিদ্রোহীরা জীবন-মৃত্যুকে তুচ্ছ করে লড়তে লাগলো।

আবিদীন নামে তদান্তিন এক ঐতিহাসিক ছিলেন। অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকও তার লেখা বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবিদীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য উপস্থাপন করেন,

'ধর্মদ্রোহী মুআল্লিদীনরা তো জানতো, ওরা বিদ্রোহের অনেক বড় অপরাধী। ওদের এই মারীদা ছাড়া তো অন্য কোন দেশ বা সালতানাত ছিলো না যে, পরায ঘটলে ওদের ওপর জিযিয়া-কর আরোপ করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। ওরা তো খেলাফতের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করেছে।'

'ওরা খেলাফতের পবিত্র মসনদে কালিমা লিপ্ত করে অপমানিত করেছে। মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে লুটপাট চালিয়েছে। ওদের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হলো, মুসলিম মেয়েদের ওপর ওরা হাত উঠিয়েছে।'

'ওদের ইযযত আবরুর ওপর ওরা ঝাপিয়ে পড়েছে। এর ভয়াবহ শাস্তির কথা তো ওরা জানতো। এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ওরা জানবাজি রেখে এমন বেপরোয়া হয়ে লড়তে লাগলো যে, কেল্লার ভেতরে আসা কর্ডোভার ফৌজের পা টলে উঠলো।'

'এ লড়াই ছড়িয়ে পড়লো শহরের অলিগলি থেকে নিয়ে বাড়ি ঘরের অন্দরমহল পর্যন্ত। দু'দলেরই শ্লোগানে আকাশ বাতাস তখন মুখরিত। মুসলিম এক সালারের নির্দেশে এক শ্লোগান শোনা গেলো, 'কাউকে জীবিত রাখবে না। একজন বিদ্রোহী লুটেরাও জীবিত থাকতে পারবে না। সবগুলোকে শেষ করে দাও। অস্ত্রধারী কাউকে ক্ষমা করবে না।'

সকাল হওয়ার পর দেখা গেলো শহরের প্রতিটি গলিতে রক্তের বন্যা বইছে। হাটতে গেলেই পা পিছলে যাচ্ছে।

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ শহরের দরজা খোলার খবর পেয়েই দ্রুতগতির এক পত্রদূত এই পয়গাম দিয়ে আমীরে উন্দলুসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন,

'মুহতারাম আমীর! যেকোন ভাবেই হোক শহরের দক্ষিণ প্রান্তের ফটক খোলা গিয়েছে। আমরা শহরে ঢুকছি। ইতিমধ্যে দক্ষিণমুখী ফটক দিয়ে এক ইউনিট সেনা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

উবাইদুল্লাহ শহরে ঢুকেই হুকুম দিলেন,

'সরকারি যত ভবন আছে এবং হাকিমদের ভবনের ওপর হামলা চালাও।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুকুম দিলেন, এক গেরিলা দল এখনই গিয়ে শহরের অর্থ কোষাগারের দখল নাও। এক সালারকে তিনি এজন্য নির্দেশ দিলেন। আর তিনি নিজে তার মুহাফিজদল ও কিছু সৈন্য নিয়ে কয়েদখানায় চলে গেলেন।

সেখানে সামান্য কিছু লড়াই হলো। কয়েদ খানার প্রধান জেলারকে ধরে আনা হলো। তিনি হুকুম দিলেন, আমীরে মারীদাসহ যতজন মুসলমান কয়েদী আছে সবাইকে ছেড়ে দাও। জেলার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে সবাইকে কয়েদমুক্ত করে দিলো।

সিপাহলার দ্বিতীয় হুকুম দিলেন এবং সালার আব্দুর রউফও একই হুকুম দিলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার, ইউগেলিস ও ইলওয়ারকে জীবিত গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু বড় সমস্যা দেখা দিলো, ফৌজের কেউ এই তিনজনকে চিনে না। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বারকে কেবল দু'একজন সালার চিনেন।

তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য শহরের সব দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ প্রহরীও নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু এটা কেউ দেখলো না, ততক্ষণে অনেক সময় চলে গেছে। যাদের শহর থেকে পালানোর তারা এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

❋❋❋❋❋

আবদুর রহমানের কাছে মারীদার খবর নিয়ে পত্রদূত পৌঁছতেই তিনি সালার মুসা ইবনে মুসা এবং সালার ফারতুনকে বললেন,

'তোমরা যে পজিশনে তোমাদের সৈন্যদেরকে রেখেছো সেভাবেই রাখো। ফ্রান্সের ফৌজ নজরে পড়লে ওদেরকে সামনেও অগ্রসর হতে দেবে না এবং পিছপাও হতে দেবে না।'

একথা বলে তিনি তার মুহাফিজ ইউনিট নিয়ে মারীদার রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার দলের চলার গতি রাখলেন খুব দ্রুত। পরদিন দুপুর নাগাদ তিনি মারীদায় পৌছে গেলেন। শহরে তখনো লড়াই চলছে।

নিজেদের আমীরুল মুমিনীনকে দেখতেই চারদিক থেকে ঘোষিত হতে লাগলো,

'আমীরে উন্দলু এসে গেছেন। আমীরুল মুমিনীন এসে গেছেন।'

আব্দুর রহমানের ঝান্ডা দেখে ফৌজ আরো নতুন করে উজ্জিবীত হয়ে উঠলো। আব্দুর রহমান বিভিন্নত হুকুম দিতে শুরু করলেন। তিনি প্রথম হুকুম দিলেন, কাউকে যেন ক্ষমা করা না হয়।

সুর্যাস্তের সময় বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ করতে লাগলো। তারপর এদের সবাইকে এক ময়দানে জমা করা হলো। এত বেশি মশাল জ্বালানো হয়েছে যে, অন্ধকারের অস্তিত্ব যেন মিটে গেছে। আব্দুর রহমানের এক হুকুম মতে সৈন্যরা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পুরুষদেরকে বের করে আনতে লাগলো।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার, ইউগেলিস এবং ইলওয়ারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। পাদ্রীদেরকেও পাকড়াও করা হলো।

শহরের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কাদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করেছে? প্রত্যেকেই কারো না কারো নাম নিলো। এদের সবাইকে পাকড়াও করা হলো। এভাবে অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করা হলো।

এই গ্রেফতার অভিযান দু'দিন চলতে লাগলো। যার ওপরই সামান্য সন্দেহ হলো থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর শহরবাসীকে এক ময়দানে একত্রিত করে বলা হলো,

'যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে বিদ্রোহীদের নেতাদের নাম বলে দাও।'

এভাবে বেশ কিছু লোককে পাকড়াও করা হলো। যারা মুসলিম মেয়েদেরকে আপহরণ করে ছিলো এবং মুসলমানদের শত শত ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলো তাদেরকে ভিন্ন এক জায়গায় একত্রিত করা হলো।

আব্দুর রহমান হুকুম দিলেন, এদের সবাইকে কতল করে দাও। তবে যে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার, ইউগেলিস ও ইলওয়ারকে সনাক্ত করতে পারবে তাকে প্রাণভিক্ষ দেয়া হবে। কিন্তু ওদের ব্যাপারে কারোই কিছু জানার কথা নয়।

পরে জানা যায়, এ তিনজন শহরের দরজা খুলতেই শহর থেকে বেরিয়ে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার লিজবন গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর ওই দু'জন অন্য কোথাও চলে যায়।

এ সময় আব্দুর রহমান জানতে পারেন, শহরের সর্বপ্রথম ফটক খুলে দেয় এই শহরেই বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি থাকা এক কমান্ডার আবু রায়হান।

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতা দিয়ে সে এক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তোলে এবং শহীদ হয়ে যায়। তার সঙ্গে বেশ কিছু মেয়েও এই অভিযানে অংশ নেয়।

আব্দুর রহমান আবু রায়হানের মা বাবা; স্ত্রী-সন্তানদেরকে কয়েক লক্ষ্য দিনার পুরস্কার দেন। আর ঐ মেয়েদেরকেও দু'হাতভরে পুরস্কার দেন।

মারীদা এখন এক লাশের শহর। এ যেন এক পরিত্যক্ত শহর। পুরো শহরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নের কাজ আব্দুর রহমান নিজ হাতে তদারকি করলেন। তারপর মারীদার পূর্বের গভর্ণর যাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার কয়েদ করেছিলো তাকেই গভর্ণর নিযুক্ত করলেন।

❋❋❋❋❋

কর্ডোভায় কয়েকদিন আগেই খরব পৌছে, আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান অভিযান থেকে ফিরে আসছেন। চাটুকাররা তাদের তোষামোদী প্রতিভা দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। মহলের সাজ-সজ্জা চলতে লাগলো।

যারিয়াব ও সুলতানা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের লোকেরা আগেই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে অভিযানে বের হয়েছিলেন আব্দুর রহমান সেটা তো বন্ধ করা গেছে। কিন্তু মারীদার বিদ্রোহ বিদ্রোহীদের রক্তেই ডুবে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ এসেছে, যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আব্দুর রহমান একেবারেই বদলে গেছেন। তার যেন মনেই নেই তিনি শাহে উন্দলুস এবং নিজেকে শাহে উন্দলুস বলতেন।

শাহী মহল সংলগ্ন বাগানের সুবেশী ফুলে ভরা এক সুরভিত কোনে সুলতানা মালিকায়ে তরূব ও মুদ্দাসিরা পায়চারী করছে। মুদ্দাসসিরাকে সুলতানা ডাকিয়ে এনেছে। মুদ্দাসসিরার সঙ্গে সুলতানা এমন ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে কথা বলতে লাগলো যেটা আগে কখনো দেখা যায়নি।

'না তিনি নিজে যাচ্ছিলেন না সালারদেরকে যাওয়ার হুকুম দিচ্ছিলেন।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'তিনি যদি সেনা অভিযানের হুকুম না দিতেন ফ্রান্স উন্দলুসের ওপর হামলা করে বসতো আর মারীদার বিদ্রোহীদেরকেও কাবু করা যেতো না।'

'তিনি মারা গেলে কি তুমি বিধবা হয়ে যেতে না। তোমার বাচ্চারা কি এতীম হয়ে যেতো না? সুলতানা জিজ্ঞেস করলো।

'আল্লাহর পথে মুসলিম নারীরা নিজেদের ভালোবাসার মানুষকে কুরবানী দিয়ে ও সন্তানদেরকে এতীম করতে পিছপা হয় না কখনো।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'ইসলামের ইযযত আবরু সব সময় আমাদের কাছে এই ত্যাগ তিতিক্ষা দাবী করে থাকে।

শহীদের স্ত্রী এ কথাটা শুনতে কি আপনি অপছন্দ করেন? শাহে উন্দলুসের ব্যাপারে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন মালিকায়ে তরুব! তিনি শহীদ হয়ে গেলে তো আপনি পরবর্তী স্পেন শাসকের রক্ষিতা হয়ে যাবেন। তাই আপনার তো কোন সমস্যা নেই।

'আমি শাহে উন্দলুসের রক্ষিতা নই। আমি তার বাচ্চার মা হতে যাচ্ছি। আমি সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে জন্ম দিতে যাচ্ছি।' সুলতানা চ্যালেঞ্জের সুরে বললো।

❋❋❋❋❋

'উন্দলুসের মাটি এখনো এতো নাপাক হয়নি যে, এর শাসকবর্গের উত্তরাধিকার সে হবে যার মার তার বাবার সঙ্গে বিয়েই হয়নি।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'অবৈধ সন্তান উন্দলুসের আমীর হতে পারবে না। আর মনে রেখো মালিকায়ে তরুব! আমি শাহে উন্দলুসের হাতে তোমার মতো শরাবের পেয়ালা দেবো না; তলোয়ারই দেবো।'

'মুদ্দাসসিরা!' সুলতানা তীক্ষ্মকণ্ঠে বললো, 'মন থেকে সব আত্ম তৃপ্তি দূর করে দাও। এসব আবেগী কথা বার্তা বন্ধ করো। আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি না। তোমাকে আমি বলছি। শাহে উন্দলুসের ওপর তোমার প্রভাব বিস্তার করা ছেড়ে দাও।'

'তোমার হুকুম আমি মানতে যাবো কেন?' মুদ্দাসসিরা বললো, 'কোন পুরুষের রক্ষিতা তার স্ত্রীর ওপর হুকুম চালাতে পারে না। আমি বনু উমাইয়ার কন্যা। কারো রক্ষিতা নই।'

মুদ্দাসসিরা আর ওখানে দেরি করলো না। তীব্রপায়ে হেঁটে ওখান থেকে বেরিয়ে গেলো। সুলতানার ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো। বিড় বিড় করে বললো,

'একদিন তোমাকে দেখিয়ে দেবো, হুকুম কোন রক্ষিতার চলবে না বৈধ স্ত্রীর?

মারীদার অলিগলি এখন রক্তের নদী হয়ে গেছে। যে ময়দানে বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা হয়েছে সেটা এখন রক্তের বিল।

মারীদার কেল্লা জয় করতে ও বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রনে আনতে অসংখ্য মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। আহত মুজাহিদের সংখ্যাও কম নয়। আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান শহীদদের দাফন করে আহত ও গাজী মুজাহিদদের নিয়ে এখন কর্ডোভার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন।

কর্ডোভার লোকেরা তাদের আমীর ও মুজাহিদদেরকে বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুত। শাহী প্রসাদও তার আমীরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করে নেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

ইতিহাসের অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ যারিয়াব তার কামরায় তারই নিজের সংস্কার করা গিটার নিয়ে বসে আছে। হৃদয়স্পর্শী এক গান গাইছে যারিয়ার। এই গানের গীতিকার সে নিজেই। হৃদয়ের অতি গভীর থেকে তার গানের শব্দগাঁথা বের হচ্ছে। তার গানের সুর মাধুরী থেকে যেন এক রূপসী প্রতিম দরজায় উদয় হলো।

আমীরে উন্দলুস কর্ডোভায় নেই। সুলতানা তাই এখন তার প্রকৃত রূপ নিয়ে এক প্রকার রূপের শাসন জারি করেছে।

যারিয়াবের গানের জাদুকরী সুর লহরী সুলতানাকে দরজার চৌকাঠে যেন বন্দি করে ফেললো। যারিয়াব যেমন স্বপ্নের রঙ্গমহলে বসে গেয়ে যাচ্ছে। সুলতানাও সেই স্বপ্নের সহযাত্রী। এই স্বপ্ন থেকে না সে নিজে, জাগতে চাচ্ছে, না যারিয়াবকে জাগাতে চাচ্ছে। সে জানে, যারিয়ারের সামনে গেলে তার স্বপ্ন ও মুগ্ধতার ভূবন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

যারিয়াব গেয়ে যাচ্চে। তার গানের কথায় যে নারীর রূপের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে সেটা কোন বেহেশতী হুরের বর্ণনাই হতে পারে। গানের প্রতিটি শব্দ সুলতানার অস্তিত্বের অনুপরমানুতে গিয়ে তরঙ্গ তুলছে। সুলতানা নিজেকে নিজে বলতে লাগলো,

'এতো আমার কথাই বলছে। আমি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এতো আমার রূপ ও আমার ভালোবাসার বেদনা বিধুঁর বর্ণনা দিচ্ছে। এতো আমাকে কল্পনা করে আমারই অদৃশ্য প্রতিমূর্তির পূজা করছে।'

সুলতানার রূপ কারো সঙ্গেই তুলনীয় নয়। কোটির মধ্যেও এমন রূপসী মেয়ে পাওয়ার দুস্কর। তবে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সুন্দরী বলে নিশ্চয় কোন মেয়ে এককভাবে দাবী করতে যাবে না। কিন্তু সুলতানা নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বলে মনে করতো।

সুলতানা আবার মনে মনে বললো,

'একি আমার ভালোবাসার কথাই বলছে? অন্য কেউ তো নয়? তার সুর মুর্ছনা আর গানের কথাগুলো তো আমার রূপেরই অনুবাদ করছে।'

সুলতানার আরেকটি রাতের কথা মনে পড়লো। সে রাতে সুলতানাই যারিয়াকে তার জায়গীরে নিয়ে গিয়েছিলো। দু'জনে মখমল ঘাসে অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিলো। চারদিক তখন ফুলের সৌরভে সুরভিত। যারিয়াব তাকে বললো,

'তুমি আমার কাছে থাকলে তো আমার ব্যক্তিত্ববোধই যেন শেষ হয়ে যায়। আমি তোমার অস্তিত্বে হারিয়ে যাই।'

যারিয়াব একথা সুলতানার বাহুধরে আলতো করে তার দিকে আকর্ষণ করে। সুলতানা তার কাছে না এসে দূরে সরে যায়।

'আমি তৃষ্ণার্ত। দূরে সরে যেয়ো না।' যারিয়াব তৃষ্ণায়পূর্ণ মাদক কণ্ঠে বললো।

'ভালোবাসার আসল রহস্য তুমি মনে হয় বুঝোনি। তুমি কি এই না পাওয়ার তৃষ্ণায় দারুণ এক স্বাদ অনুভব করছো না?' সুলতানা বলেছিলো।

'মিলনের যে কি আনন্দ সেটা কী তুমি জানো না?' যারিয়াব জিজ্ঞেস করেছিলো।'

'কিন্তু মিলনের ব্যকুল প্রতীক্ষায় যে আনন্দ সেটা মিলনে নেই।' সুলতানা বলেছিলো।

একবার সে তার দীক্ষাগুরু ইউগেলিসকে বলেছিলো, যারিয়াবের ব্যাপারে সে দুর্বল। যারিয়াবকে সে ভালোবাসতে চায়। ইউগেলিস সুলতানকে খ্রিষ্টানদের এক মায়াবী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নির্বাচন করে এনেছে। যে অস্ত্র অতি সুক্ষ্মভাবে মুসলমানদের শিকড়ে ছুরি চালাবে। তাই ইউগেলিস তাকে বলে ছিলো,

'সুলতানা! শোনো, প্রেম ভালোবাসা পাপ নয়, অপরাধও নয়। কিন্তু যারা নিজেদের আত্মর্মাদাবোধের ব্যাপারে সচেতন, ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি যাদের সহজাত তারা নিজেদের উদ্দেশ্য, মিশন ও অমূল্য ব্যক্তিত্ববোধকে শুধু একজন মানুষের ভালোবাসায় বিসর্জন দিতে পারে না।'

'আমরা তো তোমাকে সাম্রাজ্ঞী বানাচ্ছি। তোমার মধ্যে আমি সম্রাজ্ঞীর মহানত্ব দেখেছি। কিন্তু সেই আসনের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছতে হলে তোমাকে নাটকের মঞ্চ সাজাতে হবে। যারিয়াবের ওপর তোমার মায়াবী জাল বিস্তার করে রাখো।

ওকে জাগতে দিয়ো না। ওকে তোমার রূপ আর রূপের প্রেমে উম্মাতাল হয়ে থাকতে দাও।'

আজ রাতে যারিয়াব যখন নিজের সঙ্গীতের সুর মুর্ছনায় নিজেই মন্ত্রমুগ্ধ। এই জাদুর তীব্রতা সুলতানাকেও দারুণভাবে স্পর্শ করেছে। সুলতানা তখন নিজের মধ্যে এক ব্যকুলতা অনুভব করলো। একবার ভাবলো, যারিয়ারকে সে আজই বলবে, তাকে সে ভালোবাসে। কিন্তু এতটুকু ভাবতেই সে এখান থেকে দৌড়ে পালানোর তাড়না অনুভব করলো।

সুলতানার মনে পড়লো, যারিয়াবকে তার প্রেমিক নয়; তার টোপ বানাতে হবে। তাকে সম্রাজ্ঞী হতে হবে। সে কুলুপতরার মতো অসংখ্য হৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসাকে পায়ে পিষে, মানবতাকে আস্তকুঁড়ে নিক্ষেপ করে রূপের মায়ায় জড়ানো নিষ্ঠুরতার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমানের ব্যাপারে তার মনে কোন ভাববেগ নেই। সে তো তার দেহ তাকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার মনে আব্দুর রহমানের এতটুকু স্থান নেই।

যারিয়াবকে সে তার স্বপ্নের ভূবণ থেকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু যারিয়ারের সঙ্গে তার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে।

পর দিন শাহে উন্দলুস যুদ্ধজয়ী সেনা দল নিয়ে আসবে। সুলতানা ও যারিয়াব মারীদার বিদ্রোহ উস্কে দিয়ে তো ফ্রান্সের ওপর হামলা রুখে দিয়েছিস্কলা; কিন্তু শাহে উন্দলুস তারপরও বিজয়ী বীর হিসেবে ফিরে আসছেন।

এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়াতে সুলতানার মধ্যে কোন হতাশা নেই। তারপরও সে পরাজয়ের তিক্ততা অনুভব করছে এ কারণে যে, শাহে আব্দুর রহমানের মধ্যে এখনো তলোয়ারের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।

তাই পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য সুলতানার যারিয়ারেব সাহায্যের প্রয়োজন।

❋❋❋❋❋

পায়ের মৃদ শব্দে যারিয়াবের গান থেমে গেলো। সে পেছনে ফিরে দরজার দিকে তাকালো। সে যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

'তুমি কি বাস্তব না আমার কল্পনার কোন অপসরী?' যারিয়াব সবিস্ময়ে ফিস ফিস করে বললো।

সুলতানা রিনঝিনিয়ে হেসে উঠলো। যারিয়াব ধীরে ধীরে উঠলো। সুলতানা কাছে এগিয়ে গেলো। যারিয়াব কম্পিত দু'হাতে সুলতানার গাল স্পর্শ করলো। তারপর তার হাতে সুলতানার রেশম কোমল কয়েকটি চুল নিয়ে গভীর নিঃশ্বাসে শুঁকলো। তারপর সুলতানার উন্মুক্ত কাঁধে হাত রাখলো। সুলতানা কলকলিয়ে হেসে উঠলো।

যারিয়াব সুলতানার দু'বাহু ধরে তাকে গালিচায় বসিয়ে দিলো। নিজে তার সামনে বসে পড়লো।

'কখনো কখনো আমার নিজের সুর আর এই গিটারের আওয়াজ আমাকেও নিবিষ্ট করে ফেলে'; যারিয়াব স্বগোতিক্তের মতো বললো, 'গিটারের তারের জলতরঙ্গ আমার কণ্ঠের বানী একাকার হয়ে তোমার অপরূপ রূপ ধারণ করে নিয়েছিলো। আর সেই কল্পনাকে তুমি এখন কাংখিত বাস্তবের রূপ দিলে।'

সুলতানা হেসে উঠলো এবং বললো,

'আমি কি কালনাগিনী? যে বাশির করুণ সুরে এসে হাজির হয়?'

'তুমি কালনাগিনীই সুলতানা!' যারিয়াব বললো, 'উন্দলুসের কালনাগিনী তুমি, তোমার বিষের মধ্যে রূপের মাধুরী আছে। আছে মাদকতা এবং তীব্র এক নেশা'...

'সুলতানা! আমি সেই মানুষ, যে শাহে উন্দলুস আব্দুর রহমানের মতো এমন বিজ্ঞ, নির্ভীক, বীর বাহাদুর শাসকের ওপর অনায়াসে প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছি। তুমি তো দেখোই, বড় বড় আমীর, রঈস আমারই হাত ধরে শাহে উন্দলুসের কাছে যেতে পারে।'

'যে কোন ধরনের অনুরোধ, উপরোধ আমাকে দিয়েই করায়। কিন্তু তুমি যখন আমার সামনে আসো তখন মনে হয় তুমি যেন আমাকে কোথাও দংশন করেছো। আর আমার ওপর তোমার বিষের মাদকীয়তা চেপে বসেছে'। .....

'কিন্তু তোমার সুর-সঙ্গীতকে আমি দংশন করবো না', সুলতানা বললো, 'কিন্তু তুমি যা চাচ্ছো সেটা হলে তোমার এই অমূল্য সুর সঙ্গীতের মৃত্যু ঘটবে। তখন কিন্তু তোমার আওয়াজ শুনে উন্দলুসের নাগিনী আর ছুটে আসবে না। না তোমার আওয়াজ তাকে এতটুকু দুলাতে পারবে।'

'তারপর তুমি হয়তো এক নাগিনীকে পিঞ্জরায় বন্দি করে প্রাণহীন সুর সঙ্গীতের প্রতি তাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করবে, আর নিজেকে নিজে এই ভেবে ধোকা দেবে। যে, তোমার বেসুরো সঙ্গীতে এই নাগিনী বুঝি দুলে দুলে উঠছে।'

সুলতানা তার মুখ যারিয়ারের একেবারে কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, 'আমার প্রিয়তমা যাররী! আমি তো তোমারই। তোমারই থাকবো। এসো, প্রেম ভালোবাসার জগত থেকে একটু বের হয়ে এই দুনিয়ার বাস্তবতার মুখোমুখি হও।'

যারিয়ার সুলতানাকে তার প্রতি আরো আকর্ষিত করার জন্য ওর একেবারে কাছে চলে গেলো। এত কাছে যে, ওর বিক্ষিপ্ত রেশম কোমল চুলগুলো যারিয়াবের গাল স্পর্শ করতে লাগলো। সুলতানা বললো,

'আমাদের স্বপ্নের ভূবনে এক কালো মেঘ কুন্ডলী পাকাচ্ছে।'

'আর সেই কালো মেঘটা হলো মুদ্দাসসিরা!' যারিয়াব সুলতানার কথা পূর্ণ করলো। মুদ্দাসসিরাই শাহে উন্দলুসের বুকে তার মুজাহিদী সত্বাকে জাগিয়ে তুলেছে, তুমি তো এটাই বলতে চাচ্ছিলে!'

'তুমি যে দাবী করেছো, শাহে উন্দলুসের ওপর তুমি বেশ প্রভাব বিস্তার করেছো।' এটা তো মুদ্দাসসিরাই ভুল প্রমাণিত করে দিলো। আব্দুর রহমান আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে।' সুলতানা বললো।

'সুলতানা!' যারিয়াব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'কখনো মনে হয়, তোমার ভালোবাসা আমাকে অন্য কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে, যেদিকে আমার যাওয়ার কথা নয়, আমি তো সঙ্গীত জগতের বাদশাহ।'

'তুমি একজন গোলাম' সুলতানা কিছুটা খোঁচা দিয়ে বললো। 'তুমি এক বাদশাহর গোলাম। ভুলে গেছো তুমি, হাকিম আর সালাররা তোমাকে এক দরবারী গায়ক ছাড়া আর কিছু বলে না? নিজেকে নিজে ধোকা দিয়ো না যিররী। আমি তোমাকে এক রাজ সিংহাসনে বসা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আর আমি এই স্বপ্ন নিয়ে নিজেকে তোমার পায়ে সোপর্দ করে দিচ্ছি। তুমি আমাকে তোমার সম্রাজ্ঞী বানাবে।'

'তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। এসো, কাছে এসো।' যারিয়াব মাদকীয় কণ্ঠে বললো।

দু'জন তারপর এক নিষিদ্ধ জগতে হারিয়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে সুলতানা ফিস ফিস করে বললো,

'যাররী! মুদ্দাসসিরাকে আমাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও।'

বেশ কিছুক্ষণ পর, দু'জনে সিক্ত দেহে মুখোমুখি হয়ে কথা বলছে। ওদের মাঝখানে মদের সুরাহী।

'কাউকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও মালিকায়ে তরুব!' যারিয়াব বললো, 'মুদ্দাসসিরাকে আমি আমার পক্ষে নিয়ে নেবো।'

'কিন্তু তুমি এটা কেন বলেছো যে, তুমি ভুল পথে যাচ্ছো?' সুলতানা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি অনুভব করছি, আমার পথ এটা নয়। তুমি তো তোমার স্বপ্নের পথে যাচ্ছো, যে পথে তোমার প্রবৃত্তির প্রশান্তি আছে বলে মনে করো সেটাকেই তোমার গন্তব্য মনে করছো। আর আমাকেও তোমার প্রেম সে পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার পথ ভিন্ন কিছু।' যারিয়াব কিছুটা গম্ভীর গলায় বললো।

'তুমি অনেক জ্ঞানী এবং দূরদর্শীও।' সুলতানা বললো, 'আমরা, দু'জন মুসলমান। কিন্তু আমাদের সামনে যা ঘটছে তা থেকে আমাদের চোখ বন্ধ করে তো থাকতে পারি না। খ্রিষ্টানরা যে মিশন ও যে কঠিন সংকল্প নিয়ে জেগে উঠেছে এবং যে ত্যাগ ওরা দিয়ে যাচ্ছে এতে তো এটা পরিস্কার যে, ইসলামের ঝান্ডা আর বেশি দিন এখানে উড়বে না।'......

'তারপর কী হবে জানো? তুমি দরবারী গায়কদের মধ্যে একজন গায়ক হয়ে থাকবে। আর আমি ওদের কোন জেনারেলের রক্ষিতা হয়ে থাকবো। ইউগেলিস তো আমাকে সবকিছু বলেছে। তোমার প্রতি উনি দারুণ খুশি। তুমি মুসলমান আমীর উমারা ও অভিজাত শ্রেণীর সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনটাই পাল্টে দিয়েছো। ওদেরকে ইসলামের আসল চেতনা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছো।'.........

'সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন খ্রিষ্টানরাই এখানকার বাদশাহ বনে যাবে। তাহলে ওদের সঙ্গে আমরা কেন শত্রুতা সৃষ্টি করতে যাবো যে, আমাদের শুধু এটাই করতে হবে। শাহে উন্দলুসের চিন্তার জগৎটাকে আমাদের হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। তিনি আগামীকাল আসছেন। মুদ্দাসসিরাকে বলো সে যেন তার কাছ থেকে দূরে থাকে। মুদ্দাসসিরার প্রতি তিনি বেশ দুর্বল এবং তার কথাকেই তিনি খুব গুরুত্ব দেন।'

'আমি এখনই মুদ্দাসসিরার কাছে যাচ্ছি।' যারিয়াব বললো।

❋❋❋❋❋

খাদেমা এসে জানালো যারিয়াব এসেছে। মুদ্দাসসিরার ভ্রু কুচকে উঠলো। ব্যাপার কি এ লোক এখন কেন আসলো? এবং মুদ্দাসসিরার কাছে তার কি দরকার?

তারপরও মুদ্দাসসিরা দরজায় গিয়ে তাকে স্বাগত জানালো।

'শাহে উন্দলুসের প্রতীক্ষায় তোমার দিনকাল কেমন কাটছে মুদ্দাসসিরা?'

'শাহে উন্দলুস নয় আমীরে উন্দলুস বলুন!' মুদ্দাসসিরা বললো, 'ইসলামে কোন বাদশাহ্ নেই। জনাব যারিয়ার! আপনি তো বড় বিদ্যান, জ্ঞানী। আপনি এতটুকু বুঝতে পারছেন না। একজন আমীরকে কে বাদশাহ বানালো? খলীফাও তো বাদশাহ্ নন। বাদশাহী তো একমাত্র আল্লাহরই আচ্ছা! আজ হঠাৎ এ দিকে? আবার এ সময়?'

যে যারিয়াব যে কোন মানুষের হৃদয়ের মুকুটহীন বাদশাহ ছিলো সে লোকটি মুদ্দাসসিরার কথায় তার স্বপ্রতিভাতা হারিয়ে ফেললো। কেমন নিস্প্রভ হয়ে গেলো। রূপ ও ব্যক্তিত্ব মুদ্দাসসিরার সুলতানার চেয়ে কম নয়। যারিয়াবের কাছে সুলতানার চেয়ে মুদ্দাসিরাকেই অধিক আকর্ষণীয় মনে হলো।

যারিয়াব যখন এই কামরায় ঢুকে তখন তার হাবভাব ছিলো এমন যেন মুদ্দাসসিরা আমীর উন্দলুসের নয় বরং তারই স্ত্রীদের অতি সাধারণ এক স্ত্রী। আর যারিয়ার এই কামরায় এসে তার ওপর অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু মুদ্দাসসিরার সপ্রতিভ ভঙ্গি এবং আত্মবিশ্বাস দেখে যারিয়ার অনুভব করলো, সে নিজে এতো বিশাল কোন ব্যক্তিত্ব নয় যতটা সে নিজেকে মনে করে।

'আপনি কি মেহেরবানী করে বসবেন না? মুদ্দাসসিরা বললো।

'এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই তোমার কাছে একটু বসে গেলাম।' যারিয়াব বসতে বসতে বললো।'

'জনাব যারিয়াব!' মুদ্দাসসিরা অকপটে বললো, 'আপনার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সামনে তো আমি কিছুই নই। সূর্যের সামনে সাধারণ প্রদীপ যেমন আমি তেমনও নই। কিন্তু কিছু না কিছু তো অবশ্যই বুঝি। আপনার চোখের ভাষা বলছে, আপনি এখান দিয়ে যাওয়ার সময় এমনি এমনি উদ্দেশ্য ছাড়া এখান দিয়ে আসেননি।'....

'আপনি আমার কাছেই এসেছেন। বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি হরমের কোন মেয়ে নই। আমার একজন স্বামী আছে। আমীরে উন্দলুসের স্ত্রী আমি।'

যারিয়াব হেসে উঠলো। বললো,

'সুন্দরী মেয়েদের কোন পুরুষ এক পলক দেখলেই ওরা মনে করে ভিন্ন দৃষ্টিতে বুঝি ওকে দেখেছে। তুমি এতটুকু ঠিকই বলেছো যে, আমি এমনি এমনি

আসিনি। কিছু বলতেই এসেছি। কিন্তু এটা তোমার অমূলক ধারণা যে, তোমার স্বামীর অবর্তমানের সুযোগ নিয়ে অন্য কোন মতলবে তোমার কাছে এসেছি।' যারিয়াব কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো।

❋❋❋❋❋

'সুলতানের সঙ্গে আমার ততটুকুই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে যতটুকু রয়েছে তোমার সঙ্গে। অবশ্য তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা পার্থক্যও আছে। আমি এটাও বুঝি'

'এত ভূমিকার কি প্রয়োজন জনাব যারিয়াব?' মুদ্দাসসিরা কিছুটা চড়া গলায় বললো, 'আপনি কেন বলে দিচ্ছেন না, আমার সুলতানা ও আমীরে উন্দলুসের মাঝখানে দেয়াল হওয়া উচিত নয়। সুলতানা বড়ই রূপময় এক কবিতা।'.....

'সে আপনার গানের স্বপ্নময় কলি। যেই তা শুনে মাতাল হয়ে যায়। আর আমি এক বাস্তব নারী। বাস্তবতা জাদু ও অচৈতন্যকে সমূলে শেষ করে দেয়। আমীরে উন্দলুস আমার স্বামী ঠিক; কিন্তু তিনি আমার মালিকানা ভুক্ত নন। প্রথমে তিনি আমীরে সালাতানাত। তারপর কারো স্বামী বা কারো প্রেমিক।'.......

'তাই সালতানাত, খেলাফত বা প্রশাসনের দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে আমি অবহেলা করতে যদি দেখি তাহলে আমার এই দায়িত্ব আমি অবশ্যই পালন করবো যে, আমি তাঁকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবো। তারপরও যদি তিনি তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মধ্যে ডুবে থাকেন তাহলে তাকে আমার নিজের ওপর হারাম মনে করবো।'

যারিয়াবের ওপর সুলতানা ও মদের যে নেশা ছিলো সেটা এতক্ষণে অনেকটাই নেমে গেছে।

'আমার মতো সুলতানার ওপর এমন কোন দায় দায়িত্ব নেই। মুদ্দাসসিরা আবার বললো, 'সে তো আপাদমস্তক ভোগ বিলাসের এক প্রতিমূর্তি। ভোগ মত্ততার বড় মায়াবী এক উপকরণ সুলতানা।'

'আর এটাই তার শক্তি।' যারিয়াব বললো, 'ওর রূপ এক বিধ্বংসী অস্ত্র। সে যে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারবে সেটা তুমি পারবে না। তোমার ব্যক্তি-সত্ত্বার ওপর আমার বেশ আগ্রহ বা দুর্বলতা রয়েছে। আমি যেটা বলতে এসেছি সেটা হলো, সুলতানার সঙ্গে শত্রুতা রাখার মতো ঝুঁকি তুমি নিয়ো না।'........

'সুলতানা চায়, আমীরে উন্দলুস যেন যুদ্ধের ময়দানে ময়দানে এভাবে ঘুরে না বেড়ান। তিনি ফ্রান্সের ওপর হামলার জন্য ফৌজ পাঠাচ্ছিলেন। এখানে তাঁর প্রশাসনিক বহু কিছু দেখার ছিলো। আর সে মুহূর্তে তুমি তাকে এমনভাবে উস্কে দিয়েছো যে, তিনি ফৌজের নেতৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন এবং চলে গেছেন। আমরা তাঁকে জীবন্ত দেখতে চাই।'

❋❋❋❋❋

'আমি আমার স্বামীকে সে অবস্থায় জীবিত দেখতে চাই না যে, আমাদের ফৌজ ফ্রান্স, গোথাক মার্চ ও শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন মরণ লড়াইয়ে আহত নিহত হতে থাকবে আর আমার স্বামী রাজ মহলে এক গায়কের গানে ও এক রূপসীর রূপে অচেতন হয়ে পড়ে থাকবে।'

মুদ্দাসসিরা তেজদীপ্ত গলায় বললো, 'মুসলিম মেয়েদের কাছে নিজেদের প্রিয়জন নয়। আপন জাতির ইজ্জত সম্ভ্রমই সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হয়ে থাকে।'

'মুদ্দাসসিরা!' যারিয়াব বললো। 'আমি তোমার এই আবেগ- অনুভূতিকে মন থেকে সম্মান করি। আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের কাছে বড় বড় এবং দুর্ধর্ষ বহু সালার জেনালের আছে। উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহকে তুমি কী মনে করো? তিনি কি আমীরে উন্দলুসের নেতৃত্ব ছাড়া নিজে ফৌজের নেতৃত্ব দিতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন।'

সালার মূসা ইবনে মুসা, সালার আব্দুর রউফ, সালার ফারতুন ঐতিহাসিক সব লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাহলে এসব অভিযানে আমীরে উন্দলুসের যাওয়ার কী প্রয়োজন?'

যারিয়াব কথা বলছে আর মুদ্দাসসিরা উঠে কামরায় পয়চারী করছে। তার চলনে অভিব্যক্তিতে সমীহ পাওয়ার মতো অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। সে পায়চারী করতে করতে একেবারে যারিয়াবের কাছে চলে এলো। যারিয়াবের ওপর একটু ঝুকে আবার সোজা হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

'আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে মদের কুট গন্ধ বেরোচ্ছে। আর আপনার শরীর থেকে আসছে সুলতানার সুগন্ধি।' মুদ্দাসসিরা মুচকি হেসে বললো, 'যে কথা আপনি আমাকে বলতে এসেছেন সেটা সুলতানার নিজের এসে বলা উচিত ছিলো। কিন্তু সে আসবে না। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপনি এক মহান মানুষ। আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক উঁচু আসন দিয়েছেন। কিন্তু এক নারীর রূপযৌবন আপনার বুদ্ধিবলের ওপর পর্দা ফেলে রেখেছে।'.....

'মুহাতারাম যারিয়ার! আপনি তো আপনার কথা বলেছেন। এখন আমার জবাব শুনুন। সুলতানার মতো আমার আমীরে উন্দলুসের মন জয় করার প্রয়োজন নেই। আমার প্রতি তার ভালোবাসা না থাকলে আমাকে তিনি বিয়ে করতেন না। হেরেমের অন্যান্য মেয়েদের মতো বা সুলতানার মতো বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বা রক্ষিতা বানিয়ে রাখতেন।'....

'এই একজন মানুষের সঙ্গেই শুধু আমার সম্পর্ক নয়, পুরো মুসলিম জাতির সঙ্গেই আমার প্রাণের সম্পর্ক রয়েছে। উন্দলুসে যে একের পর এক বিদ্রোহ হয়ে আসছে এর পিছনে ফ্রান্সের শাহলুই এবং আলফাঁসের হাত রয়েছে। এরা ইসলামকে সমূলে উৎখাত করতে চায়। মারীদায় এরা তখন বিদ্রোহ করিয়েছে যখন আমাদের ফৌজ ফ্রান্সের ওপর চূড়ান্ত এক হামলা করতে যাচ্ছিলো। এটা ছিলো পরিস্কার এক ষড়যন্ত্র।'

'ঐ কাফেররা মারীদার বিদ্রোহ উস্কে দিয়ে ফ্রান্সকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। এখন শাহ লুই ও আলফাঁসো মারীদায় ব্যর্থ হওয়ার মূল্য ঠিকই উন্দলুসের খ্রিষ্টানদেরকে কড়ায় গন্ডায় উসুল করার ব্যবস্থা করে দেবে। অন্য কোথাও বিদ্রোহ করাবে। আমার নজর তো এসব অবস্থা ও পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর।'

'নিজের ব্যক্তিগত অবস্থ্যার ওপরও একটু খেয়াল রাখে মুদ্দাসসিরা!' যারিয়াব বললো।

'মুহতারাম যারিয়াব!' মুদ্দাসসিরা বললো, আমার মনে আপনার যে একটা সম্মানজনক আসন আছে সেটাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করছেন। আমি বলেছিলাম, আপনার মুখ থেকে মদের ও শরীর থেকে সুলতানার আতরের গন্ধ আসছে। আর আপনার কাঁধে লম্বা এক চুল দেখা যাচ্ছে যা কাঁধ থেকে নিয়ে আপনার বাহু জড়িয়ে আছে। যেন সুলতানা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে। এটা কি সুলতানার মাথার চুল নয়?'

যারিয়ার চমকে উঠে প্রথমে নিজের ডান তারপর বাম কাঁধে চোখ বুলালো। তার ধবধবে সাদা কাপড়ে বাদামী রঙের লম্বা একটি চুল যেন তাকে ভ্রু কুটি করছে। চুলটি তার আঙ্গুলে পেঁচিয়ে কুন্ডলীর মতো করে মাটিতে ছুড়ে দিলো। তার চরম বিব্রত চোখমুখ দেখে মুদ্দাসসিরা আর কিছু বললো না।

'তিনি আগামীকাল আসছেন।' মুদ্দাসসিরার গলা এখন বেশ ধরা এবং গম্ভীর। 'তার সঙ্গে আমাদের ফৌজ আসছে। শহীদদের লাশ ও আহত মুজাহিদদের কাফেলাও আসছে। এর মধ্যে অনেক মায়ের সন্তান থাকবে না।

অনেক বোনের ভাই, অনেক মেয়ের বাবা এবং বহু নারীর স্বামী থাকবে না। যুদ্ধের ময়দানেই ওরা চির বিদায় নিয়েছে।'....

'ওরা যখন দুশমনের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে, ওদের লাশ ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষ্ট হচ্ছে তখন আপনার মুখ থেকে মদের গন্ধ, আপনার শরীর থেকে আসছে এক নারীর সুগন্ধি এবং আপনার বাহুমূলে সে নারীর অসংলগ্ন চুল। যখন ইসলামের ঝান্ডাধারীরা রক্তে ডুবে যাচ্ছে তখন আপনি রূপ যৌবন নিয়ে খেলায় মত্ত এক নারীর বাহুলগ্ন হয়ে এ চিন্তায় মগ্ন যে, আমীর উন্দলুস কোন্ নারীর দখলে থাকবে।'

'মুদ্দাসসিরা!' যারিয়াব অধৈর্স গলায় অনেকটা ব্যকুল হয়ে বললো। 'তুমি অনেক বেশি আবেগী। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম, সে তোমাকে আমীরে উন্দলুসের চোখের কাটা করে তুলবে। ও অনেক কিছুই করতে পারে।'

❋❋❋❋❋

'এতো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই আমার মুহতারাম যারিয়াব।' মুদ্দাসসিরা বিষন্ন হেসে বললো। 'কী বলতে যাচ্ছেন আমি সেটা বুঝে গেছি। আমাকে আসলে আপনার সরাসরি হুমকি দেয়া উচিত ছিলো। আমাকে কেন সরাসরি সাবধান করে দিচ্ছেন না। আপনাদের দু'জনের পরিকল্পিত পথ থেকে সরে না দাঁড়ালে আমাকে মেরে ফেলা হবে।'

'আসলে সরাসরি হুমকি দিচ্ছেন না একারণে যে, আপনি অনেক বুদ্ধিমান। অনেক বেশি চতুর। ধূর্তও। আপনার মুখের কথায় জাদুর প্রভাব রয়েছে। তাই আপনি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলেন। কিন্তু মুহতারাম যারিয়াব! জাদু তার ওপরই প্রভাব বিস্তার করতে পারে যার চরিত্রে ঈমানের দীপ্তি নেই।'

যারিয়াব মুদ্দাসসিরার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো। সুলতানার চেয়ে তাকে এখন আরো অনেক বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে। এতো আসলে মুদ্দাসসিরার ভেতরের রূপ-সৌন্দর্য, যার তেজদীপ্ততা যারিয়াব সহ্য করতে পারছে না। এতক্ষণে যারিয়াবের মনে হচ্ছে, সুলতানার কথায় তার মুদ্দাসসিরার কাছে আসা উচিত হয়নি।

'কারো ভয়ে আমি ভীত নই।' মুদ্দাসসিরা নির্ভয়ে বললো, 'যে পরিণামের ব্যাপারে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন আমি তাতে শংকিত নই। ইসলামের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। সেই আমীর যিনি আমার স্বামী,

তার প্রতি আমি সে পর্যন্ত অনুগত থাকবো যে পর্যন্ত তিনি ইসলামের প্রতি অনুগত থাকবেন।'........

'আপনি অনেক জ্ঞানী মানুষ মুহতারাম যারিয়াব! আপনি নিজেই তো বুঝতে পারছেন। মুসলিম মেয়েরা যদি এভাবে একে একে সুলতানায় রূপান্তরিত হতে থাকে তাহেল সালতানাতে ইসলামিয়া সংকুচিত হতে হতে খানায়ে কাবায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। কাবাই তখন ইসলামের এক মাত্র স্মৃতি স্তম্ভ হয়ে থাকবে।'....

'তারপর একটা সময় আসবে, যখন অমুসলিমরা বলবে, এটা সে জাতির স্মৃতি, যে জাতির মেয়েরা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ছুড়ে মেরে উলঙ্গপনাকে বরণ করে নিয়েছিলো।'

'শালীনতা, নৈতিকতা, পর্দা আর সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে পরপুরুষের আনন্দ- সামগ্রীতে পরিণত হওয়াকে গর্ভ অনুভব করতো। আর ওদের মাতৃজাতি থেকে যে সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলো ওরা, ওরা তো আত্মর্যাদাবোধ কী, আত্ম সম্ভ্রমকী সে সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান রাখতো না। আসলে ওরা ছিলো মূর্খ।'

'তুমি যা বলছো সেটা কী নিজে বুঝতে পারছো মুদ্দাসসিরা?'

'যিনি আমাকে এসব কথা বলেছিলেন তিনি আমাকে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন, 'মুদ্দাসসিরা বললো, 'তিনি ছিলেন আমার বাবা। আমার শ্বশুর আলহাকামের যুগে তিনি তুলাইতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।'

'মুহাতারাম যারিয়াব! আপনি আপনাকে আরো কিছু বলতে চাই। আপনি শুধু অসাধারণ একজন সঙ্গীতজ্ঞই নন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আরো কিছু শক্তি-সামর্থও দান করেছেন। যার দিকে আপনি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন সে তো পাথর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আপনাকে অতুলনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা দিয়েছেন। ....

'আল্লাহ তাআলা যেহেতু আপনাকে অন্যকে জাদুমুগদ্ধ করার বিশেষ প্রতিভা দিয়েছেন তাই সেটা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য অন্যের ওপর প্রয়োগ করবেন না। অসাধারণ প্রতিভা, বিচক্ষণতা যখন আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিয়েছেন অন্যকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সেটা ব্যবহার করবেন না।'

আল্লাহ ধন-সম্পদ দিলে অনাথ দরিদ্রকে কীটপতঙ্গ মনে করো না। খোদা শাসন ক্ষমতা দিলে তার বান্দাদেরকে গোলাম মনে করে নিজেদের পায়ের তলায় পিস্ট করো না। আল্লাহ তাআলা ইযযত-সম্মান দিলে অন্যকে তাই হেয় প্রতিপন্ন করতে নেই।'

'তুমি আমাকে এসব দার্শণিক কথা বার্তা কেন শোনাচ্ছো মুদ্দাসসিরা!' যারিয়াব ঝাঝালো কণ্ঠে বললো। 'আমি তোমাকে জটিল কোন কথা বলিনি। সুলতানার ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করতে এসেছিলাম।'

'আমি তো আপনার চোখে-মুখে যেন চাপা অস্থিরতা আর দ্বিধাদ্বন্দ দেখতে পাচ্ছি।' মুদ্দাসিরা হেসে বললো, 'আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এ ব্যাপারে আমীরে উন্দলুসের সঙ্গে আমি কোন কথাই বলবো না।'

'আমি তোমাকে হুমকি দিতে আসিনি।' যারিয়াব এবার নরম গলায় বললো।' আমার মনে আপনার সম্মান সহানুভূতি উভয়টিই আছে। আল্লাহ হাফেজ?

যারিয়াব চলে গেলো।

❃❃❃❃❃

শহরের লোকেরা তাদের ফৌজকে স্বাগত জানানোর জন্য শহর থেকে বেশ দূরে চলে যায়। এর মধ্যে মুসলমান খ্রিষ্টান সবই আছে।

কর্ডোভায় আগেই খবর পৌঁছেছে, মারীদার বিদ্রোহ দমন করে এবং কঠিন যুদ্ধে জয় লাভ করে তাদের ফৌজ আসছে। শহরবাসী উট ও ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে তাদের ফৌজের সঙ্গে শহর প্রবেশ করছে।

ফৌজ যখন শহরে প্রবেশ করলো পুরো শহর তাদের প্রশংসায় শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো। মেয়েরা বাড়ির ছাদে, ব্যলকনিতে, বারান্দায়, চওড়া-কার্ণিশে দাঁড়িয়ে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছে।

আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমানের ঘোড়ার পেছনে সুলতানা, শিফা, জারিয়া পৃথক পৃথক ঘোড়ার গাড়িতে করে মহলের দিকে আসছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী এই চারজন আমীরে উন্দলুসকে স্বাগত জানানোর জন্য কর্ডোভা শহর থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে চলে গিয়েছিলো। যারিয়াব ও অন্যান্য দরবারীরা ঘোড় সাওয়ার হয়ে পেছন পেছন আসছে।

'কোন বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনা?' আব্দুর রহমান মুদ্দাসসিরাকে জিজ্ঞেস করলেন।'

'কিছুই ঘটেনি।' মুদ্দাসসিরা আনত কণ্ঠে বললো, 'দুআ করতে করতে করাতে করাতে দিন কেটে গেছে। ঐ সব গাদ্দারদের নেতা ইউগেলিস, ইলওয়ার ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বার কি ধরা পড়েছে?'

'হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। ওদেরকে গ্রেফতার করাটা এত সহজ নয়। খ্রিষ্টানরা ওদেরকে লুকিয়ে শহর থেকে বের করে দিয়েছে। শহরের অধিকাংশ লোক যদি মুসলমান হতো তাহলে ওদেরকে ধরাটা সহজ হতো। যারিয়ার ও সুলতানা কেমন ছিলো?'

'ওদের দিকে নজর দেয়ার ফুরসত মিলেনি' মুদ্দাসসিরা বললো, 'আমার মন মগজ সবসময় ছিলো ঐ যুদ্ধের ময়দানে।'

'যারিয়াবদের ঘোড়া সুলতানার শাহী গাড়ি থেকে সামান্য দূর দিয়ে যাচ্ছে। সুলতানা যারিয়াবের দিকে তাকালো। যারিয়াবও এদিকেই তাকিয়ে আছে। সুলতানা ইংগিতে ওকে তার কাছে ঘোড়া নিয়ে আসতে বললো। যারিয়াব তার ঘোড়া সুলতানার শাহী গাড়ির কাছে নিয়ে গেলো।

'দেখছো যাররী?' সুলতানা আব্দুর রহমান ও মুদ্দাসসিরার দিকে ইংগিত করে প্রায় ফিস ফিস করে বললো, 'ঐ শয়তানীটা এখন থেকেই তার কান ভারী করা শুরু করে দিয়েছে। আর তুমি বলছো, ওর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন ভয় নেই!'

দু'জনের কানাঘুষা আব্দুর রহমান দেখতে পেলো না। আব্দুর রহমান নজর এখন মুদ্দাসসিরার দিকে।

'বিদ্রোহের আশংকা কি একেবারেই নির্মূল করা গেছে? মুদ্দাসসিরা আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলো।

'না! এরা আমাদেরকে উন্দলুস থেকে উৎখাত করতে চাচ্ছে। এজন্য ওরা নজিরবিহীন ত্যাগ তিতিক্ষাও দিচ্ছে। ওরা এত সহজে কাবু হওয়ার নয়।'

'যদি এখানকার মুসলমানদের মধ্যে এ ধরণের ত্যাগী মানসিকতা গড়ে উঠতো তাহলে তো যে কোন ধরণের ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ বা নাশকতার ঘটনা আগ থেকেই জানা যেতো।' মুদ্দাসসিরা বললো।

'আমাদের সবচেয়ে বড় আশংকা হলো সেসব মুসলমানের ব্যাপারে, যারা মাত্র কিছু দিন আগে মুসলমান হয়েছে। এরা দু'মুখো সাপ। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ধোঁকা।' আমীরে উন্দলুস বললেন।

'ওরা নিজেদের সুন্দরী মেয়েদেরকে অন্যভাবে ব্যবহার করছে। আপনি অনুমতি দিলে মুসলমান মেয়েদেরকে শহরের ভেতর গুপ্তচর হিসাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গোপনে ওদেরকে সৈনিকি প্রশিক্ষণও দেয়া যায়।' মুদ্দাসসিরা বললো।

'না।'

'কেন? আপনি তো আহত সৈনিকদের শশ্রুষা ও তাদের দেখভাল করার জন্যও মেয়েদেরকো কেন অভিযানে নিয়ে যান না। কেন?' মুদ্দাসসিরা জিজ্ঞেস করলো।

'এতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়।' আব্দুর রহমান বললেন এবং শ্লোগানদাতাদের দিকে ঘুরে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে লাগলেন।

দুই তলার একদালান বাড়ি। দুই তলা হলেও চার তলার সমান উচুঁ। বাড়ির দুই তলার এক খোলা জানায়াল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দারুণ রূপাবর্তী। যৌবনে টাইটুম্বর। জানালা গারদবিহীন। ওদিকে যাদেরই চোখ যাচ্ছে সেই আমীরে উন্দলুস ও তার বাহিনী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই মেয়ের ওপরই চোখ আটকে যাচ্ছে।

প্রতিটি বাড়ির জানালা বা ব্যলকনিতে দু'একজন করে নারী দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির দিকে যার চোখই যাচ্ছে তার চোখ ওখানেই বাঁধা পড়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কোন প্রতিমূর্তি। নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। অন্যান্য নারীরা আমীরে উন্দলুস ও ফৌজকে দেখে হাত নাড়ছে কিংবা শ্লোগান দিচ্ছে। মেয়েটি যখন আমীরে উন্দলুসকে দেখলো তার দু'চোখে ঘৃণা ফেনিয়ে উঠলো।

সে তার কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ পেলো। লোকদের শ্লোগানমুখর ভারি শব্দ, ঘোড়ার খুর ধ্বনি ইত্যাদির মধ্য থেকে তার কানে ভেসে এলো,

' ফ্লোরা।'

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, তার মা দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি ফুল ছিটাচ্ছো না কেন?' তার মা তাকে বললো, 'তুমি হাতও নাড়ছো না।

'ফ্লোরা! এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলে ওখান থেকে সরে আসো। তোমার বাবা নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি যদি দেখেন তুমি ফুলও ছিটাচ্ছো না এবং শাহে উন্দলুসের উদ্দেশ্যে হাতও নাড়াচ্ছো না তখন উপরে এসে তো উনি কেয়ামত ঘটিয়ে দেবেন।'

'আমি তো এসব লোকের ওপর আমার থুথুও ফেলতে লজ্জাবোধ করি।' ফ্লোরা বললো, 'এই লোক ও তার ফৌজের ওপর আমি ফুল ছিটাবো কি করে যারা খ্রিষ্টানদেরকে সমূলে হত্যা করে এসেছে। খ্রিষ্টধর্মের নিরাপত্তার জন্য কি ইসলামকে স্পেনের মাটি থেকে আমাদের উৎখাত করার অধিকার নেই?'

'ভুলে যেয়ো না, তোমার বাবা মুসলমান।' ফ্লোর মা বললো, 'তোমার বাবার যদি সামান্যতম সন্দেহ হয় আমি কেবল নামেই মুসলমান এবং তোমাকে আমি খ্রিষ্ট শিক্ষাই অতি গোপনে দিয়ে এসেছি তাহলে উনি আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবেন।'

'কেন?' ফ্লোরা ঝাঝালো গলায় বললো, 'আমাকে তাহলে কেন খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা দিলে? আর আজ মুসলমানদের ব্যাপারে ঘৃণা প্রকাশ করতে বাধা দিচ্ছো? আমার বাপ যদি তোমার স্বামী না হতো তাকে আমি হত্যা করে ফেলতাম। তিনি তোমার স্বামী এই সত্যটা আমাকে কাটার মতো বিদ্ধ করে যায় প্রতিনিয়ত।'....

'মুসলমানের মেয়ে হয়েও যে আমি ঈসা মাসীহ এর নামে জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্য গোপন সংকল্প করেছি এই সত্য আমি বড় কষ্টে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি। মনে রেখো, আমার জীবন আমি খ্রিষ্টবাদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমার বাপের প্রতি তোমার ভালোবাসার দায়বদ্ধতা তোমাকে শিকলে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু আমি স্বাধীন।'

'হ্যাঁ ফ্লোরা! তোমার বাবার প্রতি এখনো আমার ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু আমি আমার ধর্মের ভালোবাসাও মন থেকে দূর করতে পারিনি।' ফ্লোরার মা উদাস গলায় বললো।

ফ্লোরার মার বয়স তখন আঠার বছর। উন্দলুসের আমীর তখন আলহাকাম। উন্দলুসের এক উপ শহর ক্যথলিনায় ওরা থাকতো। ক্যথলিনার লোকজনের প্রায় নিরানব্বই জনই খ্রিষ্টান।

এখানকার লোকজন খুব দাঙ্গা-ফাসাদ ও ষড়যন্ত্রপ্রবণ। সৈন্যরা কখনো কখনো ওখানে টহলে যেতো। কিন্তু ক্যথলিনার লোকেরা তিন চারবার অযথাই সেনাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়।

ক্যথলিনা এভাবে উন্দলুসের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ও বিদ্রোহীদের গোপন আড্ডার কেন্দ্র হয়ে উঠে।

মাসরূর নামে এক গোয়েন্দা সোর্স একদিন কর্ডোভার এমন এক তথ্য পাঠায় যে, তথ্যের সূত্র ধরে অনেক বড় মানব- বিধ্বংসী এক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোক্ত করে দেয়। মাসরূর খ্রিষ্টানদের ছদ্মবেশে ধারণ করে তাদের চক্রান্তের

খুঁটিনাটি সব জেনে নিয়ে কর্ডোভায় গিয়ে সবকিছু জানিয়ে দেয়। কর্ডোভার প্রশাসন কাল বিলম্ব না করে তখনই এর বিরুদ্ধে এ্যকশনে নামে।

মাসরূর পথ দেখিয়ে সশস্ত্র সেনাদল নিয়ে আসে। ষড়যন্ত্রের আসল হোতাদেরকে গ্রেফতার করে। শহরের প্রতিটি লোকের কাছে তখন একাধিক অস্ত্র ছিলো। ওরা খবর পেয়ে সশস্ত্র হয়ে সেনাদলের ওপর হামলে পড়ে।

সৈন্যরা এ হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। ওখানে মেয়েরাও মুসলিম সৈন্যদেরকে বাড়ির ছাদ থেকে পাথর আর জ্বলন্ত অঙ্গার ছুড়ে মারতে শুরু করলো। বেশ কিছু সৈন্য এভাবে আহত হলো।

কমান্ডার এ অবস্থা দেখে ফৌজকে হুকুম দিলো, কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দাও। যাতে এরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পন করে।

শহরের লোকদের লড়াইয়ের ক্ষিপ্রতা দেখে মনে হচ্ছিলো, এরা বুঝি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত ফৌজ। তখনই ব্যাপারটা পরিস্কার হলো। শহরবাসীর পোষাকে আসলে অসংখ্য ফ্রান্সী ফৌজ লড়াই করছে। যারা আগ থেকেই শহরে এসে গোপন আস্তানা গেড়েছিলো।

মুসলিম ফৌজ যখন কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগানোর হুকুম পেলো তখন তাদের আক্রমণ আরো বেড়ে গেলো। সমানে ওরা আগুন লাগাতে শুরু করলো। অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেলো, অর্ধেক এলাকা ধাউ ধাউ করে জ্বলছে।

লোকদের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় শিশু-বাচ্চারা আগুনের হাত থেকে রেহাই পেলেও নাশকতার কাজে যারা লিপ্ত ছিলো তারা রেহাই পেলো না। সন্ত্রাসী আর চক্রান্তকারীদের অনেকেই আগুনের খেরাক হয়ে গেলো। অধিকাংশ লোকই শহর থেকে পালিয়ে গেলো।

ছদ্মবেশী ফ্রান্সী সৈন্যদের একটাকেও রেহাই দেয়া হলো না।

❃❃❃❃❃

দু' তিনদিন পরের ঘটনা। এ অভিযানের সাফল্যের নায়ক মাসরূর শহর থেকে কোন একটা কাজে বের হলো। পাহাড়ি পথ ধরে সে যাচ্ছে। এসময় এক নারী কণ্ঠের চিৎকার ধ্বনি ভেসে এলো। যে দিক থেকে আওয়াজ এসেছে তার ঘোড়ার রুখ সেদিকে করে নিলো মাসরূর। তিন খ্রিষ্টান ঝান্ডা মার্কা লোককে দেখতে পেলো সে।

তিনজন অতি রূপসী এক যুবতীর কাপড় ধরে টানাটানি করছে। তার সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করছে। তিন জনের ঘোড়া ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছে।

এই তিনজন ফৌজের লোক না হলেও লড়াইয়ে যে বেশ দক্ষতা আছে সেটা দেখেই বুঝা গেলো।

মাসরূর তলোয়ার কোষমুক্ত করে নেয় এবং ওদের দিকে ঘোড়া ছোটায়। তিন জনই রূপসী মেয়েকে বিবস্ত্র করার ব্যাপারে এতই মগ্ন ছিলো যে, এক ঘোড়সাওয়ারের সশব্দে ছুটে আসার কোন শব্দই পেলো না।

ঘোড়া একেবারে ওদের কাছে যাওয়ার পর ওরা টের পেলো। কিন্তু ঘোড় সাওয়ারের তলোয়ারের ফলা ততক্ষণে একজনের বুকে গেঁথে গেছে। মাসরূর তার তলোয়ার বর্শার মতো করে মেরেছিলো।

তারপর মাসরূর ঘোড়া একটু সামনে নিয়ে গিয়ে আবার ঘোরালো। অন্য দু'জন মেয়েটিকে ছেড়ে ঘোড়ার কাছে চলে এলো এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করে নিলো।

মাসরূর তার ঘোড়া নিয়ে ওদের কাছে যেতেই ওরা ওর ডানে বামে গিয়ে তাকে ঘেরাওয়েরে মতো পরিবেষ্টান করে ফেললো।

মাসরূর একজনকে তো তার তলোয়ার দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করতে পারলো। কিন্তু অন্যজন তার পিঠে তলোয়ার দিয়ে এত জোরে মেরে বসলো যে, তার মনে হলো, দেহ বুঝি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। পড়তেও পড়তেও সে নিজেকে সামনে নিলো।

মাসরূর টলতে টলতে তার ঘোড়া এর কাছে থেকে একটু দূরে নিয়ে গেলো। তারপর দু'জনের তলোয়ার পরস্পরের ওপর হামলে পড়লো। মাসরূর তো আগেই মারাত্মাকভাবে আহত হয়েছে। তাই সে ক্রমেই কোণঠাসা হতে লাগলো। মনে হলো তার মৃত্যু অবধারিত।

তারপর ঘোড়া থেকেহ পড়ে গেলো। সেই সওয়রও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। ইতোমধ্যে মেয়েটি মৃত খ্রিষ্টানের একজনের তলোয়ার হাতে নিয়ে সে লোকের পিঠের ওপর সজোরে আঘাত করলো।

তিন খ্রিষ্টান জাহান্নামে চলে গেলো। কিন্তু মেয়েটিকে যে বাঁচিয়েছে সে মারাত্মকভাবে আহত। মেয়েটি তার বিশাল উড়নিকে কয়েক টুকরো করে তার বিভিন্ন ক্ষত স্থান বেঁধে দিলো।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেয়েটি শংকিত কণ্ঠে জানালো, সে একজন খ্রিষ্টান মেয়ে। তার ঘরের লোকেরা কর্ডোভার ফৌজের ওপর বিনা উস্কানিতে হামলা চালিয়ে ছিলো। এ অপরাধে তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে ছাড়া সেই বাড়ির আর কেউ জীবিত নেই। কর্ডোভার সৈনিকরা তাকে নিঃসঙ্গ-নিরুপায় পেয়েও তার দিকে হাত বাড়ায়নি। তাকে ছেড়ে দেয়।

রাতেই সে তাদের এলাকা থেকে পালিয়ে আসে। কোথায় এসেছে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে রাতের অন্ধকারে এর কিছুই সে ঠাহর করতে পারে না

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার রাতটা কেটে যায়। সকালের আলোয় সে দেখতে পায় এই বিজন পাহাড়ি এলাকায় সে একা। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে হাঁটতে থাকে আর হু হু করে কাঁদতে থাকে। তারপরই এক সময় হঠাৎ করে এই তিন খ্রিষ্টান পান্ডা তার ওপর এসে ঝাপিয়ে পড়ে।

❋❋❋❋❋

মাসরূর তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলো।

'লিজা আমার নাম।' মেয়েটি উত্তর দেয়।

'তুমি এখন কোথায় যেতে চাও?' মাসরূর তাকে জিজ্ঞেস করে।

'কোথায় যাবো এ প্রশ্ন তো আমারও। আমার যে কোন ঠিকানা নেই।' লিজা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো।

'তুমি যেখানেই যেতে চাও তোমাকে সেখানে পৌছে দেবো।'

লিজা একথায় মোটেও ভরসা পেলো না। তার মানসিক আত্মবিশ্বাস একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। সে মাসরূরের পায়ে ঝাপিয়ে পড়লো।

'দয়া করে আমাকে একটা আশ্রয় দিন।'

'দেখো! আমি একজন মুসলমান। তুমি খ্রিষ্টান মেয়ে। তোমাকে তো আমার সঙ্গে কোথাও নিয়ে যেতে পারি না। বড় জোর তোমাকে কোথাও আমি পৌছে দিতে পারি। বলো, তুমি কোথায় যেতে যাও।'মাসরূর অসহায় গলায় বললো।

মেয়েটি তবুও জিদ ধরলো। ওকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

'আমার কাছে আমার দেহ ছাড়া আর অন্য কিছু নেই।' লিজা কাঁদতে কাঁদতে বললো। 'আমি তোমার সানে এটাই রাখতে পারি। এর বিনিময়ে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। তুমি কোথাও আশ্রয় দিতে না পারলে আমাকে কোন গির্জার পাদ্রীর কাছে হাওলা করে দাও।'

'তুমি কোন পাপের উপকরণ নও মেয়ে! তুমি এক পবিত্র আমানত।' মাসরূর বললো, 'তুমি অসহায় এবং সঙ্গীহীন মেয়ে। ভয়ে-শংকায় তুমি মরে যাচ্ছো। এ অবস্থায় তোমাকে আমি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারবো না। তুমি এক অসহায় মেয়ে হয়েও যদি তোমাকে স্বত:স্ফূর্তভাবে আমার হাতে তুলে দিতে তাহলে তোমাকে গ্রহণ করতে পারতাম না আমি। বরং তোমাকে তখন ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করতাম।'.......

'কিন্তু তুমি এখন নি:সঙ্গ এবং বিপদগ্রস্ত এক মেয়ে। তোমাকে সহযোগিতা করাও আমার ওপর ফরজ। এখন একমাত্র উপায় হলো, তুমি যদি আমার ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করো তাহলেই তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে রাখতে পারবো। তবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে তোমার নিজ ইচ্ছায়, স্বত:স্ফূর্তভাবে। নিরুপায় হয়ে ইসলামের প্রতি তুমি মুগ্ধ হলেই তুমি ইসলামে দীক্ষিত হতে পারো না।'

লিজা চিন্তায় পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ ভাবার পর তার চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠলো। সে বললো,

'হ্যাঁ, আমি স্বত:স্ফূর্ভাবেই ইসলাম গ্রহণ করছি এবং তোমার মতো পুরুষের হাতেই আমাকে আমি সানন্দে তুলে দিতে পারি। বরং তোমার মতো পুরুষের স্ত্রী হওয়াটা অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার। আমার মতো এমন সুন্দরী যুবতী মেয়েকে এভাবে পেয়েও যে নির্লোভ নির্বিকার থাকতে পারে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে? যে কোন শর্তে আমি আজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকবো।'

মাসরূর দেখলো, লিজার গলায় একটা ক্রুশ ঝুলে আছে। সে ক্রুশটাকে হাতে ধরে এক ঝটকায় তার গলা থেকে ছিড়ে নিলো। তারপর সেটা দূরে ছুড়ে মারলো। লিজা শুধু একবার তার দিকে তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না।

মাসরূর বললো, 'হ্যাঁ, এখন আমার সঙ্গে তোমার যেতে কোন বাঁধা নেই। চলো।'

মৃত তিন খ্রিষ্টানের ঘোড়া ওরা নিয়ে নিলো। লিজাকে একটির ওপর সওয়ার করিয়ে বাকি দুটো সঙ্গে নিয়ে ক্যথলিনার দিকে রওয়ানা দিলো।

ঘোড়ায় চড়ার পর মাসরূরের যখম থেকে আবার রক্ত পড়তে শুরু কলো। তার জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হলো। ক্যথলিনায় পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না। সেখানে এক শল্যচিকিৎসক তাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো।

লিজা জন্মগত সূত্রে খ্রিষ্টান ছিলো। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিও তার পরিবার ছিলো একান্ত অনুগত। কিন্তু হঠাৎ এক ঝড় তার জীবনের সবকিছু উলটপালট করে দেয়।

এক নিরুপায় অবস্থায় স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এক মুসলিম সেনার স্ত্রী হয়ে যায়। মুসলমান হলেও তার মন থেকে খ্রিষ্টবাদ মুছে যায়নি বরং খ্রিষ্টধর্মের প্রতি সুক্ষ্ম এক টান ক্রমেই বাড়তে থাকে। সঙ্গে এই মাসরূর নামক মুসলিম পুরুষটির প্রতিও তার ভালোবাসা গড়ে উঠে।

যে তার প্রাণ বাজি রেখে তাঁকে বাঁচিয়েছে তার প্রতি এক ধরণের অদম্য আকর্ষণ শুরু থেকেই গড়ে উঠে। দুই ভালোবাসার টানাপোড়েন তাকে কখনো স্থির হতে দেয়নি। তাছাড়া তার পরিবারের প্রতিটি লোক যে মুসলমানের হাতে আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়েছে এই দগদগে ক্ষতও সে কখনো ভুলতে পারেনি।

ক্যথলিনা শহরের লোকেরা এমনকি আট পৌড়ে খ্রিষ্টান মেয়েরাও যে অসংখ্য মুসলমান হত্যা করেছে এটা তার মনে একবারও রেখাপাত করলো না। ইসলাম তার মনে তাই কখনোই স্থান পায়নি। তবে তার মুসলমান স্বামীকে তার হৃদয়ের গভীরেই সে স্থান দিয়েছে।

❋❋❋❋❋

লিজা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছে ইসলামকে মনে প্রাণে মেনে নিতে; কিন্তু সে এটা পারেনি। সে দু'মুখো হয়ে রইলো।

এক বছর পর তার একটি মেয়ে হলো। বাবা মাসরূর মেয়ের অন্য কোন নাম রেখেছিলো। সে নাম ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায়নি। মা নাম রাখে ফ্লোরা। তবে বাপ এজন্য কোন প্রশ্ন বা অভিযোগ তুলেনি।

বাপের ধারণা, মা আদর করে তাকে ফ্লোরা ডাকে। ইতিহাসে ফ্লোরা নামেই সে পরিচিত পেয়েছে।

ফ্লোরাকে নিয়ে অনেক ড্রামা-নাটক লেখা হয়েছে। ইংরেজী ও উর্দূ সাহিত্যেও মুসলিম শাহজাদা ও সালাররা তার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। কেউ কেউ তো তাকে কুলুপতরার সঙ্গে তুলনা করেছে।

তবে বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কমই। অসংখ্য অমুসলিম ঐতিহাসিক এবং মুসলিম ঐতিহাসিকও লিখেছেন, ফ্লোরা সেই মেয়ে যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উস্কে দেয়ার এক অপরূপ দেহসর্বস্ব হাতিয়ার।

যে উন্দলুসের খ্রিষ্টানদের দুমুখো আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। ফ্লোরা হয়ে উঠে খ্রিষ্টানদের এক উম্মাতাল আদর্শ।

অল্প সময়ের মধ্যে তার জঙ্গী উস্কানিতে হাজারো খ্রিষ্টান অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেরা আত্মহত্যা করে।

ফ্লোরা যখন লিজার গর্ভে তখন এক রাতে লিজা ঘুম থেকে চিৎকার দিয়ে উঠে পড়ে। তার স্বামী মাসরূর তাকে জড়িয়ে ধরে। পবিত্র কুরআন শরীফের একটি আয়াত পড়ে তাকে ফুঁকে দেয়। তাকে দিয়েও কিছু পড়ায়।'

'আগুন লেগে গেছে, আগুন'। লিজা দু'হাতে তার গাল চেপে ধরে ভীত কণ্ঠে বড় বড় চোখ করে বললো, 'উঠে দেখো, কেউ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষের পোড়া গোশতের গন্ধ পাচ্ছো না তুমি? আহা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

যখন তার ঘুমের ঘোর কাটলো তখন সে তার স্বামীর কোলে শুয়ে হিচকি তুলে কাঁদছে। মাসরূর তাকে বললো,

'গর্ভবর্তী হলে প্রথম প্রথম মেয়েদের অবস্থা এমনই হয়। প্রায়ই দুঃস্বপ্নে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন সে ভয়ে প্রলাপ বকতে থাকে।

ফ্লোরার মা লিজা এই ব্যাখ্যা মেনে নিলো। সে এই স্বপ্ন দেখাকে গর্ভবর্তী জনিত দৈহিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বলে ধরে নিলো।

এর তিন চার রাত পর সে স্বপ্নে গির্জার ঘন্টা ধ্বনি শুনতে পেলো। ঘন্টা ধ্বনি থেকে কেমন মাতম আর শোকের সুর ভেসে আসছে। এই আওয়াজ থেকে ক্রমেই এক আগুনের শিখা বের হচ্ছে। শিখার আলোয় আকাশ কেমন ধূসর রঙা হয়ে উঠেছে। সেটাও ধীরে ধীরে ক্রুশে রূপান্তরিত হলো।

লিজা আগুনের শিখার দিকে হাঁটা দিলো। হাঁটতে হাঁটতে তার বুকে হাত রাখলো। সেখানে রূপার এক ক্রুশের অস্তি টের পেলো। ক্রুশটাকে সে হাতে নিয়ে পরম মমতায় বুকে চেপে ধরলো।

এ সময় তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। দেখলো তার একটি হাত তার বুকের ওপর থির থির করে কাঁপছে। সেখানে ক্রুশ নেই।

তার কয়েক মাস আগের কথা মনে পড়লো। তার স্বামী মাসরূর যখন তাকে তিন খ্রিষ্টান গুন্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করে তখনই তার গলা থেকে ঝুলন্ত ক্রুশটি খুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে। তার কাছে মনে হলো, নিজ হাতেই সে ক্রুশকে অপদস্থ করেছে।

তার সেই স্বামী আজ তার পাশে শুয়ে আছে। এ লোক যদি তাকে জোর জবরদস্তি করে বিয়ে করতো তাকে, তাহলে এই ঘুমন্ত অবস্থাতেই হত্যা করে দিতো। তারপর কোন গির্জায় চলে যেতো। কিন্তু এ লোকের বিরুদ্ধে সে অঙ্গুলিও নাড়াতে পারবে না। তার বিবেকই তাকে সবচেয়ে বড় বাঁধাটি দিবে।

এখান থেকেই তার ভালোবাসা আর স্বপ্নের জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো।

সেদিন থেকে সে সিদ্ধান্ত নেয়, সে মুসলমান নয়, খ্রিষ্টান। তবে তাকে মুসলমানের ছদ্মবেশেই থাকতে হবে। কারণ, সে তার স্বামী মাসরূরকে হারাতে চায় না।

মাসরূরের মতো এমন জীবন সঙ্গি খ্রিষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া বড় দুস্কর। ওর স্বামী যখন ওকে সামান্য সময়ের জন্যও ভালোবাসে তখন সে সবকিছু ভুলে যায়। তার বিশ্বাস, এমন করে কোন পুরুষ কোন নারীকে মাসরূরের মতো ভালো বাসতে পারবে না।

❋❋❋❋❋

মাসরূর কর্ডোভার গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা। কাজের জন্য তাকে অধিকাংশ সময়ই বাইরে থাকতে হয়। সে ঘরে থাকলে তো তার স্ত্রী লিজা নামায পড়ে। তার কাছে কুরআন শরীফের শিক্ষা নেয়। কিন্তু সে বাইরে থাকলে লিজা গির্জার ইবাদত করে।

ওদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই রয়েছে গির্জা। গির্জার ঘন্টা ধ্বনি ভালো করেই শোনা যায়। গির্জার ঘন্টা বাজলে খোলা জানালায় গিয়ে লিজা দাঁড়াতো এবং চোখ বন্ধ করে কল্পনায় সে গির্জায় চলে যেতো।

মাসরূরের দুটি তাগড়া ঘোড়া সবসময় বাড়ির আস্তাবলে থাকে। একটি ঘোড়ার খুঁড়ে কিছু সমস্যা হয়েছে। মাসরূর এক সফরে যাওয়ার সময় লিজাকে বলে যায় কোন সহিসের কাছে যেন ঘোড়াটিকে নিয়ে যায় এবং নতুন খুড় লাগিয়ে আনে।

হাশিম নামে এক লোক কামারের কাজ করে। তলোয়ার, খঞ্জর, বর্শার ফলা ইত্যাদি সে বানায়। সে একজন ভালো সহিসও। মধ্যবয়স্ক। শক্ত-সামর্থ গায়ের গঠন। বেশ সুঠাম দেহী। যদিও কিছুটা খাটো। বেশ মজা করে কথা বলতে পারে। শহরের সবার মধ্যেই তার জনপ্রিয়তা আছে।

লিজা হাশিমের বাড়িতে গেলো ঘোড়া নিয়ে। হাশিম লিজাকে দেখে অমায়িক হেসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'ঈসায়ী?'

'না।' লিজা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললো।

'নও মুসলিম?'

'হ্যাঁ।'

হাশিম ঘোড়া ঠিক করার কাজে লেগে গেলো। কাজও করছে কথাও বলছে। লিজা দেখলো, তার হাতের চেয়ে মুখই চলছে বেশি। দারুণ জমিয়ে কথা বলতে পারে। একটু পরই লিজার মনে হলো, এর কথায় সে দারূণ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছে। যেন সে তাকে অনেক দিন ধরে চিনে।

ধর্ম সম্পর্কে সে কথা বলছে। যেন সে তার মনের কথাই বলছে। হাশিম কামারের কথায় তার মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন অনুভব করলো।

তার ভালবাসা যে এখন দ্বিধা বিভক্ত এটা সে হাশিমকে প্রায় বলেই ফেলছিলো; কিন্তু সে তার মুখের লাগাম টেনে ধরলো। কারণ, হাশিম মুসলমান।

'আঠারো বছর তুমি খ্রিষ্টান ছিলে, হাশিম বললো, 'ভিন্ন এক ধর্ম গ্রহণ করে তোমার কাছে কেমন লাগছিলো? তুমি কি সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেছো?'

'হ্যাঁ, কেন নয়?"

'তোমার থেকে আমি কোন গোপন কথা বের করছি না মেয়ে।' হাশিম বললো, 'কঠিন এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে আমার। আমিও খ্রিষ্টান ছিলাম। যে কোন কারণে আমি মুসলমান হয়েছি। অনেক আগের কথা এটা। মুসলমান তো হয়েছি। কিন্তু খ্রিষ্টবাদকে মন থেকে নামাতে পারছিলাম না। বহু কষ্টে নতুন ধর্ম মন মগজে ঢুকিয়েছি। রাতে চোখ বুঁজলেই গির্জার ঘন্টা কানে বাজতে থাকতো।'

'আমি এখন এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি।' লিজা বললো, 'আমার দুশ্চিন্তা হলো, আমার পূর্ব ধর্মের টান মন থেকে দূর করতে পারছি না।'

হাশিম তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। মেয়েটি বড় আনকোড়া। এ ধরণের মানুষের পাল্লায় সে কখনো পড়েনি।

তার স্বামী তাকে কোন একদিন বলেছিলো তার পেশা সম্পর্কে যেন কেউ জানতে না পারে। গোয়েন্দা বৃত্তির পেশা সাধারণ মানুষের কাছে গোপনই রাখা হয়। সে গোয়েন্দা হলেও লোকে তাকে সরকারি তথ্যলেখক বলে জানতো।

স্বামীর বারণ এই হাশিমের সামনে এসে ভুলে গেলো। সে বলে দিলো, তার স্বামী সরকারি গোয়েন্দা খ্রিষ্টানদের।

'ক্যথলিনিয়ার বিদ্রোহ আমার স্বামীর গোয়েন্দা অভিযানই ব্যর্থ করে দেয়। আমীরে উন্দলুস তাকে অনেক বড় পুরস্কারও দেন।' লিজা গর্বিত কণ্ঠে বললো।

'এটা কেন বলছো না ক্যথলিনিয়া খ্রিষ্টানদের নির্বিচারে হত্যা ও বাড়ি ঘরে আগুন দেয়ার কাজ তোমার স্বামী করিয়েছে?' হাশিম বললো।

'এটাই তো হওয়ারই ছিলো।' লিজা বললো, 'সাধারণ খ্রিষ্টানরা ফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়েছিলো। মেয়েরাও দালান কোঠার ছাদে চড়ে মুসলিম ফৌজের ওপর জ্বলন্ত কাঠের লাকড়ি ছুড়ে ছুড়ে মারছিলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত অঙ্গার ও পাথারও নিক্ষেপ করেছিলো। অনেক ফৌজ আমাদের হাতে আহত নিহত হয়। তাহলে কেন ওরা খ্রিষ্টানদেরকে ওপর হামলা চালাবে না?'

'তুমি তো দেখি মুসলমানদের পক্ষেই বলছো।'

❋❋❋❋❋

'হ্যাঁ,' লিজা বললো, 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে তো আমি কথা বলতে পারি না। কারুণ, তুমিও মুসলমান। তাছাড়া আমার স্বামী আমাকে তিন হিংস্র খ্রিষ্টানের হাত থেকে রক্ষা করেছিলো। তা না হলে ধর্ষিতা হয়ে তাদের হাতে আমাকে মরতে হতো।'

লিজা হাশিমকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললো,

'আমার ইযযত-আবরু বাঁচাতে সে তার জীবন বাজি রেখে ওদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিলো। তারপর যখন আমি নিজে আমার ইযযত তার সামনে পেশ করলাম সে আমার দেহের দিকে চোখ তুলেও তাকালো না; আমাকে গ্রহণ করবে তো দূরের কথা। বলতে লাগলো, তুমি তো এখন আতংকগ্রস্ত এক অক্ষম মেয়ে। আমার সঙ্গী হতে চাইলে তোমাকে আমার পরিণয়ে আবদ্ধ করতে পারি। আমি তাকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছি।'

'ও তো মনে হয়ে তোমাকে তার দাসীর চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না।'

'না, তার মনের রানী আমি। আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেলে ও আমাকে বুকের সঙ্গে এমনভাবে চেপে ধরে যেমন শিশু কালে ভয় পেলে মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে।' লিজা বললো।

'স্বপ্নে কেন ভয় পাও?' হাশিম জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যখন নতুন মুসলমান হই আমিও স্বপ্নে ভয় পেয়ে যেতাম। প্রথম প্রথম এমনই হয়। দুই ধর্ম নিয়ে মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে যায়। আমার মনে হয় তুমি এখন তেমন অবস্থার ভেতর দিয়েই যাচ্ছো।'

'হ্যাঁ, আমি সে অবস্থার ভেতর দিয়েই যাচ্ছি।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে অযথা ভয় পেয়ো না। আমি মুসলমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি মানুষও। সব মানুষের মনই এক রকম হয়ে থাকে। সে মুসলমান হোক বা খ্রিষ্টান হোক। আমাকে যদি সাধারণ একজন কামারই মনে না করে থাকো তাহলে তোমার মনের দুঃখ আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারো।'.....

'আমি যদি আমার সম্পর্কে কিছু বলি তাহলে হয়তো তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। ঘর যেমন তোমার জ্বলেছিলো তেমন আমারও জ্বলেছিলো। এটা টলয়টার ঘটনা। তখন বর্তমান আমীরে উন্দলুসের পিতা আলহাকাম ছিলেন আমীরে উন্দলুস।'

'এটা ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের কথা। টলয়টার খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহ করে বসে। আলহাকাম বড় কঠোর হুকুম জারি করেন। সারা শহরে আগুন লাগিয়ে দেন।'

'ক্যথলিনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে যা হয়েছিলো এখানেও তাই হয়। সৈন্যরা শহরের বাড়ি-ঘরগুলোতে আগুন লাগাতে শুরু করলো। আমার ঘরে যখন আগুন লাগাতে আসলো আমি তাদেরকে বললাম, আমি মুসলমান। নওমুসলিম। তারা বললো, তুমি মুওয়াল্লিদ।'

'মুওয়াল্লিদের অর্থ জানো? আরবী শব্দ। অর্থ দু'মুখী। অর্থাৎ যে এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে; কিন্তু গোপনে পূর্ব ধর্মের প্রতি অনুগত থাকে। আমি সৈনিকদেরকে বললাম, আমার বাড়ি তল্লাশি করে দেখো। কুরআন শরীফ ছাড়া ভিন্ন ধর্মের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাবে না।'

'কিন্তু ওরা আমার কথা বিশ্বাস করলো না। আমার ঘরের বাইরে বিদ্রোহীদের হাতে লেখা একটা লিফলেট পেলো। এতেই ওরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিলো আমি শুধু মুওয়াল্লিদই নয়, বিদ্রোহীও।'

'অনেক নওমুসলিমই মুওয়াল্লিদ ছিলো এবং এটাও ঠিক যে, ওরাই বিদ্রোহের আগুন উস্কে দিয়েছে। সৈনিকরা আমার ঘরেও আগুন দিলো। আমার স্ত্রী ও দুই সন্তান ঘর থেকে বের হলেও ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে

চরমভাবে আহত হয়। পরে আর ওদেরকে মুসলিম ডাক্তাররাও শত চেষ্টা করে বাঁচাতে পারেনি।'

'ঘর হারা-স্বজনহারা এক নিঃস্ব মানুষ হয়ে গেলাম আমি। তারপর এ আশায় কর্ডোভায় এলাম, কোন হাকিমের মাধ্যমে আমীরে উন্দলুসের দরবারে গিয়ে আমার অসহায়ত্বের কথা জানাবো। তাকে আমি ফরিয়াদ জানিয়ে বলবো, আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু মহল পর্যন্ত পৌছার কোন প্রভাবশালী মাধ্যম আমি পেলাম না।'

'আল হাকাম ছিলেন বিলাসপ্রিয় বাদশাহ। তার দরবার ভরে থাকতো চাটুকারদের দলে। গায়করা গান করলে তারই প্রশংসাগীত গাইতো। কবিরা কবিতা রচনা করতো তাকে খোদার স্তরে পৌছে দিয়ে। প্রজারা বাঁচুক মরুক তাতে তার কিছু আসে যায় না। আমাকে বেঁচে থাকতে হতো। কামারের কাজ জানতাম, তাই এটাই শুরু করে দিলাম।'

'এখন তোমার অবস্থা কী?' তুমি এখন কী চাও'? লিজা জিজ্ঞেষ করলো।

'দেখো মেয়ে! আমাকে আমার ব্যাপারে বেশি প্রশ্ন করো না। তুমি এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার স্ত্রী। তোমার স্বামীর কানে যদি আমার কথা সামান্য পৌছে তাহলে আমাকে গ্রেফতার করা হবে।'........

চার দিকে চক্রান্ত ও বিদ্রোহ দানা বাঁধছে। যাকেই সামান্যতম সন্দেহ হয় তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। একটা কথা মনে রেখো, তোমার স্বামীর গোয়েন্দার কথা আমাকে বলে তুমি খুব ভুল করেছো। গোয়েন্দারা নিজেদেরকে পর্দার আড়ালে রাখে।'....

'তুমি আমাকে তোমার স্বামী সম্পর্কে বলে দিয়েছো খবরদার সেটা কিন্তু তাকে আবার বলতে যেয়ো না। অন্য কাউকেও জানাবে না এসব কথা। আমি তোমাকে বলছিলাম, সেসব কথা তোমার স্বামীকে বলতে পারছো না সেগুলো আমাকে বলতে পারো। তোমাকে আমি আমার মেয়ে বা বোনের মতোই দেখবো। আমি যেহেতু ক্ষত-বিক্ষত মনের মানুষ তাই তোমার মনের দুঃখ আমিই বুঝতে পারবো।'

'তুমি তো আবার আমার স্বামীকে বলে দিবে না তার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করেছি?'

'না, আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না। তোমাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি নিয়মিত আমার কাছে আসা যাওয়া করো। আমি একাই থাকি। দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই। সত্য বলতে কি আমার কোন ধর্মও নেই।'

'মুসলিম সেনারা আমার সঙ্গে যা করেছে তা হয়তো আমি কোন দিন ভুলতে পারবো না। দেখা যায়, ধর্মের সব বাধ্যবাধকতা প্রজাদের জন্যই। শাসকরা এ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত-স্বাধীন রাখেন। মুসলমানদের মধ্যে এখন এসবই ঘটছে। উন্দলুস বিজয়ীরা বলেছিলো, ইসলামকে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু এখন এরা উন্দুলুসেও টিকতে পারেছ না।'

লিজা তার ঘরে ফিরলো এই অনুভূতি নিয়ে হাশিম শুধু কামার নয়, তার কাছে এমন কিছু আছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই।

❋❋❋❋❋

উন্দলুসের প্রায় সব ঐতিহাসিকদের লেখাতেই হাশিমের উল্লেখ আছে। মধ্য অবয়বের লোক হলেও তার মা ছিলো বেশ উচ্চ বুদ্ধির। সে প্রথমে মুওয়াল্লিদ ছিলো না। তবে মুসলমানদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ তাকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তার কাছে খ্রিষ্টান মুসলমান সব ধরণের ক্রেতাই আসতো।

সে বেশ কিছু খ্রিষ্টানের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে নেয়। তাদেরকে নিয়ে সে এক গোপন দল গড়ে তুলে। এরা ক্রমেই মুওয়াল্লিদ আন্দোলনকারীদের অন্যতম বাহুতে পরিণত হতে লাগলো।

হাশিম তার দলের প্রত্যেক সদস্যকে লিজার স্বামী সম্পর্কে সতর্ক করে দিলো। তার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। না হয়, যে কোন সময় ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লিজা এখন নিয়মিতই হাশিমের ওখানে যাচ্ছে। সে একদিন হাশিমকে বললো,

'আমার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই নয়, এটা বড় স্পষ্ট এক ইশারাও।'

'হ্যাঁ, এটা সত্যিই এক খোদায়ী ইশারা। তবে তোমার স্বামী যেন টের না পায় যে, তোমার মনে ইসলামের কোন ভালোবাসা নেই।' হাশিম বললো, 'তুমি এখন আর এই স্বামী থেকে মুক্ত হতে পারবে না। মুক্ত হতে চেষ্টা করলে মারা পড়বে।'

'আমি আমার স্বামী থেকে মুক্ত হতেও চাই না।' লিজা বললো। 'খ্রিষ্টবাদকে আমি যতটুকু ভালবাসি, মাসরূরকেও আমি ততটুকুই ভালোবাসি। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে থেকেই খ্রিষ্টবাদের জন্য কিছু একটা করতে চাই। নইলে এই স্বপ্ন আমাকে পাগল করে দেবে।'

'তুমি তোমার সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছো। সে মেয়ে হোক ছেলে হোক, যেভাবেই হোক লুকিয়ে ছাপিয়ে ওকে ঈসায়িয়্যাতের শিক্ষা দেবে। হাশিম গম্ভীর গলায় বললো, 'ওর মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টি করে দেবে এবং তাকে সব ধরণের স্বাধীনতা দেবে। তবে এরপরে কোন সন্তান জন্মালে তাকে আবার এ শিক্ষা দেয়ার ঝুঁকি নেবে না। তাহলে ওর বাবা সেটা জেনে যাবে। সেটা নিশ্চয় তোমার জন্য ভয়াবহ ব্যাপার হবে।'....

' যে সন্তানকে তুমি খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা-দীক্ষা দেবে সে নিজের রাস্তা নিজেই তৈরি করে নেবে। সেটাই তোমার মনের প্রশান্তির খোরাক জোগাবে।'.........

'তুমি কিছু করতে চাইলে এটা করতে পারো তোমার স্বামীর কাছ থেকে যতটা পারো গোয়েন্দা তথ্য কলা কৌশলে জেনে নিতে পারো। ওকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাও। আমাদের ব্যাপারে কোন তথ্য যদি জানতে পারো সেটা যত দ্রুত সম্ভব আমাদের কানে পৌছে দেবে।'

লিজার স্বামী মাসরূরের মতো এমন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা- যার দৃষ্টি মাটির গভীরতাকেও ভেদ করে যেতো তারও এতটুকু সন্দেহ হলো না যে, তারই ঘরে তারই ভালোবাসার পর্দার আড়ালে ইসলামের এক চরম ঘাতিনী-কালনাগিনী পরিপালিত হচ্ছে।

ফ্লোরার জন্ম হলো! তার বাবা যে তার ইসলামী নাম রেখেছিলো সেটা ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায় না। তার মা-ই তার নাম রাখে ফ্লোরা। ফ্লোরা যখন কিছুটা বুঝতে শিখলো তখন থেকেই তার মা তাকে বুঝাতে শুরু করলো, সত্য ধর্ম একমাত্র ঈসা মাসীহের ধর্ম। আর ইসলাম কোন ধর্মই নয়।

ফ্লোরার এক বছর হতেই তার আরেকটি ভাই হলো। তার নাম রাখা হলো বদর। বদর শৈশব থেকেই তার বাবার প্রভাব গ্রহণ করা শুরু করলো।

তের চৌদ্দ বছর বয়সে ফ্লোর মন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা পূর্ণ হয়ে গেলো যে, সে তার বাপকে বাপ এবং ভাইকে ভাই মনে করা ছেড়ে দিলো।

খ্রিষ্টান মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে খ্রিষ্টানদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের আজগুবি গল্প-কাহিনী শোনাতো। ফ্লোরার মা লিজা এগুলো শোনাতো তার মেয়েকে।

তবে মা ফ্লোরাকে বাইরে বের হতে দিতো না। ভয় হলো, সে তার মার দু'মুখো মুখোশের কথা ফাঁস করে দিবে।

ফ্লোরা এখন আঠার বছরের আগুন ধরা অতি রূপবর্তী এক মেয়ে। খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান ও তার ফৌজের বিজয় রথ দেখছে। বহু লোকের দৃষ্টি ফ্লোরার রূপসী মুখে আটকে গেছে।

তার চোখে ঘৃণা আর ক্ষোভ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। মা তাকে বারবার বলছে। সে যেন অন্যান্য মেয়েদেতর মতো নীচে ফুল ছুড়ে দেয়, হাত নাড়ে। ফ্লোরা মায়ের কথায় তার দিকে আগুন চোখে তাকালো। সব রাগ ঘৃণা মায়ের ওপর ঢেলে দিয়ে বললো,

'যারা মারীদার খ্রিষ্টানদের পাইকারী দরে হত্যা করেছে তাদের ওপর আমি ফুল বর্ষণ করবো?'

'তোমার রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করো ফ্লোরা।' মা বললো।

'মা! আমি আর এখন এই ঘরে থাকতে পারবো না।' ফ্লোরা জানালার কপাট বন্ধ করতে করতে বললো।

'আরে বোকা! তুমি যাবেই বা কোথায়?' মা বললো।

'কোন গির্জায় চলে যাবো। আমি যদি এই বাড়িতে থাকি তাহলে যেকোন সময় আমার বাপ-ভাইকে হত্যা করে ফেলবো।' ফ্লোরা বললো উত্তেজিত কণ্ঠে।

মা তার মুখে সজোরে চড় মারলো এবং বললো,

'আমি তোকে খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা কি এজন্য দিয়েছি যে, তুই তোর বাপ-ভাইকে কতল করার কথা মুখে আনবি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফ্লোরা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, এ শিক্ষা আমাকে তুমিই দিয়েছো যে, মুসলমানরা অতি হিংস্র এবং লুটেরা। ওরা খ্রিষ্টানদের চির শত্রু।'

মায়ের দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। নিজের ভুলের উপলব্ধি তার একটু একটু করে অনুভূত হতে লাগলো।

'আমি তো তোকে খ্রিষ্টান এজন্যই বানিয়েছি যে, তোকে কোন খ্রিষ্টান ছেলের হাতে গোপনে তুলে দেবো। সে তোকে বিয়ে করে পালিয়ে যাবে।' মা বললো, 'আমি তো শুধু আমার এক সন্তানকেই খ্রিষ্টান বানাতে চেয়েছিরাম। আর তুই তো আমাকে তোর বাপ থেকে চিরতরে বিচ্ছিণ্ন করে ছাড়বি।'

'আমি খ্রিষ্টান মা! খ্রিষ্টান আমি। এটা মুসলমানের বাড়ি। এই বাড়িকে আমি ঘৃণা করি।' ফ্লোরা বললো উত্তপ্ত কণ্ঠে।

এসময় কামরায় এক পুরুষ কণ্ঠের গর্জন শোনা গেলো, 'কি বললি তুই?' তুই খ্রিষ্টান?'

মা মেয়ে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালো। সেখানে ফ্লোরার ছোট ভাই বদর দাঁড়িয়ে ফনা তোলা সাপের মতো ফুঁসছে। সে যে সিড়ি ভেঙ্গে ওপরে এসেছে সেটা মা মেয়ে কেউ টের পায়নি। সে মায়ের কোন কথা শুনতে পায়নি। ফ্লোরার কথা 'আমি খ্রিষ্টান' শুধু এতটুকুই শুনেছে।

বদরের বয়স সতের বছর। এই বয়সেই বাপের মতো বিশালকায় হয়ে উঠেছে। দেখতে বেশ তাগড়া সুদর্শন যুবক। সে মা ও মেয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

'ও' অন্য কারো কথা বলছিলো বেটা! আমি তোমাকে বলছি'। মা বদরকে বললো।

'আমি ওকে বলছি' ফ্লোরা বললো, 'তুমি মিথ্যা বলছো মা!' সে বদরের দিকে ফিরে বললো, 'আমি সত্যিই খ্রিষ্টান। আমি আমার ধর্মের হত্যাকারীদের ধর্ম কখনোই গ্রহণ করতে পারবো না।'

একথা বলে ফ্লোরা ইসলামের বিরুদ্ধে অতি অপমানসূচক কিছু কথা বলে ফেললো। বদর রাগে লাল হয়ে উঠলো। ফ্লোরার মুখে এত জোড়ে চড় বসিয়ে দিলো যে, সে ছিটকে গিয়ে ঘরের দোয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেলো এবং পড়ে গেলো।

মেয়েদের মতো ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি বা অভিমান কিছুই করলো না সে।

ফ্লোরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো এবং অন্য কামরার দিকে দৌড়ে গেলো। সে কামরার একটি তলোয়অর ও দুটি বর্শা রাখা আছে।

বদর ও তার পিছু পিছু সে কামরায় ছুটে গেলো। ফ্লোরা খাপ থেকে তলোয়ার বের করছিলো। বদর তার হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে এমন শক্ত পিটুনি দিলো যে, ফ্লোরা খাটের ওপর গড়িয়ে পড়লো। মা ও ফ্লোরার আরেক বোন যার বয়স পনের, দু'জনে মিলেও বদরকে নিরস্ত্র করতে পারলো না। ফ্লোরা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলো। তার মা হাউমাউ করে তার ওপর গড়িয়ে পড়লো।

❋❋❋❋❋

বদর তার মাকে সেখান থেকে টেনে তুললো এবং মাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর দরজায় শিকল চড়িয়ে দিলো। অন্য ঘরে গিয়ে মাকে সামনে বসালো।

'মা! খ্রিষ্টবাদের ব্যাপারে ওর মনে এমন গোঁড়ামি কোত্থেকে আসলো?' বদর জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো মা! মা মেয়ের সবকিছুই জানে।'

বদর তার বোনকেও জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি কিছু বলতে পারবে?'

ওর ছোট বোন কিছুই জানে না বলে বললো। মাও একই জবাব দিলো।

'তুমি কিছুই জানো না এতটুকু জবাব দিয়েই কি বাবাকে তুমি সন্তুষ্ট করতে পারবে মা!' বদর বললো, 'নিশ্চয় গোপনে কোন খ্রিষ্টানের সঙ্গে ওর সাক্ষাত হয়েছে। কোন মুসলমানের সঙ্গে ওর সম্পর্ক থাকলে সে নিশ্চয় বলতো, খ্রিষ্টানদেরকে কেন এভাবে হত্যা করা হয়েছে? আর এটা পাইকারি দরে হত্যা নয়, বরং এটা ছিলো দু'পক্ষের যুদ্ধ। ওরা ওদের ধর্মের পক্ষে লড়াই করেছে। মুসলমানরাও নিজেদের ধর্মের পক্ষে লড়াই করেছে।'

'ওদের কাছে যেমন অস্ত্র আছে তেমনি আমাদের সেনাবাহিনীর কাছেও অস্ত্র আছে। মারীদায় কী হয়েছিলো? তোমার জন্মভূমি ক্যথলিনিয়ার কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলে। ওখানে আগে কারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলো? টলায়টায় কী হয়েছিলো?.....

'আমরা মুসলমান মা! মুসলমানের দায়িত্ব হলো, ইসলামকে সবার কাছে বিস্তার করা। পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে হুকুম দিয়েছে, কুফুরের ফেতনা খতম করতে লড়াই করে যাও যে পর্যন্ত ওদরে তৎপরতা অব্যহত থাকবে।'

কান্না ছাড়া ওর মা আর কোন জবাব দিলো না।

'আব্বু কাল সকালেই আসছেন। এর আগ পর্যন্ত ও ওখানেই বন্ধি থাকবে।' বদর তার মাকে বললো।

সে রাতের ঘটনা। ফ্লোরা সে কামরায় বন্ধ। রাতে ওর ছোট বোন খাবার নিয়ে গিয়েছিলো। ফ্লোরা খাবার খায়নি। সে বলে দেয়, এ বাড়ির খাবার তো দূরের কথা পানিকেও সে হারাম মনে করে। ওর মাও একবার চেষ্টা করে দেখেছে। ফ্লোরা খায়নি।

রাতে সে ঘুমায়নি। মাঝ রাতের দিকে উঠে বন্ধ দরজায় কান লাগালো। সে কামরায় তার মা বোন ও পাশের কামরায় তার ভাই ঘুমুচ্ছে। তাদের ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফ্লোরা ঘরের জানালার পাল্লা খুললো। পাল্লায় লোহা বা কাঠের গারদ।

এটা দ্বিতীয় তলা। এখান থেকে নিচে নামা ওর জন্য বেশ কঠিন ব্যাপার। জানালা বরাবর সোজা নিচের দিকে একটু পর পর কিছু ইট বেরিয়ে আছে। বাড়তি ইটের মধ্যে পুরো পা রাখা যাবে না। বাড়তি ইটে পায়ের পাতা মাত্র রাখা যাবে।

ফ্লোরার এখন আর মরার ভয় নেই। সে তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে জানবাজি রাখার সংকল্প করে নিয়েছে। সে খুব সাবধানে অতি ধীরে ধীরে খাঁজ কাটা ইটগুলোতে পা রেখে রেখে এবং দেয়ালের খাজে ধরে ধরে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলো।

একেবারে লাগোয়া বাড়িটি এক তলা। সে এবাড়ির ছাদে পৌছে গেলো। এখন কাজ হলো এখান থেকে নামা। সে ওপর থেকে বাড়ির উঠানের অবস্থা দেখে নিলো। কাঠের একটি সিড়ি রয়েছে। পূর্ণ চাঁদনী রাত। চাঁদের আলোয় এ সিড়ি দিয়ে সহজেই নিচে নামা যাবে। তারপর উঠোন পেরিয়ে গেট খুলে বাইরে চলে যাওয়া যাবে।

এই বাড়িতে এক বৃদ্ধ মুসলমান ও তার স্ত্রী এবং তার এক যুবক ছেলে থাকে। ভয় এই যুবক ছেলেটিকে নিয়ে। ফ্লোরা তার জামার নিচে একটি খঞ্জর নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটা দিয়ে এমন তাগড়া যুবকের বিরুদ্ধে লড়া প্রায় অসম্ভব।

হঠাৎ তার সামনে থেকে মূর্তিমান এক আতংক উঠে আসতে লাগলো। এই যুবক ছেলে সম্ভবত ছাদে কারো পায়ের আওয়াজে জেগে উঠেছিলো। কিংবা বিনা কারণেই হয়তো সে ছাদে আসছে। যুবক সিড়ির কাছে আসতেই ফ্লোরা পিছু হটতে গেলো।

কিন্তু যুবক তাকে দেখে ফেললো। যুবকটি এও দেখেছে এ কোন পুরুষ নয়, মেয়ে। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে লাগলো। ফ্লোরার মাথাটা ঘুরে গেলো। পালানোর কোন পথ নেই।

আচমকা একটা কথা তার সাহস বাড়িয়ে দিলো। যুবক সিঁড়ি বেয়ে আসছে। ফ্লোরা পা টিপে টিপে দ্রুত সিঁড়ির কাচে চলে গেলো। সিঁড়ির হাতল ধরে মুখ ও মাথা ঝুঁকিয়ে ফিস ফিস করে বললো,

'বেশি শব্দ করো না। আমি ফ্লোরা!'

ফ্লোরা?' নামটা শুনেই লোকটা চমকে উঠলো। 'এসময় তুমি এখানে কী করছো?

'ওপরে এসো বেওকুফ! মুখ বন্ধ রাখো।' ফ্লোরা ফিস ফিস করে বললো।

ফ্লোরা জানে সে অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ে। এধরনের ছেলেরা তাকে দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারে না। এই যুবক তো ওকে এর আগে অনেকবারই দেখেছে। তবে দূরে থেকে।

এই প্রথম ওকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। যুবকের চোখে মুখে চরম ক্ষুধার ভাব ফুটে উঠলো। এই মধ্য রাতে একলা ফ্লোরা তো তার দয়ার ওপরই বেঁচে থাকবে।

'কেন এসেছো?'

'তোমার সাথে দেখা করতে।' ফ্লোরা বললো এবং যুবকের ডান হাত তার দু'হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেলো এবং আবেগী গলায় বললো, নিজের মনে অনেক পাথর চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমার ভালোবাসাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারিনি।

'এই মাত্র ঘুমে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। চোখ খুলেই টের পাই ভীষণ ঘাবড়ে গেছি। জানি না কিসে আমাকে ওই জানালা দিয়ে নামিয়ে তোমাদের ছাদের ওপর রেখে গিয়েছে। এসো কাছো এসো।'

ফ্লোরার রূপ যৌবনের তীব্র আচ এই উঠতি যুবক কি করে সহ্য করবে। তার সব বোধ বুদ্ধি নিমিষেই উড়ে গেলো। ফ্লোরাকে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। ফ্লোরা তাকে বললো,

'চলো, বাইরে চলো। আমাদের বাড়ির কেউ জেগে উঠল বড় বিপদ সামলাতে হবে। আর তোমার বাড়ির লোকজনের সামনেও পড়া যাবে না। তাই তাড়তাড়ি চলো।'

দু'জনে সিড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

যুবক খুব সাবধানে বাড়ির প্রধান দরজা খুললো। তার বৃদ্ধ মা-বাবা মোটেও টের পেলো না। দু'জনে বের হয়ে গেলো। সে আগে এবং ফ্লোরা পেছনে।

'কোথায় যাবে?' যুবক জিজ্ঞে করলো।

'ঐ দিকে।' ফ্লোরা একদিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলো।

যুবক সেদিকে হাটা দিলো। ফ্লোরা তার এক দুই কদম পেছনে। সে খাপ থেকে জ্ঞখঞ্জর বের করে নিলো। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে তার দিকে ঘোরালো। যুবক ভেবেছে, মেয়েটি বুঝি তাকে ভালবেসে তার দিকে আকর্ষণ করেছে। এজন্য সে ফ্লোরার স্পর্শ পেতেই আবেগে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

কিন্তু ফ্লোরা বিলম্ব না করে তার কাজ সেরে ফেললো। যুবকটি তার দিকে ঘুরতেই খঞ্জরটি সজোরে তার বুকে বিদ্ধ করে দিলো। এত জোড়ে খঞ্জর তার বুকে বিদ্ধ করেছে যে সেটা টেনে খুলতে ফ্লোরার বেশ জোর প্রয়োগ করতে হলো।

যুবকের মুখ থেকে একটু ভোঁতা শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ বেরোলো না। সে বুকে হাত রেখে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো।

'তোমাদেরকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা... ঘৃণা...।

ফ্লোরা রক্ত ভেজা খঞ্জরটি মাটিতে ঘষতে ঘষতে বললো এবং লাশের গায়ে লাথি মেরে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো।

❋❋❋❋❋

আমীরে উন্দলুসের মহলে এই মধ্য রাতেও যেন রাত নামেনি। ভেতরে রঙবেরঙের ফানুস আর চোখ ধাঁধাঁনো আলোক সজ্জা রাতকে দিনে রূপান্তরিত করেছে। প্রথমে তিন কবি পালা করে আমীরে উন্দলুসের নামে কবিতা আবৃত্তি করলো। তাকে সপ্ত মহাদেশের বাদশাহ বানিয়ে দিলো। তার তলোয়ারকে হযরত আলী র. এর তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হলো।

বলা হলো, ইহুদী-খ্রিষ্টান তো আপনার সামনে কীটপতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাদেরকে আপনি পায়ে পিষ্ঠ করে এগিয়ে চলেছেন দূরন্ত গতিতে।

একজন বললো, আপনার সামনে যে মাথা তুললো তার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেলো। যদি আপনার প্রতিমূর্তি পেতাম তাহলে আমারা তার ইবাদত করতাম।

তারপর চাটুকার আমীর-উমারারা তোহফা পেশ করলো। তার হাত চুম্বন করলো। কেউ তার জুতাকেও চুমু খেলো। তারপর অর্ধউলঙ্গ নর্তকীরা নৃত্য পরিবেশন করলো। এর সঙ্গে চললো যারিয়াবের উম্মাতাল করা সঙ্গীত।

আব্দুর রহমানের ডান দিকে সুলতানা এবং বাম দিকে মুদ্দাসসিরা বসেছে। তাদের পেছনে অন্যান্য স্ত্রী ও হেরেমের রূপসী কিছু মেয়ে বসে আছে। এই উৎসব সভায় সেনাবাহিনীর সব সালারও আছে। তারা অপলক চোখে তাদের আমীরকে দেখছে। তাদের কাছে মনে হচ্ছে এই আব্দুর রহমান অন্য কোন মানুষ।

‘এই লোককে আমাদের সবসময় রণাঙ্গনেই ধরে রাখতে হবে।’ সালার আব্দুর রউফ তার সঙ্গী সালারদেরকে বললেন।

‘তার মতো ইসলামী সালতানাতের আমীরের এভাবে ভোগমত্ততায় ডুবে থাকা কখনো বৈধ হতে পারে না।’ সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন, ‘এসব কবি আর চাটুকাররা এই একজন মানুষের ওপর নিজেদের অসংখ্য শব্দ জাদু দিয়ে নেশাগ্রস্ত করছে আর ইসলামী সালতানাতের শিকড় উপড়ে ফেলছে। তোমরা দেখো গিয়ে আমাদের দুশমনরা পরিকল্পনা করছে, কিভাবে প্রতিশোধমূলক আঘাত হানা যায়। ওরা মদ আর নর্তকী নিয়ে মাতলামি করছে না।’

‘আমার তো মনে হচ্ছে, এবার টলয়টায় খ্রিষ্টানরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।’ সালার মূসা ইবনে মুসা বললেন, ‘এখন থেকেই আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রাখতে হবে। বিদ্রোহ হলে কী উপায়ে তা দমন করা হবে।’

‘এরা মাথা চাড়া দিয়ে যাতে না উঠতে পারে এর জন্য এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে’। সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন, ‘এর একমাত্র উপায় হলো, ফ্রান্সের ওপর হামলা। শাহ লুইকে খতম করা। সেই উন্দলুসের খ্রিষ্টানদেরকে গোপনে মদদ জুগিয়ে যাচ্ছে। সেই উন্দলুসকে খন্ড বিখন্ড করার ঘৃণ্য চক্রান্তের জাল এখানে বিস্তার করে চলেছে। এদেরকে এক জায়গায় দমন করা হলে আরেক জায়গায় গিয়ে মাথা তুলে।’

❋❋❋❋❋

এ দিকে যখন আমীরে উন্দলুসের দরবারে মদমত্ত নতর্কীদের উদ্দাম নৃত্য চলছে তখন হাশিম কামারের দরজার কড়া নড়ে উঠলো। হাশিম কামার এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছে। তবে তার মাথা এখন আরো তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে।

তার গোপন সন্ত্রাসীদল এখন আরো বড় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মারীদার বিদ্রোহ দমনের পরই তার সন্ত্রাসী বাহিনীর এক অংশকে সে টলয়টায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

দরজায় আওয়াজ শুনে হাশিম চমকে উঠলো। বিছানার নিচ থেকে খঞ্জর বের করে সাবধানে দরজা খুললো। গভীর রাতে তার দরজায় এক যুবতী মেয়েকে দেখে হকচকিয়ে গেলো।

'আমি ফ্লোরা হাশিম! ফ্লোরা একথা বলে ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বললো,

'পাশের বাড়ির এক মুসলিম যুবককে খুন করে এসেছি। আর ঘর থেকেও পালিয়ে এসেছি। এখন বলো কী করবো?'

সে হাশিমকে পুরো ঘটনা শোনালো।

ফ্লোরা বহুবার হাশিমের বাড়ি এসেছে। ওর মা লিজা ওকে এখানে নিয়ে আসতো। ওকে হাশিম খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা দিতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ঢুকিয়ে দিতো। ওর ভেতরে এখন ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই। আবেগ-ভালোবাসা এসবের যেন অস্তিত্বই নেই ওর ভেতরে। খ্রিষ্টবাদের সাথে ওর সম্পর্ক কোন ভালোবাসার নয়; বরং উন্মাদনার!।

'আমি তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারবো না। সকাল হতেই এখানে লোকজন বিভিন্ন কাজে আসা শুরু করবে। তোমাকে এক পাদ্রীর কাছে নিয়ে যাবো। তোমার মা তাকে চিনে। চলো।' হাশিম বললো।

পাদ্রীর দরজায় শব্দ হলো। পাদ্রী ভয়ে কেঁপে উঠলেন। এত রাতে কে আসতে পারে? মারীদার বিদ্রোহের কারণে খ্রিষ্টান নেতাদের ধড়পাকড় চলছে। কাঁপা হাতে পাদ্রী দরজা খুললেন।

হাশিমকে দেখে পাদ্রী প্রাণ ফিরে পেলো। তার সঙ্গে সুদর্শন এক যুবক। পাদ্রীর অপরিচিত। ভেতরে গিয়ে ফ্লোরা পুরষালী আলখেল্লা খুলে ফেললো। মাথায় টুপি পরা ছিলো সেটাও নামিয়ে ফেললো।

'এ হলো ফ্লোরা।' হাশিম পাদ্রীকে বললো। 'এই মেয়ে আজ ওর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আসার সময় এক মুসলিম যুবককে কতল করে এসেছে।'

হাশিম পাদ্রীকে সেদিনের পুরো ঘটনা শোনালো।

বুড়ো পাদ্রী ফ্লোরার রূপ দেখে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।

'তুমি রূপের এক বিস্ময়কর নমুনা।' পাদ্রী বললেন, 'উন্দলুসের ঐ মুসলিম বাদশাহদের ধ্বংসের ব্যাপারে তুমি তো অনেক বড় অবদান রাখতে পারবে। তুমি সালারদেরকে একে অপরের শত্রু বানাতে পারবে। তোমার একটু মুচকি হাসি মুসলিম সালারদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে আমাদের কাছে বন্দি করে নিয়ে আসতে পারবে।'.....

'বর্তমান শাহে উন্দলুস আব্দুর রহমান তোমার মতো রূপবর্তী মেয়ে দেখে তো পুরো উন্দলুস মন থেকে দূর করে দেবে। এটা তার এক দারুণ দুর্বলতা। তুমি তার ও সালারদের মধ্যে দ্বন্ধ সৃষ্টি করতে পারবে....। কিন্তু তোমাকে তোমার....

'আমাকে আমার সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হবে! ফ্লোরা পাদ্রীর কথা কেড়ে নিয়ে বললো। 'কিন্তু মনে রাখবেন আমি আজীবন কুমারী থাকতে চাই। আমি মরিয়ম কুমারীর দাসী। আমি জানি, মুসলমান উমারা, রঈস ও ওযীরদের মধ্যে অনেক বড় ত্রুটি হলো, ওরা সুন্দরী মেয়ে দেখলে নিজেদের সব দায়-দায়িত্ব ভুলে যায়। কিন্তু আমি কোন মুসলমানের গন্ধও সইতে পারবো না।'

'আমাদেরকে ভাবতে দাও ফ্লোরা!' পাদ্রী বললেন, 'এখানে তুমি সব দিক থেকে নিরাপদ থাকবে। মনের উত্তেজনাকে দূর করো। জযবায় উম্মাতাল হওয়া ভালো নয়।' তিনি হাশিমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কোন খবর?'

'লোহা এখনো গরম আছে।' হাশিম বললো, 'আমি লোহার মিস্ত্রী কামার। লোহা কখন শীতল হবে সেই প্রতীক্ষা আমি করি না। উত্তপ্ত থাকতে লোহা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই বানানো যায়। মারীদা থেকে অনেক খ্রিষ্টান পালিয়ে টলয়টায় পৌছে গেছে। আমার লোকজন ওখানে চলে গেছে। ওরা আমাকে ওদের নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছে। আমি ভাবছি।'

'এত ভাববার সময় নেই হাশিম। পাদ্রী বললেন, 'পরিকল্পনার সবটাই যেহেতু তোমার, নেতৃত্বও তোমার হওয়া উচিত। আমি জানি, তুমি লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে পারবে না। কিন্তু যে বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্মতা তোমার রয়েছে সেটা আর অন্য কারো মধ্যে নেই।

'ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের মনোবল ও জযবায় তুমি যেভাবে প্রাণ সঞ্চার করতে পারো সেটা আর অন্য কেউ পারে না। তুমি টলয়টা থেকে ঘুরে আসো। ওখানে ইউগেলিস ও ইলওয়ারকে যে কোন ছদ্মবেশে পেয়ে যেতে পারো।'

'সামান্য কিছু সময় আগে আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, আমীরে উন্দলুস আনন্দ-উৎসবে মতোয়ারা হয়ে আছে।' পাদ্রী বললেন, 'আর সুলতানা আজ রাতে নতুন শরবতের উপকরণ দিয়ে তাকে প্রথম বারের মতো শরাব পান করাতে যাচ্ছে। আমীরে উন্দলুস অতি ভোগ বিলাস প্রিয়। কিন্তু শরাব পান করে না।'

'আমাদের দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, আমীরে উন্দলুসের ওপর তার সবচেয়ে রূপসী স্ত্রী মুদ্দাসসিরা বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সুলতানা আজ রাতে ঐ বিশেষ ধরণের শরবত পান করিয়ে সেই প্রভাব নামিয়ে ফেলবে।'

'এই আমীরের ব্যাপারে আমাদের কোন ভয় নেই। হাশিম বললো, 'আমাদের ভয় হলো ঐ সালারদেরকে নিয়ে। এই সালাররা এমন যে, ওদের সামনে সোনার স্তুপ রেখে দাও, ফ্লোরার মতো সুন্দরী মেয়েদেরকে ওদের শয়নকক্ষে ঢুকিয়ে দাও, ওই হতভাগারা শিলাপাথরের চেয়ে কঠিন হয়ে যাবে। স্বাধীনতার চেতনাকে ওরা ওদের ঈমান বানিয়ে নিয়েছে।'

'এসব সালারদের মধ্যে যদি সিংহাসন আর নেতৃত্বের লোভ ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে ওদের ফৌজকে অল্প সময়েই ময়দান থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে।' পাদ্রী বললেন, 'কোন সালার যখন সিংহাসনে বসতে পারে তখন সে পুরোপুরি বাদশাহ বনে যায়। নিজের বাদশাহী স্থায়ী করার জন্য শত্রুকেও বন্ধু মনে করে। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায়। তারপর আর তার কোন ধর্ম বা জাতীয়তাবোধ থাকে না।'.....

' যে কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার নেতা-নেতৃ ও ধর্মগুরুদের মধ্যে হুকুমতের লোভ ঢুকিয়ে দাও। ওরা পরস্পরকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। তাদের জাতি না খেয়ে মরুক, চরিত্রহীনতার আস্তকুড়ে গিয়ে পড়ুক, আত্মমর্যাদাবোধহীন হয়ে উঠুক এতে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।'

'এখন এ দিকে মনোযোগ দিন।' হাশিম বললো, 'এখনই আমি টলয়টায় যাচ্ছি। লোহা আরো উত্তপ্ত করে তুলতে হবে। এখন এই মেয়েকে সামলে রাখুন। আমি যাচ্ছি।'

❋❋❋❋❋

ফ্লোরার যুবক প্রতিবেশী তো তার ঘরে এসে গেলো। কিন্তু জীবিত নয়। তার লাশ আবাদীর মাঝখানে কোথাও পাওয়া যায়। এক লোক তাকে আবিস্কার করে। তার বুকের মাঝখানে তখন গভীর যখম। সে লোক তার লাশ ঘরে পৌছে দেয়।

বৃদ্ধ মা-বাবা তাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে। চারপাশের বাড়ি ঘরে গভীর শোক নেমে আসে। কিন্তু কারো সন্দেহেও এটা আসার কথা নয় যে, ফ্লোরা তাকে হত্যা করতে পারে।

পরদিন সকালে ফ্লোরার বাপ ঘরে আসলে বদর তাকে গতকালের সব ঘটনা খুলে বললো, কাল গভীর রাতে ফ্লোরা পালিয়েছে।

'ওর এভাবে পথভ্রষ্টতা আর পালানোর ব্যাপারে নিশ্চয় তোমার হাত রয়েছে। ' ফ্লোরার বাবা তার মাকে বললো। মনে হচ্ছে তুমি মুয়াল্লিদ-দু'মুখো। বিশ বছর ধরে আমাকে ধোকা দিয়ে আসছো।'

'না, না।' লিজা হাত জোড় করে স্বামীর পায়ের আছড়ে পড়লো এবং কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাকে এভাবে অপবাদ দিয়ো না। আমি কখনো তোমাকে ধোঁকা দিতে পারবো না। আমাকে তোমার হাতে কতল করে দাও: কিন্তু আমার ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহ করো না।

ও মনে হয় খ্রিষ্টান মেয়েদের সাথে উঠারসা করেছে এবং ওরাই ওর মাথা বিগড়ে দিয়েছে। বদর ওকে জালিমদের মতো অনেক মেরেছে। এজন্যই ও পালিয়েছে। হায় ও না আবার নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করে বসে।'

'আমি ফ্লোরাকে বেশ কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করেছি।' বাবা মাসরূর বললো, 'এ মেয়ে আমার অন্য দুই মেয়ে থেকে একেবারেই অন্যরকম। ওকে আমি কখনোই নামাজ পড়তে দেখিনি।'

মাসরূর খানিক চিন্তা করে বললো,

'আমি একজন গোয়েন্দা। আমি জানি সে কোথায় গিয়েছে?'

মাসরূর ছেলে বদরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। দু'জনে দুই ঘোড়ায় সাওয়ার হলো। তারপর সেনা ব্রাকে গিয়ে সঙ্গে চারজন সেনা সদ্যস্য নিয়ে নিলো। একটু পরই এক গির্জায় রেড করলো তারা। মাসরূর গির্জায় পাদ্রীকে বললো,

'গতকাল রাতে আপনার এখানে এক যুবতী মেয়ে এসেছ। ওকে এখনই বের করুন।'

'আপনি গির্জা ও আমার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে দেখুন। কোন যুবতী মেয়ে দিয়ে আমার কী কাজ?' পাদ্রী কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন।

পাদ্রীকে সেনা কর্মকর্তারা তাদের হেফাজতে নিয়ে নিলো। তারপর কর্ডোভার আরেকটি গির্জায় গেলো ওরা। কর্ডোভায় তখন দু'টি গির্জায় ছিলো। এ গির্জার বৃদ্ধ পাদ্রীকে ফ্লোরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে পাদ্রী কিছু জানে না বলে জানালেন।

'আমরা জানি এসব গির্জা চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আড্ডা ছাড়া কিছুই নয়।' ফ্লোরার বাপ বলো।

কিন্তু কোন মেয়ের সাথে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই। পাদ্রী ধমকের সুরে বললেন।

'ওকে টেনে হেচড়ে নিয়ে চলো।' এক ফৌজি কমান্ডার বললো।

দু'জনকেই গ্রেফতার করে তাদের হেফাজতে নিয়ে নিলো। দু'জনকে যখন ধাক্কা দিয়ে বললো এসো, তখন এক নারী কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো।

'আমার ধর্মপিতাকে ছেড়ে দাও। আমাকে গ্রেফতার করো।'

সবাই তাকিয়ে দেখলো, ফ্লোরা গির্জার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। অতি কঠিন সুরে বললো,

'উনাদের এই অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি নিজেই এখানে এসেছি।'

❋❋❋❋❋

বদর ফ্লোরার ওপর টুটে পড়লো। মারতে মারতে আধামরা করে ফেললো। কিন্তু ফ্লোরা কাঁদলো না। চিৎকার করলো না। শুধু বলতে থাকলো,

'আমি খ্রিষ্টান। খ্রিষ্টবাদ আমার প্রাণ। আমি কুমারী মরিয়মের দাসী। এসব বলে বলে ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননাসূচক অনেক কিছুই বলে ফেললো।

'থামো বদর!' ফৌজি কমান্ডার বললো, 'ধর্ম তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে শাস্তি দেয়ার বিধান আমাদের এখানে নেই। তবে সে ইসলামের ব্যাপারে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করায় ইসলাম অবমাননার দায়ে সে অপরাধী। তাকে আমরা বিচারকের আদালতে পেশ করবো।'

তাকে যখন বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো তখন সে চিৎকার করে করে ইসলামের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে করতে এক পর্যায়ে বললো,

'আমার লজ্জা স্থান থেকে যা বের হয় ইসলাম তার চেয়ে নোংরা?'

এজলাসে বসা মুসলমান খ্রিষ্টান প্রত্যেকে ছি: ছি: করে উঠলো। অনেকে দু'আঙ্গুল দিয়ে কান বন্ধ করে বিস্ফোরিত চোখে ফ্লোরার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এমন রূপসী একটি মেয়ের মুখ দিয়ে এমন কদর্য কথা বেরোতে পারে।

বিচারক তখন ফায়সালা শোনালেন,

'তুমি মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত কাজ করেছো। আর তোমার মতো এমন রূপসী মেয়েকে মুক্ত করে দিলে সেটা অনেক বড় ধ্বংসজ্জের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

মৃত্যুদন্ডের কথা শুনে ফ্লোর বাপ মাসরূরের মনে করুণার ঢেউ উঠলো। সে বিচারকের আদালতে আর্জি পেশ করলো,

'আদালত যদি তাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দেয় তাহলে আমি ওর দায়িত্ব নিতে পারি। এ আমার সন্তান। আমি ওকে সঠিক পথে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো।'

'আদালত আবেদন মঞ্জুর করছে।' বিচারক রায় শোনালেন, 'তবে এক বছরের জন্য ওকে ঘরের এমনভাবে নজরবন্দি করে রাখতে হবে যেখানে শুধু মহিলারাই প্রহরায় থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দেয়া হবে।'

বিচারকের হুকুম অনুযায়ী ফ্লোরাকে আলাদা এমন এক ঘরে রাখা হলো, যেখানে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা রক্ষা করা যাবে। তিনজন বিশ্বস্ত মহিলাকে ফ্লোরার বাপ ফ্লোরার প্রহরায় নিযুক্ত করলো।

বাপের অতি প্রিয় মেয়ে ছিলো ফ্লোরা। তাকে বাপ বেশ শান্ত মেয়ে মনে করতো। তার মাকে বলতো, মেয়েটি বেশ লাজুক। আমার সাথেও পর্দা করে। বাপ কখনো জানতে পারেনি, মা তার বাচ্চাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক রূপসী কালনাগিনীরূপে গড়ে তুলছে।

বিচারককে মৃত্যুদন্ডের কথা শুনে ফ্লোরার বাপের মনে হলো, তার কলিজার একটি টুকরো কেউ কেটে নিয়েছে। মাসরূর ছট ফট করে উঠলো। সবচেয়ে আঘাত পেলো মাসরূর তার মনে। যে মেয়েকে এমন লাজুক, আর নিষ্পাপ মনে করতো, যাকে অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় অধিক ভালোবাসতো সে মেয়ে এত বড় ইসলামের শত্রু!

তার মতো এমন বিচক্ষণ এক মুসলিম গোয়েন্দার কোলে এতদিন ধরে লালিত-পালিত হয়ে আসছে এক কালনাগিনী!

ফ্লোরার বাপ এই আঘাত আর সইতে পারলো না। এরপর দিনই তার মুখ ভরে রক্ত বমি হলো। চিকিৎসক পৌঁছার আগেই ফ্লোরার বাপ মাসরূর দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলো।

বদর ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ফ্লোরার কাছে গিয়ে বললো, তোমার ব্যাপারে দুঃখ আর মানসিক আঘাত সইতে না পেরে আজ আমার বাবা মারা গেলেন।

'দুঃখে শোকে আরো বহু মানুষই তো মারা যায়।' ফ্লোরা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো। 'সে মারা যাওয়াতে আমার এজন্য আফসোস হচ্ছে যে, সে আমার বাপ ছিলো। কিন্তু যখন ভাবি সে একজন মুসলমান ছিলো তখন আমার আফসোস আর অবশিষ্ট থাকে না।'

'এর অর্থ হলো, তুমি সোজাপথে আসবে না।' বদর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো।

'আমি সোজা পথেই যাচ্ছি।' ফ্লোরা তিক্ত হেসে বললো। 'তোমরা এক বছর অপেক্ষা করে কী করবে? আজ আমার মুখ থেকে যা শুনছো এক বছর পরও তাই শুনবে। যদি শুনতাম আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে তাহলে এটা আমার জন্য বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। আমি সরল পথের সন্ধান পেতে মৃত্যুর জন্য ব্যকুল হয়ে আছি।'

'এত সহজে তুমি মরবে না ফ্লোরা!' বদর ক্রোধ যথাসম্ভব চেপে রেখে বললো। 'সেই মৃত্যু তোমার কখনো ঘটবে না যার জন্য তুমি ব্যকুল হয়ে আছো। তোমার জীবন এখন থেকে কাটবে বন্দি অবস্থায়। আমি তোমার ভাই। আমি এটা ফরজ মনে করছি যে, নিজের বোনকে তার মনের মধ্যে এটা গেঁথে দেয়া যে, বাতিলকে বুকে ধারণ করে তুমি দুনিয়াতেও শাস্তি পাবে এবং পরকালেও পাবে আরো কঠিনতর আযাব।'

'দুনিয়ার শাস্তিই আমাকে পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচাবে।' ফ্লোরা গর্বের সুরে বললো এবং প্রহরারত মহিলাদেরকে ডেকে বললো, 'তোমাদেরকে কি নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, এ ঘরে যাতে কেউ না আসে। ও কিভাবে এলো?'

'আরে মেয়ে এ তোমার ভাই এবং সেই তোমার বর্তমান অভিভাবক। ও তো যে কোন সময় এখানে আসতে পারবে।'

'ও আমার জন্য বেগানা পুরুষ।' ফ্লোরা বললো, 'কোন মুসলমান কোন খ্রিষ্টানের ভাই বা বোন হতে পারে না। ওকে এই ঘর থেকে বের করে দাও।'

'পাগল মেয়ে এসব কী বলছো তুমি? এই ঘরের মালিক তো এখন তোমার এই ভাই! তাকে আমরা বের করবো কিভাবে?'

বদর আর কিছু না বলে থমথমে মুখে ওখান থেকে চলে এলো।

বদর ওখান থেকে সোজা তার মায়ের ঘরে গেলো।

'মা!' বদর তার মাকে বললো, 'আমার তো মনে হচ্ছে ফ্লোরার মাথা তুমিই নষ্ট করেছো। বাবা আমাকে বলে গেছেন তুমি তাকে এত বছর ধোকা দিয়ে এসেছো।'

'শোন বদর!' মা বললো, 'আমি তোমার বাবাকে কোন ধোকা দেইনি। সে আমাকে কিছু মানবরূপী হিংস্র প্রাণী থেকে বাঁচিয়ে ছিলো। আমার কোন ঠিকানা ছিলো না। কোন আশ্রয় ও সহায় ছিলো না। তোমার বাপ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমার ঠিকানা হয়েছে। তাই তাকেই আমি ভালোবেসেছি। এক দিকে

ছিলো তার ভালোবাসা, আরেকদিকে আমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের ভালোবাসা।'.....

'এই উভয় ভালোবাসাই আমার বুকে ধারণ করে এই জীবনটা পার করে দিলাম। আর এর মধ্যে এক ভালোবাসা আমার মেয়ে ফ্লোরার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছি। এখন তোমার বাবা চলে গেছে। এই ঘরে আমার আর এখন কোন কিছুই যেন নেই। আমি তোমার ছোট বোন বালদীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোন মা কি তার সন্তানকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারে? সারা দুনিয়ায় এর কোন নজির আছে? তোমার বিকৃত ধর্মই তোমাকে এ অন্যায় কাজ করতে উৎসাহিত করছে। ধর্ম তো মানুষের সম্পর্কের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে। যে ধর্ম মানুষের সম্পর্ককে ছিন্ন করে, এমনকি মা সন্তানকে পৃথক করে সে ধর্ম অভিশাপ ছাড়া কিছুই না।'

'আমি এত কিছু বুঝি না। আমার সাথে থাকতে চাইলে আমার ধর্মে এসে যাও।' মা বললো, 'আমি আমার ধর্মের জন্য আমার সন্তানকে বিসর্জন দিতে পারি।'

তাহলে তো আমি আমার ধর্মের জন্য আমার মা ও দুই বোনকে বিসর্জন দিতে পারি।' বদর চ্যালেঞ্জের সুলে বললো, 'যেতে চাইলে চলে যাও। আমার ঘরে আমি কালনাগিনীদের পালতে পারবো না। এমন নিষ্ঠুর মা বোনদের মুখও আমি দেখতে চাই না।'

বদর অশ্রুসজল চোখে বেরিয়ে গেলো। পেছনে মায়ের মুখে বিদ্রুপের হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

রাতে যখন সে ঘরে ফিরলো, তখন পুরো বাড়ি শূণ্য- খা খা করছে।

❋❋❋❋❋

ফ্লোরা এখন নজরবন্দি অবস্থায়ও বেশ শান্ত। প্রহরায় নিযুক্ত তিন মহিলা বেশ দুশ্চিন্তামুক্ত। ফ্লোরা তাদেরকে কোন পেরেশান করছে না। ওদেরকে এই মেয়ে সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এতে ওরা ভেবেছিলো, এই মেয়ে ভয়ংকর কোন পাগল। যাকে কেউ সামলাতে পারছে না।'

'তুমি কী অপরাধ করেছো ফ্লোরা?' একদিন প্রহরী এক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো।'

'আমাকে আমার বাপ এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে করাতে চেয়েছিলো।' ফ্লোরা বললো, 'এ লোক শুধু বুড়োই নয়, মদখোর, নারীবাজ। আমার বাপ ঐ বুড়োর সঙ্গে সওদা করে নিয়েছে। আমি তো সেটা মানতে পারি না। অস্বীকার করে দিয়েছি। এমন বুড়োর কাছে তোমরা কি কেউ বিয়ে বসতে পারবে?....

'আমি রাজি হইনি বলে আমার ভাই আমাকে মারপিট করেছে। তারপর আমার বাপও আমাকে মেরেছে। আমি ওদেরকে গালি গালাজ করেছি। বাপ আমাকে ধরে আদালতে নিয়ে গেছে। আর বলেছে, আমার মেয়ে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছে। তাই আমি রেগে গেছি। আমার জায়গায় তোমরা হলে কি চুপ করে বসে থাকতে? রাগে আমি তখন কাঁপতে থাকি। তখন আমার বাপ ও বিচারককে দু'কথা শুনিয়ে দিই।'.....

'বিচারক ফায়সালা দেন, এ মেয়ে বড় ঠোঁট কাটা, বড় বেয়াদব। একে পৃথক ঘরে নজরবন্দি করে রাখো। তাকে মহিলাদের প্রহরায় রাখতে হবে। ওকে শিষ্টাচার শেখাতে হবে।'

'তোমার ভাই কেন এসেছিলো?' এক মহিলা বললো।

'এটাই বলতে আমি যেন ঐ বুড়োকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাই। আমার ভাই আমাকে লোভ দেখিয়েছে, আমি রাজি হলে আমাকে ছেড়ে দেবে।' ফ্লোরা বললো।

'তুমি নাকি ইসলামের নামে অবমাননাসূচক কথা বলেছো? এজন্য তোমাকে নজরবন্দি করা হয়েছে।' আরেক মহিলা বললো।

'ফ্লোরা সুযোগ পেয়ে গেলো। আদালতের বিচারকের ব্যাপারে উল্টাপাল্টা সমালোচনা করতে শুরু করলো। বলতে লাগলো,

'তোমরা ঐ বিচারককে ফেরেশতা মনে করো। বিচারক আমাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে আমিও যদি জবাবে তার দিকে সে দৃষ্টিতে তাকাতাম তাহলে আমার বাপের কথা একটাও শুনতো না। আমাকে কোন শাস্তিই দিতো না।'.......

'আর কার কথা বলবে, বিচারক, আমীরে উন্দলুস? সবাই মুখে ইসলামের কথা বলে আর ভেতরে ভেতরে মদ আর নারী নিয়ে পড়ে থাকে। অপরাধ করবেন তারা, আর শাস্তি পাবো আমরা।'.....

'সুন্দরী মেয়েদের রূপই তাদের জন্য বড় বিপদ টেনে আনে। তোমার দুর্ভাগ্য হলো তুমি একে তো যুবতী তারপর আবার দারুণ সুন্দরী। শাহে উন্দলুস তোমাকে দেখলো তো তার হেরেমে নিয়ে যাবে।' তৃতীয় মহিলা বললো।

‘এমন হলে সেদিন হবে আমার শেষ দিন।’ ফ্লোরা বললো।

‘তোমার তো বাবা মারা গেছেন। মাও তোমার বোনকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। মুক্ত হলে কোথায় যাবে তুমি?’

‘আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এখান থেকে কখনো আমি পালানোর চেষ্টা করবো না।’ ফ্লোরা বললো, ‘আমি তোমাদেরকে ধোকা দেবো না। আমি জানি, আমি পালালে শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাদের। মেয়ে হয়ে আরেক মেয়েকে আমি এমন ধোকা কখনো দিতে পারবো না।

‘তোমরা তিনজন কিছু সময়ের জন্য এখান থেকে চলে গেলেও ফিরে এসে আমাকে এখানেই পাবে। আর মুক্ত হওয়ার পর কোথায় যাবো সেটা এখনও ভেবে ঠিক করিনি। তবে সবার আগে তোমাদের তিনজনের কাছে আমার মিনতি, তোমাদের কেউ একজন আমাকে আশ্রয় দাও না!’

❋❋❋❋❋

প্রহরী মহিলারা ফ্লোরার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো। ফ্লোরা পালিয়ে যাবে এমন আশংকা তাদের আর রইলো না। প্রহরায়ও তারা নমনীয় হয়ে এলো। তা ছাড়া ফ্লোরা মিথ্যা কৌশলে নিজের মজলুম জীবনের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ওদের মনে নিজের ব্যাপারে সহানুভূতি সৃষ্টি করে নেয়।

একদিন ফ্লোরার বন্দিখানার দরজায় ৪০/৪৫ বছরের এক আলেমে দ্বীন এসে আওয়াজ দিলো। পরনে তার সবুজ আলখেল্লা। মাথায় পাগড়ি। হাতে দু'টি কিতাব। প্রহরী এক মহিলা দরজা খুলে দিলো।

লোকটি সরকারি একটি কাগজ বের করে দেখালো। তাতে লেখা, এ লোক একজন আলেমে দ্বীন। ফ্লোরাকে ধর্মীয় দীক্ষা দিবে।

আলেম লোকটিকে ফ্লোরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক নজর দেখলো। ফ্লোরার চেহারায় ঘৃণার ভাব ফুটে উঠলো। কিন্তু ফ্লোরা সেটা মুচকি হেসে মুছে ফেললো।

‘তুমি নাকি ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছো?’ আলেম লোকটি বললেন, ‘কিন্তু এজন্য তোমাকে এমন শাস্তি দেয়া উচিত হয়নি। আসল অপরাধী তো প্রথমে তোমার বাপ তারপর তোমার মা। বসো এখানে।’.......

‘নিজের মন থেকে সব বোঝা নামিয়ে ফেলো। তোমার বয়স কম। এই বয়সে অনেকেই খোদাকে বাঁকা চোখে দেখে। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে,

নিজের রূপ যৌবন নিয়ে তুমি এতই গর্বোদ্ধত যে, ধর্মকে কিছুই মনে করছো না। আমার ধারণা কি সত্যি?

'না।' ফ্লোরা মুখের ঘৃণার ছাপকে মুচকি হাসিতে লুকিয়ে বললো, 'এই আমি প্রথম কোন পুরুষ দেখছি, যে আমার রূপ সম্পর্কে আমাকে নতুন কথা শোনালো। কিন্তু আমি এখনো কিশোরী। নিজেকে যুবতী মনে করি না। আমাকে কি আপনার কাছে বাচ্চা মনে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, তুমি এখনো বাচ্চাই।' সেই আলেম বললেন, 'এজন্যই আমি শুরুতে বলেছি তোমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। তোমার বয়স বিবেচনা করে বিচারকের শাস্তি দেয়া উচিত হয়নি। যা হওয়ার হয়েছে। আমার ওপর নির্দেশ হলো, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় তোমাকে আলোকিত করে তুলি যেন। তুমি কি মন থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে?'

ফ্লোর বয়স যত স্বল্প তার বোধ-বুদ্ধি তত স্বল্প নয়। বরং বুদ্ধি ও চতুরতার দৌড়ে ফ্লোরা বয়স্ক মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

সে ভাবছে, নিজের রূপ দিয়ে এক তাগড়া যুবককে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছি। দেখা যাক, একে নিয়ে কী করা যায়। তবে এ যেহেতু আপদমস্তক ধার্মিক, তাই একে রূপের মায়ায় খুন করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। লাগুক সময়।

'আমি মন থেকে ধর্ম গ্রহণ করবো কি না এটা নির্ভর করছে তার ওপর যিনি ধর্মগ্রহণ করাতে এসছেন তিনি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কি না!' ফ্লোরা স্মিত হেসে বললো।

লোকটা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। এ ধরণের কথার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

'আপনিই যদি প্রতিদিন আসেন, তাহলে আপনি যা বলবেন তা আমি আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করবো।' ফ্লোরা বললো, 'তবে শর্ত হলো, শক্ত ও কঠিন কথা আমাকে বলা যাবে না। এটা ভুলে যাবেন না, আমি সেই বন্দি পাখির মতো, যে শূন্যে উড়ে বেড়াতে অভ্যস্ত। এ অবস্থায় আমার মনে বিরক্তি খুব দ্রুত আসতে পারে।'

'তুমি কি মনের মতো উড়ে বেড়াতে চাও?'

'না, আমি মন ভরে হাসতে চাই, খেলতে চাই। বাধ্য বাধকতাকে ভয় পাই। আমার মনের বিরুদ্ধে কোন কিছু আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে কোন ধর্মই আমি গ্রহণ করতে পারবো না।'

'এই আমার সাথে তুমি হাসতে খেলতে চাও?'

'আমার এই প্রয়োজন যদি আপনি পূরণ করে দেন তাহলে আমাকে আপনার দাসীও বানিয়ে নিতে পারেন। আর আপনি আমাকে যে শিক্ষাই দেবেন সেটা আমার রক্তে মিশে যাবে।' ফ্লোরা বললো।

শিক্ষক লোকটি হেঁসে ফেললো। বললো,

'তুমি খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে! আমি তোমার হাসি খেলার প্রয়োজন পূর্ণ করার সুযোগ দেবো। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে যা বলবো তার প্রতিটা শব্দ তোমার অন্তরে বসাতে হবে। আমার সামনে বসে যাও।'

❋❋❋❋❋

হাকিম হুররানী! আমীরে উন্দুলুস আব্দুর রহমান ছানীর আমলের শাহী বিকিৎসক। ইতিহাসের পাতায় তার পূর্ণ নাম পাওয়া যায়নি। শুধু হামিক হুররানী লেখা রয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট ও গবেষক চিকিৎসক হিসাবে তিনি কর্ডোভায় খুব অল্প বয়সেই সুনাম অর্জন করেন।

অত্যাশ্চার্য কিছু ঔষধও তিনি আবিস্কার করেন। তাই তাকে শাহী দরবারের চিকিৎসকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

হুররানী শুধু বিদ্যাগত চিকিৎসকই ছিলেন না। অনেক বড় পন্ডিত আলেমও ছিলেন। কিন্তু আব্দুর রহমান তাকে কেবল চিকিৎসক হিসাবেই জানতেন। তার জ্ঞান বিদ্যার পান্ডিত্য সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিলো না।

হুররানী একদিন বেশ পেরেশান হয়ে যারিয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমীরে উন্দলুসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন কথা বলতে যারিয়াবকে মধ্যস্ততাকারী হিসাবে মেনে নিয়েই এবং তার সুমতি মিললেই কেবল আমীরে উন্দলুসের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটতো। তার সুপারিশ দ্বারা আমীরে উন্দুলুসকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করানো যেতো।

'আমি শাহী দরবারের চিকিৎসক!' হুররানী বললেন, 'সরাসরি আমার তার কাছে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু হুকমত বিষয় আপনি ততটা বুঝেন যতটা আমি ডাক্তারি বিষয় বুঝি। আমাকে কিছু একটা পরামর্শ দিন। আমি খুবই পেরেশান?'

'ডাক্তার যদি পেরেশান হয়ে যান তাহলে রোগীর কী দশা হবে? দয়া করে বলুন আমি আপনার পেরেশানী কি করে দূর করতে পারি।'

'সুলতানা মালিকায়ে তরূব আমাকে বলেছেন, আমি যেন আমীরে উন্দলুসের মনে এটা ঢুকিয়ে দিই যে, তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন'। হুররানী বললেন, 'মালিকায়ে তরুব চাচ্ছেন আমীরে উন্দলুস যেন কোন অভিযানে বের না হন। আর আমি তার মনের মধ্যে এমন রোগের অনুভূতি যেন ঢুকিয়ে দিই যেটা আসলেই তার মধ্যে নেই।'

'আপনি তাকে কী জবাব দিলেন?'

'আমি উনাকে বলেছি, আমার পেশা অত্যন্ত পবিত্র।' হুররানী বললেন, 'আমি আমার দুশমনকেও ধোকা দিতে পারবো না। যে আমার রোগী নয় তার সঙ্গেও আমি মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। আর ইনি তো আমীরে উন্দলুস। তার আনুগত্য করা আমার ওপর ফরজ। তা ছাড়া আমি তার চিকিৎক। আমি মালিকাকে বললাম, আমি এ পাপ করতে পারবো না।'

'তিনি বললেন, এটা পাপ হলে এর মধ্যে পূণ্যও আছে একটা। তা হলো, আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান অত্যন্ত মূল্যবান মানুষ। তিনি রণাঙ্গনে সেনাদলের নেতৃত্ব দিতে দিতে এবং লড়তে লড়তে যখমী হয়ে মারা না গেলেও অবিরাম ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে অসুস্থ হয়ে সময়ের আগেই খতম হয়ে যাবেন।'

'আর যদি এমন ঘটে তাহলে তো উন্দলুসের জন্য এমন শাসক আর দ্বিতীয় জনকে পাওয়া যাবে না। আমি মালিকায়ে সুলতানাকে বললাম, তাকে এতটুকু বলতে পারি যে, তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে যেন দূরে থাকেন এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখেন। এ ছাড়া কোন মিথ্যা কথা তাকে বলতে পারবো না।'

'আপনি কি আব্দুর রহমানের কাছে সুলতানার ব্যাপারে অভিযোগ করতে চান?' যারিয়াব জিজ্ঞেস করলো।

'এটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।' হুররানী বললেন, 'কথা এখানেই শেষ হয়নি। আমি অস্বীকার করায় সুলতানা বিগড়ে গেলেন।'.........

তিনি বললেন, মুহতারাম হাকীম! আমীরে উন্দুলুসের জন্য প্রয়োজনে আরো অনেক চিকিৎসক পাওয়া যাবে। কিন্তু আরেকজন সুলতানা পাওয়া যাবে না। তার ওপর আমার যে প্রভাব আছে এর সিকিভাগও আপনার নেই।'.......

'আমার এক ইশারায় আপনাকে আমীরে উন্দলুসের নজর থেকে আস্তঁকুড়ে নিক্ষেপ করতে পারবো। আমাকে ক্ষেপালে আপনার পরিণাম শুধু এটাই হবে যে,

লোকে বলবে, এখানে হুররানী নামে একজন চিকিৎসক ছিলো। তিনি আর নেই। আপনাকে আমি যা বলছি তা আপনি করুন। দেখবেন আপনাকে দু'হাত ভরে বখশিশ দেয়া হবে।'....

'মুহতারাম যারিয়ার! আমার ভালো করেই জানা আছে, আমীরে উন্দলুসের চোখে সুলতানার যে অবস্থান তার অর্ধেক ও আমার নেই। ডাক্তার তো আছে অনেক। কিন্তু সুলতানা তো ঐ একজনই। কিন্তু আমি আমার বিবেককে কী করে ধোকা দেবো?'

'মুহতারাম হুররানী! যারিয়াব বললো, 'আপনাকে তা করতেই হবে যা সুলতানা আপনাকে বলেছে। আর না করলে আপনার পরিণাম কী হবে হবে সেটা আমি বলতে পারছি না।

ও আপনাকে আমীরে উন্দলুসের দৃষ্টি থেকে শুধু নিক্ষেপই করবে না। আপনার ওপর ভয়াবহ অপবাদ আরোপ করে আপনাকে সেসব কয়েদীদের সাথে কয়েদ করাতে পারবে যাদের শরীরের হাড়-মাংস প্রচন্ড আগুনের তাপে গলে গলে পড়ছে। আর তারা মরছেও না এবং বেঁচেও থাকতে পারছে না। তবে আপনি আপনার মতো করে কৌশলেও আমীরকে সুলতানার কথাগুলো বলতে পারেন'। ....

'আমিও মানি, আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান যেমন আরেকজন সুলতানা পাবেন না তেমনি উন্দলুস এমনকি খেলাফতও দ্বিতীয় আব্দুর রহমানও পাবে না। উন্দলুসের সার্বভৌমত্বের জন্য বরং সালতানাতে ইসলামিয়ার স্থায়িত্বের স্বার্থে আপনাকে মিথ্যা বলতেই হবে। এটা আমিও চাই।'

হুররানী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

'আমার আরো কিছু বলার ছিলো।' হুররানী বেশ কিছুক্ষণ পর চরম আহত গলায় বললেন, 'তবে বলবো না। আপনাকে বলে লাভও নেই। তবে যা আমার করা উচিত নয়, সেটাই করতে হবে।'

❋❋❋❋❋

'ডাক্তার মিথ্যা বলতে চাচ্ছিলেন না। ওকে আমি রাজি করিয়েছি।' যারিয়াব সুলতানাকে বলছিলো।

'ডাক্তার আসছে' সুলতানা বললো। 'ওকে আমি খবর দিয়েছি। শাহে উন্দলুসকেও বলে এসেছি, আপনার চেহারা মলিন দেখাচ্ছে এবং আপনার দৃষ্টির উজ্জলতাও ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

‘ তোমার আর কতদিন বাকি?’ যারিয়াব জিজ্ঞেস করলো।

‘এক মাসেরও কিছু কম।’ সুলতানা বললো, ‘আমি একটি ছেলে জন্ম দিতে পারবো বলে আশা করছি। আর এ হবে আব্দুর রহমানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। এখন তো আমার খ্রিষ্টানদের সাহায্য আরো বেশি দরকার। আর তোমার সাহায্যও।’

এসময় খবর এলো হামিক হুররানী আসছেন। হুররানীকে সুলতানা তার কামরায় বসালো। আরেকবার তাকে মনে করিয়ে দিলো আমীরকে কী বলতে হবে।

ওদিকে আব্দুর রহমানের শাহী কামরায় একই সময়ে আব্দুর রহমানের কাছে গিয়ে বসলো মুদ্দাসসিরা। আব্দুর রহমান মুদ্দাসসিরার ব্যাপারেও বেশ প্রভাবান্বিত। মুদ্দাসসিরা তাকে ফ্লোরার ঘটনা শোনালো।

‘এমন মেয়েকে তো মৃত্যুদন্ড দেয়া উচিত ছিলো।’ আব্দুর রহমান বললেন।

‘আপনি কয়জনকে মৃত্যুদন্ড দেবেন?’ মুদ্দাসসিরা বললেন, ‘ক্রুশের পূজারীদের ফেতনা আজ চারদিক থেকেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আপনার নিজ হাতে এখন এ ব্যাপারটার বিহিত করা দরকার। সালাররা তো ময়দানের ব্যাপারেই ভালো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ফায়সালা আপনাকেই করতে হবে। ফ্রান্সের ওপর হামলা করতে হবে। বিদ্রোহীদের মদদ ওখান থেকেই আসছে।’

‘আমার অভিযানের সব আয়োজন তো এ উদ্দেশ্যেই।’ আব্দুর রহমান বললেন।

‘আমি তো লক্ষ্য করেছি, আপনি কোন অভিযানে গেলে আপনার শরীর স্বাস্থ্য তরতাজা থাকে।’ মুদ্দাসসিরা হাসতে হাসতে বললো, ‘এখানে পড়ে থাকাটা আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার।’

‘শুধু আমার নয়, মুসলমানদেরও স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার এটা যে, দুশমন কোথাও বসে মুসলমানদের ধ্বংসের নীলনকশা তৈরি করছে আর মুসলমানরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। আমি জিহাদে আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। বার্ধক্যের দুর্বলতায় যখন আমার হাত কাঁপতে থাকবে তখনও আমার হাতে তলোয়ার থাকবে এবং আমার ঠিকানা হবে তখন ঘোড়ার পিঠ।’

দৈহিকভাবে মুদ্দাসসিরার রেশম কোমল চুল, তার ডাগর ডাগর চোখ, রাঙা ঠোঁটে লেগে থাকা মিষ্টি হাসি এবং তাঁর দারুণ আকর্ষণীয় শারীরিক গঠন আব্দুর রহমান দারুণ ভালোবাসতেন।

তার শুধু অসাধারণ রূপই নয়, তার মধ্যে এমন স্বচ্ছ-স্বাধী প্রাণময়তা সবসময় সমুজ্জ্বল থাক যে, আব্দুর রহমান তাকে দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না।

তোমর মধ্যে ও সুলতানার মধ্যে কেমন একটা পার্থক্য আমি অনুভব করি। কিন্তু প্রকাশ করতে পারবো না সেটা।' আব্দুর রহমান ঘোরলাগা গলায় বললেন, 'তুমি কি জানো এ পার্থক্যটা কী?'

'কখনো জানতে চেষ্টা করিনি।' মুদ্দাসসিরা বাচ্চাদের মত খিল খিলিয়ে হেসে বললো। 'কখনো নিজের মাথায় এ চিন্তা আসতে দেয়নি যে, আমিই একমাত্র আপনার এবং আপনি শুধু আমারই। সুলতানা আর আমার মধ্যে পার্থক্য ততটুকুই যতটা বিভিন্ন ফুলের মধ্যে থেকে থাকে। প্রত্যেক ফুলেরই নিজস্ব সৌন্দর্য ও সুগন্ধি রয়েছে। আমি কখনো এমন করে ভাবিনি, আমি সেই ফুল যা পুরো বাগানে একাই কর্তৃত্ব করে।'

এমন রোমাঞ্চ জাগানো পরিবেশে দরজায় হালকা শব্দ হলো। এই শব্দের ধরণ যেমন আব্দুর রহমান চিনেন তেমনি চিনে মুদ্দাসসিরাও।

'এটা কি ওর আসার সময় হলো?' আব্দুর রহমান বললেন।

'আসতে দিন।' মুদ্দাসসিরা আব্দুর রহমানের বাহুমুক্ত হয়ে উঠতে উঠতে বললো, 'ওরও তো আসতে হয়।'

মুদ্দাসসিরা দরজা খুলে দিলো।

সুলতানা ভেতরে ঢুকেই কর্তৃত্বের সুরে বললো,

হাকিম হুররানী এসেছেন। সুলতানার পেছনে যারিয়াব ও তার সঙ্গে হুররানী। হুররানী এসেই আব্দুর রহমানের হাতের কব্জি ধরলেন এবং চোখে-মুখে একটা চিন্তার ছাপ ফোটালেন। তারপর আব্দুর রহমানের পেট, বুক, হাতে মৃদু চাপ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। দু'চোখ আঙ্গুল দিয়ে খুলে দেখলেন।

'হুররানী!' আমীরে উন্দলুস বললেন, 'আপনি মনে হয় দেখতে এসেছেন আমি কেন অসুস্থ হচ্ছি না।' তিনি হেসে উঠে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার ভেতরে অতিরিক্ত একটা রগ দিয়েছেন সেটা যেকোন ধরনের রোগ ব্যাধিকে তার জন্মকালেই শেষ করে দেয়। হঠাৎ করে আপনার কেন সন্দেহ হলো যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, হুররানী?'

'আমরা এটাই দেখতে এসেছি আমাদের সন্দেহ কতটা ঠিক।' যারিয়াব হেসে বললো, ' খেলাফত ও উন্দলুসের সুস্থ এক আব্দুর রহমানের প্রয়োজন।'

'আব্দুর রহমান তো অনেক আছে, আপনার সমতুল্য তো কেউ হবে না।'

সুলতানা মুখে মায়াবী এক হাসি ছড়িয়ে বললো, 'যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর কত দিন হয়ে গেলো কিন্তু এখনো আপনার চেহারা থেকে ক্লান্তির ছাপ গেলো না। জনাব হুররানীকে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন, আপনার হার্ট দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তিনি যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া থেকে বিরত না হলে তার হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে।'

'তোমাদের দেখার মধ্যে এত পার্থক্য কেন?' আব্দুর রহমান দ্বিধান্বিত গল বললেন, 'মুদ্দাসসিরা আমাকে দেখে সুস্থ সবল। যুদ্ধের ময়দানে থাকলে আমার শরীর স্বাস্থ্য তরতাজা থাকে। আর তোমরা বলছো, আমার হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে।'

সুলতানা চোখ ঘুরিয়ে মুদ্দাসসিরার দিকে তাকালো।

'আমীরে উন্দুলুসের দীর্ঘ এক বিশ্রামের প্রয়োজন।' হুররানী ঘোষণা দেয়ার মতো বললেন, 'হৃদযন্ত্র অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আপনার শাহরগ বলছে, রক্তের চলমান গতি ধীর হয়ে আসছে। আরো দ্বিগুণ- দ্রুততর হতে হবে।'

'হুররানী! মুসলমানদের রক্ত ঘরে বসে আরাম করলে দ্রুততর হয় না।' আমীরে উন্দলুস বললেন, 'রক্তের গতি কেবল যুদ্ধের ময়দানেই ক্ষিপ্রতর হতে পারে।'

'আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আরেকটু গুরুত্ব দেয়া উচিত আমীরে উন্দলুস!' সুলতানা বললো, 'কোন তোষামোদকারী যদি বলে আপনার স্বাস্থ্য খুবই ভালো তাহলে সে নিশ্চয় আপনার মঙ্গল চায় না। মুহতারাম হুররানী! আপনি ঔষধ বানিয়ে পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁর বিশ্রামের ভার নিচ্ছি।'

'বিশ্রামও এত বেশি করা যাবে না যে, রক্তের বর্তমান যে গতি রয়েছে তাও শ্লথ হয়ে যায়।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'কোন দরবারী চাটুকারদের দল যদি বলে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এর মধ্যেও কম চাটুকারিতা থাকে না। সঠিক সিদ্ধান্ত ডাক্তারই দিতে পারেন। আর সময়ই বলে দেবে, কে আমীরে উন্দলুসের মঙ্গল চায় আর কে তাকে কালনাগিনীর মতো দংশন করতে চায়।'

হুররানী অপ্রতিভ আর অপ্রস্তুত সুরে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন কথা তিনি বলছেন না, বলছে অন্য কেউ।

'আমি প্রয়োজনী ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমীরে মুহতারামের বিশ্রামে থাকা উচিত।' হুররানী একথা বলে অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।

চলে গেলো মুদ্দাসসিরাও।

যারিয়াব ও সুলতানা এমনভাবে আব্দুর রহমানকে বুঝালো যে, তার মধ্যেও এ সন্দেহ বসে গেলো যে, তিনি সুস্থ নন এবং তার শুধু বিশ্রামে থাকলেই হবে না। নারী-সঙ্গও বর্জন করে চলতে হবে। এসব কথায় সুলতানার আসল উদ্দেশ্য হলো, তাকে ছাড়া যেন কোন নারী আব্দুর রহমানের কামরায় না আসে।

❋❋❋❋❋

তিন-চারদিন পরের কথা। মুদ্দাসসিরা হাকিম হুররানীর পয়গাম পেলো যে, তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু মহলে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। মুদ্দাসসিরা পয়গামের জবাব দিলো, আগামীকাল তাকে সংবাদ দেয়া হবে যে, মুদ্দাসসিরার পেটে ভীষণ ব্যথা। সংবাদ পেতেই হুররানী যেন চলে আসে।

পরদিন হুররানীকে মহল থেকে সংবাদ দেয়া হলো, মুদ্দাসসিরার পেটে ভীষণ ব্যথা। হুররানী তখনই এসে উপস্থিত হলো। মুদ্দাসসিরা তার কামরায় শোয়া ছিলো। খাদেমকে সে বাইরে পাঠিয়ে দিলো।

'আমার বিশ্বাস, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারবো।' হুররানী বললেন, 'আমার বিবেকের ওপর অপরাধের এক বোঝা চেপে আছে। যেটা আমি একমাত্র আপনার সামনেই ব্যক্ত করতে পারি।'

'সম্ভবত আমি জানি, সেই বোঝাটা কী?' মুদ্দাসসিরা স্মিত হাস্যে বললো, 'আমীরে উন্দলুসের হৃদযন্ত্রে কোন রোগ-ব্যাধি নেই। আপনি বাধ্য হয়ে তাকে অসুস্থ বানিয়েছেন।'

হুররানী বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অসম্ভব রূপবতী এবং যৌবনবতী একটি মেয়ের ভাবনার দৃষ্টির এতটা গভীরে পৌছতে পারে সেটা তিনি কল্পনাও করেননি।

'আপনি কি এটা আমীরে উন্দুলুসকে বলতে চান?'

'আমি শুধু তার ভেতরের সন্দেহ দূর করতে পারি।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'তবে এটা আমি বলবো না যে, সুলতানা ও যারিয়াব তার মনের মধ্যে এই দ্বিধা-দন্দ্ব সৃষ্টি করছে, তাকে মানসিকভাবে স্থবির করে দিতে চাচ্ছে। ওরা দুশমনের হাত শক্তিশালী করছে, এসব কথা আমি আমীরে উন্দলুসকে বলবো না। যদি বলি তাহলে তিনি ওদেরকে বিজ্ঞেস করবেন। তারপর ওরা দু'জন আমার ওপর যে কোন মূল্যে প্রতিশোধ নিবে।'

'তারপর আমি এই লড়াইয়ের একটি পক্ষ হয়ে যাবো। এর ফলে আমার চিন্তা ভাবনা হয়ে যাবে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত প্রবণ। আমি আমার চিন্তা-ভাবনা ও

দৃষ্টিভঙ্গিকে এমন নোংরা মানসিকতায় সীমাবদ্ধ করতে চাই না। আপনি আপনার বিবেককে বোঝামুক্ত করে ভালো করেছেন এবং আপনি সুলতানার কথা মেনেও ভালো করেছেন। যদি তা না করতেন তাহলে ও আপনাকে সত্যিই কোন এক আস্তাকুঁড়ে নিয়ে ফেলতো।'

'সত্যিই আপনি এক মহীয়সী নারীর আসন্ন অলংকৃত করার যোগ্য এক নারী।' হুররানী পরম সম্মান প্রদর্শনের কণ্ঠে বললেন, 'আপনি সত্যিই আমার বিবেক ও হৃদয়ের ভারী বোঝা নামিয়ে দিলেন।'

হুররানী চুপ করে গেলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন।' আমি একটি পাপ আপনার পায়ে পেশ করছি।

'কাল রাতে কোন এক সময় আপনার এক খাদেমা আপনাকে একটি দুধের পাত্রে দুধ দিয়ে বলবেন, এর মধ্যে মিসরের সেই মধু মিশানো হয়েছে যা কোন সৌভাগ্যবানই পান করতে পারে। এ মধু মানুষের যৌবনকে আজীবন ধরে রাখে। আর রক্তের মধ্যে সবসময় এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে থাকে যে, সুখের লাবন্য-রূপ দিন দিন উজ্জল হতে থাকে।'....

'খাদেমা আপনাকে বলবে, এই অমূল্য মধু সে কোত্থেকে পেয়েছে। আপনি এ দুধ আমীরে উন্দলুসের কাছে নিয়ে যাবেন। তাঁকে বলবেন, শাহী মহলের আস্তাবলের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে এখান থেকে মাত্র এক ঢোক দুধ যেন পান করানো হয়।'

'আমার জন্য এই চমৎকার বিষ নিশ্চয় সুলতানার পক্ষ থেকে আসছে?'

'আর কার পক্ষ থেকে আসতে পারে?' হুররানী বললেন, 'সে আমাকে ডেকে নিয়ে এমন বিষ বানিয়ে তোমাকে দিতে বলে এবং শাসিয়ে দেয়, তোমার কাছে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষ আছে সেটা তোমার হাতে পান করতে হবে, যদি না তুমি এ কাজটা না করো...।

আপনি কি এখনো আমীরে উন্দলুসকে কিছু বলবেন না?'

'না,' মুদ্দাসসিরা মুচমি হেসে বললো, 'যদি বলে দিই তাহলে উন্দলুসের এই কালনাগিনী সবার আগে আপনাকে দংশন করবে। আপনি এই মহিলাকে এখনো ভালো করে চিনেননি। তার রূপ-যৌবন, অভিনয় শক্তি, উপস্থাপনার মধ্যে এমন বিষয়ে রয়েছে যে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘোড়াকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পারে। আপনি কি ওর হাতে সেই বিষ তুলে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তুলে দিতে হয়েছে,' হুররানী এতই প্রভাবান্বিত ও মুগ্ধ হলেন যে, মুদ্দাসসিরার জামার এক প্রান্ত খামচে ধরে তাতে চুমু খেয়ে বললেন, 'দয়া করে আমীরে উন্দলুসকে এই বিষের কথা বলে দিন। আমি এখন এটাই চাইবো যে, সুলতানা আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিক। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।'.......

'খোদা আমাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান ভান্ডার দান করেছেন তার রোগগ্রস্ত বিপদগ্রস্ত বান্দাদেরকে তারই ইশারায় তারই হুকুমে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু তারই এক বান্দি এই বিদ্যা দিয়ে অন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে'

'বলতে বলতে তিনি আরো পেরেশান হয়ে চাপা কণ্ঠে বললেন,

'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমি আর এখানে থাকতে চাই না।'

'না, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'আপনার এখানে অনেক প্রয়োজন রয়েছে। আমি তো সে সময়টাও আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যখন এই বিষই আপনার হাতে দুধ বা শরবতে মিশিয়ে কারো মাধ্যমে আমীরে উন্দলুসের সামনে পেশ করা হবে। আপনি যেভাবে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটা আমীরে উন্দলুসকেও জানিয়ে দেবেন।'

'কখনো ইচ্ছা হয়, এই বিষ সুলতানার গলায় ঢেলে দিই। কিন্তু আমি মৃত্যুদূত নই, মানুষের সুস্থতার প্রতীক।'

'আপনি অস্থির হবেন না। সুলতানার বিশ্বস্ত হয়ে থাকুন।' মুদ্দাসসিরা বলল।

'আমি তো হয়রান হচ্ছি, সে এই শাহী মহলে বসে ইসলামের দুশমনের হাতকে শক্তিশালী করছে। তাদের সঙ্গ দিচ্ছে।'

'না।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'কালনাগিনী কখনো কারো সঙ্গীনী বা সহমর্মী হয় না। সে যা কিছু করছে নিজের জন্য করছে। সে তো এখন এ আশায় বুক বেঁধে আছে যে, সে সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে জন্ম দিচ্ছে। খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় সে এক অঙ্গ রাজ্যের রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আমীরে উন্দলুসের বিশ্বস্ত রক্ষিতা হয়ে নিজের বাচ্চাকে সে উন্দলুসের সিংহাসনে বসানোর স্বপ্ন দেখছে।'.....

'আর আমীরে উন্দলুসের বিচক্ষনতাও এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, তিনি এই মহিলার মানব বিধ্বংসী মন মানসিকতা বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি তাঁকে অন্যকোনভাবে বুঝতে চেষ্টা করছি। আপনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আমি এর প্রতিদান অবশ্যই দেবো। আপনি মুখ বন্ধ রাখুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন।'

হুররানী সেখান থেকে নিশ্চুপ হয়ে চলে এলেন। কিন্তু তার চেহারা ও চলার ভঙ্গি বলে দিচ্ছিলো, দুশ্চিন্তা তাকে অনেকটাই কাবু করে ফেলেছে।

❋❋❋❋❋

পরদিন হেরেমে এক খাস খাদেমা মুদ্দাসসিরার কামরায় এলো। মুদ্দাসসিরা ওকে ভালো করেই জানে। মেয়েটি দারুণ চতুর এবং বেশ সংপ্রতিভও।

খাদেমা মুদ্দাসসিরাকে বললো, তার এক ভাই মিসর থেকে এসেছে। ওখান থেকে এমন এক ধরনের মধু নিয়ে এসেছে যা ওখানকার এক বিশেষ এলাকায় পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে, এই মধু ফেরাউনের যুগ থেকে পাওয়া যায়। এ শুধু তাদের শাহজাদাদের স্ত্রীদেরকে পান করানো হতো।

এই মধুর বৈশিষ্ট্য হলো, এতে মেয়েদেরকে বহু বছর পর্যন্ত সজীব রাখে এবং বিশেষ অঙ্গসমূহকে ষেড়ষী যুবতীদের মতো সতেজ রাখে। এই মধু এখনো ফেরাউনের যুগের পোড়া এলাকার কথাও কোথাও পাওয়া যায়।

'আপনি চাইলে এই মধু দুধের সাথে মিশিয়ে আপনার জন্য নিয়ে আসবো' খাদেমা বললো, 'খুব সামান্যই আছে। তবে দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে ওই সামান্যই অনেক দিন কাজ করে।'

'নিয়ে এসো। এখনই নিয়ে আসো।'

খাদেমা গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এলো।

'নিন মালিকা! এখন এটা আরাম করে পান করুন।'

মুদ্দাসসিরা দুধের পাত্র হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'সুলতানা তোমাকে এই দুধ দিয়ে কী বলেছে? আমাকে দুধ দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে, না দুধের প্রতিক্রিয়া কী হয় সেটা দেখতে?'

খাদেমা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'আপনি এসব কি বলেছেন? মালিকায়ে তরূবের তো এই দুধের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।'

'আচ্ছা বখশিশ যা পাওয়ার সেটা কী নিয়ে নিয়েছো, না দুধের প্রতিক্রিয়া দেখার পর এর জন্য বখশিষ পাবে?'

এতো এক খাদেমা। যত চালাকই হোক আমীরে উন্দলুসের এক স্ত্রীর সামনে সেটা আর কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে? সে স্পষ্ট বুঝলো, আমীরে উন্দলুসের এরই রূপবর্তী স্ত্রী বিষের ব্যাপারটা টের পেয়ে ফেলেছে।

খাদেমা ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো। মুদ্দাসসিরা হো হো করে হেসে উঠলো। খাদেমা এবার ভয়ে কুকড়ে গেলো।

'ভয়ো পেয়ো না মেয়ে। শুধু এটা স্বীকার করো যে, এই বিষয় মিশ্রিত দুধ তোমাকে সুলতানাই দিয়েছে।' মুদ্দাসসিরা গম্ভীর গলায় বললো।

'হ্যাঁ, উনিই দিয়েছেন।' খাদেমা কম্পিত কণ্ঠে বললো এবং এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললো, 'আমিই এই দুধ পান করবো। আমাকে দিন। যে শাস্তি ও যন্ত্রণা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, এর চেয়ে এটা পান করে এখনই মরে যাওয়া অনেক ভালো।'

মেয়েটি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো,

'তার হুকুম না মানলেও আমার জন্য বড় শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। এখন হুকুম মেনেও এর চেয়ে বড় শাস্তির সামনে পড়তে হবে।'

মুদ্দাসসিরার পায়ে পরে গেলো খাদেমা এবং মাথা তার পায়ে রেখে বললো,

'আমার সন্তানদের ওপর রহম করুন রানীজি! আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। মহল থেকে আজীবনের জন্য চলে যাবো। কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে যাবো।'

'তুমি মহলেই থাকবে।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'তোমাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কারো সাথে কোন কথা বলতে পারবে না।'

মুদ্দাসসিরা দুধের পাত্র নিয়ে খাদেমাকে ওখানেই রেখে বেরিয়ে গেলো।

হেরেমের মেয়েদের দিন শুরু হয় বাইরে সূর্যাস্তের পর থেকে। সুলতানার কামরায় রঙবেরঙের অসংখ্য ফানুস জ্বলছে। দিনের আলোর চেয়ে ঘর উজ্জল হয়ে আছে। পুরো ঘর এমন সুগন্ধিতে ভরে আছে, সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না।

সুলতানা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে আর নিজের রূপের ছটা দেখে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছে।

মুদ্দাসসিরা চাপা পায়ে কামরায় ঢুকলো। আয়নায় মুদ্দাসসিরাকে দেখে সুলতানা চমকে উঠলো। পেছনে ফিরে কয়েক মুহূর্ত শুধু ওর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলো। ওকে এখন সে এখানে মোটেও আশা করেনি। মুদ্দাসসিরার দু'ঠোটে মুচকি হাসি।

'আরে মুদ্দাসসিরা! কিভাবে এলে?' সুলতানা উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'এই পাত্র কিসের?'

'এর মধ্যে দুধ আছে। আর এর সঙ্গে এমন মধু মেশানো আছে যা কেবল মিসরেই পাওয়া যায়। তাও ফেরাউনের যুগের কোন কোন পোড়া এলাকায়।' মুদ্দাসসিরা দুধের পেয়ালা দারুন সুদৃশ একটি টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললো,

'এই দুধের বৈশিষ্ট্য হলো, দুধের মধ্যে সামান্য একটু মিশিয়ে কোন মেয়ে পান করলে তার রূপ কয়েখগুণ বেড়ে যায়। আর কিশোরীদের মতো হয়ে উঠে তার শরীর, রূপ-লাবন্য। হেরেমের এক খাদেমার ভাই এটা মিসর থেকে নিয়ে এসেছে।'.....

'খাদেমা দুধে মিশিয়ে আমার জন্য নিয়ে এসেছে। আমি পান না করে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। তোমার রূপ লাবন্য ও যৌবনের সঙ্গে আমীরে উন্দলুসের যে প্রেম রয়েছে আমি চাই সেটা আজীবন অটুট থাকুক। আমি আমার স্বামীকে আনন্দময় দেখতে চাই। নাও, তুমি পান করে নাও। আমার দেহের প্রতি তো আর ওর এত আকর্ষণ নেই।'

সুলতানার চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে কিছু একটা বলতে চাইলো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোলো না। তার রূপের ঝাঝ যেন নিমিষেই উবে গেলো। সে জানে সে এক ভয়াবহ অপরাধ করেছে।

'সুলতানা!' মুদ্দাসসিরা বললো সুলতানার মুখের দিকে তাকিয়ে। 'লোভ, মোহ, নোংরা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বিদ্বেষ মানুষকে একদিন না একদিন সেখানে নিয়ে দাঁড় করায় যেখানে আজ তুমি দাঁড়িয়ে আছো। তোমার মুখের অদৃশ্য রেখাগুলো বলছে, এই বিষের পেয়ালা তুমি নিজেই পান করবে একদিন। এখনো কি তুমি তোমার অবস্থান কোথায় সেটা বুঝতে পারোনি?'

'আমি আমীরে উন্দলুসের স্ত্রী আর তুমি তার রক্ষিতা! তুমি এখন এমন এক অপরাধে অপরাধী যে তোমার অলীক স্বপ্ন, তোমার ভাগ্য, তোমার গর্বের সন্তানের ওপর কালিমার মোহর মেরে দিয়েছো। তোমার চরম উগ্রতা, ঝড়ের মতো দাপট, নদীর বানের মতো উচ্ছলতা, রূপের চরম অহংকার এখন কোথায় গেলো?'

সুলতানার যেন মাথা ঘুরে গেছে। ধরাম করে সে খাটের ওপর বসে পড়লো আর নির্জবী চোখে মুদ্দাসসিরার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এখন কেন বলছো না এই বিষের পেয়ালা তুমি পাঠাওনি।' মুদ্দাসসিরা বিদ্রূপাত্মক হেসে বললো, 'মিথ্যার ওপর যার গোটা জীবনের অস্তিত্ব তার কেন মিথ্যা বলতে এত দ্বিধা! যার হাতে তুমি বিষের পেয়ালা পাঠিয়েছো সে আমারই খাদেমা। নিজেও সে বেঁচে থাকতে চায় এবং তার সন্তানদেরও জীবিত দেখতে চায়। তোমার অবৈধ বখশিশের লোভ এবং তুমি এখানে যে প্রেতাত্মার মূর্তি বানিয়ে রেখেছো তার ভয়ে সে তোমার কথা মানতে বাধ্য হয়।'...

'কিন্তু আমি যখন ওর সঙ্গে স্নেহের সুরে দু'চারটি কথা বলি তখন তার কয়েদখানার জাহান্নামের কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে তাকে আজীবন পঁচে মরতে হবে। তার সন্তানের কথা মনে পড়তেই সে আমার পায়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। সে এই বিষের মূল্যবান কাহিনীর পুরোটাই আমাকে বলে দেয়। আমাকে নয়: তুমি নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করো, তোমার অবস্থান আস্তুকুড়ের কতটা নিচে?'

'এখানকার কোন খাদেমা, কোন খাদেম এমনকি কোন রক্ষিতাও আজ পর্যন্ত শাহী খান্দানের কাউকে কোন ধোঁকা দেয়নি। সত্য-মিথ্যা কোনটাই বলার সাহস নেই তোমার মধ্যে। ফায়সালার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। যদি বলো, এখনই তোমার জীবনের শেষ রাত বানিয়ে দেবো, আর চাইলে তোমাকে তোমার প্রাণও ভিক্ষে দিতে পারি। এই রূপ যৌবন তোমার আর কোন কাজে লাগবে?'

ঘরের এই শীতল পরিবেশেও সুলতানার মুখায়ব ঘামে চিক চিক করে উঠলো। টানা টানা চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। তারপর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে খপ করে বিষের পেয়ালা হাতে উঠিয়ে নিলো। ফুঁপাতে ফুঁপাতে বললো,

'আমি আর এখন বেঁচে থাকতে চাই না।'

এই বলে পেয়ালা মুখের দিকে নিয়ে গেলো। মুদ্দাসসিরা একটি হাত লম্বা করে ওর ঠোঁটের ওপর রাখলো এবং অন্য হাতে পেয়ালাটি নিয়ে নিলো।

'এর অর্থ হবে আমি তোমাকে বিষ দিয়ে মেরেছি।' মুদ্দাসসিরা মুচকি হেসে বললো এবং পেয়ালাটি আগের জায়গায় রেখে দিলো।

সুলতানা দিশেহারা হয়ে মুদ্দাসসিরার দু'হাত জড়িয়ে ধরে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে গেলো।

'তুমি যদি শাহী খান্দানের স্ত্রী হয়ে থাকো এবং আমার চেয়ে তোমার অবস্থান অনেক উঁচু হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে এর প্রমাণ দাও।' সুলতানা

ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গি করে বললো, 'জানি আমার এ পাপ ক্ষমার অযোগ্য। তবুও আমাকে ক্ষমা করে দাও। শাহে উন্দলুসকে যদি তুমি এটা বলে দাও তিনি আমাকে কি বাঁচিয়ে রাখবেন'?

'হ্যাঁ, মুদ্দাসসিরা বললো, 'তিনি তোমাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখবেন। এত সহজে তোমাকে মারবেন না। তবে কয়েদখানার সে অংশে তোমতার বসবাস হবে যেখানে ভয়ংকর সব পোকা মাকড়ের বসবাস।'

সুলতানা মুদ্দাসসিরার দু'হাটু জড়িয়ে ধরলো। আর হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো।

'আমি তোমাকে এই রসহস্যময় জীবেনর মঞ্চে বাঁচিয়ে রাখবো।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'আমীরে উন্দলুস তোমাকে ভালোবাসেন। আমি জানি, যা আমি বলছি আমার ধর্ম-বিবেক সেটাকে গুনাহই মনে করে'।........

'কিন্তু আমার মাথা কখনো আমার ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে না। গর্ব করেই বলতে পারি আমি। আমার চিন্তা–চেতনায় আছে প্রসারতা এবং মনে আছে গভীরতা। আমি আমার নয়; উন্দলুসের স্বার্থ নিয়ে সবসময় চিন্তা করি। উঠো। খাঁটে উঠে বসো।'

সুলতানা উঠলো এবং জানোয়ারের মতো খাটের ওপর গিয়ে বসলো। মুদ্দাসসিরা তার বুকে টোকা দিয়ে বললো,

'শোনা সুলতানা! মনোযগো দিয়ে শোনা! এই পেয়ালা ভেঙ্গে যাবে। এই বিষ মিশ্রিত দুধ মাটি খেয়ে ফেলবে। তারপর সময় তার আপন গতিতে চলতে থাকবে। বছরের পর বছর কেটে যাবে। কিন্তু তোমার এই অপরাধ না কোন মাটি ঢেকে নেবে। আজকের সময় কখনো বিস্মৃতিতে চলে যাবে। বিকের এই পেয়ালা তোমারা ঠোঁটের ওপর ঝুলতে থাকবে। যেখানেই তুমি একটু অসাবধান হবে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য এক হাত বিবেকর সেই পেয়ালা তোমার গলায় উপুড় করে ঢেলে দেবে।'.....

'তোমার এই অপরাধ আমি হজম করার চেষ্টা করবো। কিন্তু আমার কয়েকটা শর্ত শুনে নাও। জীবনের কোন এক সময়ও যদি কোন একটা শর্তের বরখেলাপ করো তাহলে ভেবে দেখো কী ভয়ংকর পরিণাম হবে তোমার!'

প্রথম কথা হলো, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। আমারও অতি বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ গুপ্তচর আছে। যা আমাকে সবসময় সবধরনের সংবাদ দিয়ে থাকে।'

'তুম যদি স্বপ্ন দেখে থাকো, এই খ্রিষ্টানরা, ক্রুশের পূজারীর তোমাকে কোন অঙ্গ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবে এই চিন্তা এখনই দূর করে দাও। ওরা তোমাকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই দেবে না। এই কাফেরদের যে হোতা আছে ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। ইউগেলিস ও ইলওয়ারকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। হ্যাঁ, ওদেরকে যদি ধোকা দিতে পারো কিংবা ওদেরকে গ্রেফতার করতে পারো তাহলে এটা তোমার জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

'তোমার প্রতিটি শর্তই মেনে নেবো।' সুলতানা হাতজোড় করে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও। শাহে উন্দলুসকে কিছুই বলো না বোন!'

'ঠিক আছে বলবো না।' ভবিষ্যতে কখনো আমীরে উন্দলুসকে বলবে না যে, তার চেহারায় ক্লান্তি রয়েছে। তাঁকে এই নয়া শরবত পান করাবে না আর। সালতানের কোন বিষয়ে এবং আমীরে সালতানাতের কোন ফায়সালায় কখনো হস্তক্ষেপ করবে না। তুমি একজন রক্ষিতা ছাড়া কিছুই নও। এটা মনে রেখে মহলে চলাফেরা করবে। নিজের ধর্মে ফিরে আসার চেষ্টা করো। যারিয়াবকে ব্যবহার করা ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু মুদ্দাসসিরা!' সুলতান বললো, 'যারিয়াব তো আমার প্রেমে দেওয়া না।'

'তুমিও ওর প্রেমে দেওয়ানা হয়ে যাও।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'তোমার সবকিছু ওর সত্বায় সমর্পন করে দাও। কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমীরে উন্দলুসকে মহলের কয়েদী বানাবে না কখনো সুলতানা! তোমার নজর শুধু এই আজকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তোমার জীবনের একমাত্র নীতি হলো, আজ ভোগ করে নাও।'....

'কিন্তু আমার দৃষ্টি ভবিস্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত। আমার নয়, মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ এটা। আমার ইতিহাস সেই নন্দিত ইতিহাসের ওপর রচিত হচ্ছে যা মৃত্যুর পর লেখা হবে। আমি সেই ইতিহাসকে আলোকিত করতে চাই, যার আলোয় পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের পথ চিনে নিতে পারবে।

হয়তো আমার কথাগুলো তোমার উপলব্ধির উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে জানি। কিন্তু সেটা অনবরত পাপ আর নোংরা চক্রান্তে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবুও বুঝতে চেষ্টা করো।'.....

'কিছু তো বুঝতে পারছি মুদ্দাসসিরা! তোমার সব শর্তই মাথা পেতে নিলাম।' সুলতানা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বললো।

'আমি তো তোমাকে একথা বলছিনা যে, আমার ও আমার স্বামীর মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াও।' মুদ্দাসসিরা বললো, 'আমি সেই মহান ঝান্ডার মর্যাদার কথা বলছি, যা মহলের ওপর পতপত করে উড়ছে এবং ফৌজ সেটা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।'

যাও সুলতানা! তোমাকে আমি এবারের মতো মাফ করে দিলাম।'

মুদ্দাসসিরা দুধের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে ছন্দোবদ্ধ পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর এই পেয়ালা রাতের অন্ধকারে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

আর সুলতানার অবস্থা সেই নাগিনীর মতো হয়ে গেলো, যার বিষ কালের ঝড়ে উড়ে গেছে।

❋❋❋❋❋

ফ্লোরা সেই পৃথক বাড়িতেই নজরবন্দি হয়ে আছে। ধর্মীয় পন্ডিত তাকে নিয়মিতই তালীম দিয়ে যাচ্ছেন। ফ্লোরার চাপাচাপিতে পন্ডিতকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সময় বাড়িয়ে সেখানে থাকতে হচ্ছে। ফ্লোরা তার সাথে এখন অসংকোচ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছে। পন্ডিতের আসতে সামান্য বিলম্ব হলেই ফ্লোরা অনুযোগের সুরে বলে,

'আপনার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমার চোখ দুটো ক্লান্ত হয়ে যায়। মাথা ধরে যায়। অন্য কেউ যদি আমাকে নিয়ে এমন অবহেলা করতো আমি তার কোনো কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনতাম না। কিন্তু আপনি যতই অবহেলা করুন আমাকে; আপনাকে দেখার পর আমার সব দুঃখ কষ্ট হতাশা শেষ হয়ে যায়।'

ধর্মীয় পন্ডিত এখন দীক্ষায় দেয়ার চেয়ে ফ্লোরার প্রত্রিই বেশি মনোযোগী। ফ্লোরার সঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেন ওরা পরস্পর গভীর বন্ধু। গল্প গুজব করার পর তাকে সবক দেন। এতদিন ফ্লোরা তার সামনে বসতো। তারপর তার সাথে এসে বসতে শুরু করে।

একদিন বইয়ের ওপর ফ্লোরা এমনভাবে ঝুকে পড়ে যে, ফ্লোরার চুল পন্ডিতের গালে স্পর্শ করে। ফ্লোরা একটি হাত পন্ডিতের কাঁধের ওপর রাখে।

পন্ডিতও যেন তার অনিচ্ছায় একটি হাত ফ্লোরার কোমরে নিয়ে রাখে। ফ্লোরা তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে ফিক করে হেসে ফেলে যেন পন্ডিত তার এক গোপন ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছেন।

'আপনি আমাকে বলেন, মনে যেন খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি করি। ফ্লোরা তার ধর্মীয় পন্ডিতকে বললো, 'কিন্তু আমার মন তো আপনার ভালোবাসায় ব্যকুল হয়ে যায়। এটা কি পাপ?'

'না।'

ফ্লোরা নিজের গাল পন্ডিতের গালের সঙ্গে লাগালো। পন্ডিত যেন তার জীবনের সব শিক্ষা-দীক্ষা ভুলে গেলেন। কিন্তু ফ্লোরা সঙ্গে সঙ্গেই একটু দূরে সরে গেলো। সে তো পন্ডিতের ভেতর আগুনের সলতে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

পরের কয়েক দিন ফ্লোরা পন্ডিতের সাথে প্রেমের এমন উম্মত্ত অভিনয় করলো যে, পন্ডিতের মন-মগজে ফ্লোরা চরম এক নেশা হয়ে সওয়ার হলো। একদিন ফ্লোরা ধর্মীয় পন্ডিতকে বললো,

'আপনি চলে যাওয়ার পর সারা দিন এমন একা আর নিঃস্ব লাগে যে, ইচ্ছা করে মরে যাই। যদি মোটা একটা রশি পেতাম তাহলে ঐ উঠোনের গাছগুলোতে রশি বেঁধে দোলনা বানিয়ে নিতাম। ছোটকাল থেকেই দোলনা খেলা আমার দারুণ পছন্দ। দোলনা পেলে আমি খাওয়া দাওয়াও ভুলে যাই। আমার জন্য বড় সড় একটা রশি নিয়ে আসবেন?'

'অবশ্যই। তুমি বললে তোমার জন্য কূহে নূর থেকেও তোমার চাহিদা পূরণ করে দেবো।'

পরদিন ধর্মীয় পন্ডিত বেশ শক্ত আর অনেক লম্বা একটা রশি নিয়ে এলেন। প্রহরী মহিলারা একটু আপত্তি করলো যে, এই মেয়ে তো এই রশির সাহায্যে পালিয়ে যেতে পারে। পন্ডিত তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজের হাতে বাড়ির আঙ্গিনায় কোন একটা গাছে রশি বেঁধে দোলনা বানিয়ে দাও। তাহলে তো আর সে ওখান থেকে রশি খুলে নিতে পারবেন।

প্রহরী মহিলাদের আর আপত্তি রইলো না। ওরা তাই করলো। আর ফ্লোরার প্রতি ওরা বেশ সন্তুষ্ট। মেয়েটি বেশ সাধা-সিধা এবং এখন পর্যন্ত এমন কোন আচরণ করেনি যাতে করে ওকে সন্দেহ করা যায়।

ফ্লোরা সে রাতেই সেই দোলনার রশির সাহায্যে তার কয়েদখানা থেকে পালালো। এর আগে প্রহরী এক মহিলাকে গলাটিপে অজ্ঞান করে নেয়।

ফ্লোরা পালিয়ে কোথায় যাবে এটা তার জানা ছিলো। কর্ডোভায় এক খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীর বাড়ি আছে। এ বাড়িতে প্রায়ই খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের গোপন আড্ডা বসে।

এর নাম জনসন। ফ্লোরার মা এর বাড়িতে তাকে নিয়ে অনেকবার এসেছে। ইউগেলিস ছদ্মবেশে যখন কর্ডোভায় আসে তখন এই জনসনের বাড়িতেই উঠে।

ফ্লোরা জনসনের বাড়ির দরজার কড়া নাড়লো। জনসন দরজা খুললো, এত রাতে ফ্লেরকে দেখে তো তার মুখ হা হয়ে গেলো। তার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলো। ফ্লোরা তাকে জানালো, সে কি করে পালিয়ে এসেছে।

'কে জানে তোমাকে আবার আমার ঘরে কত দিন বন্দি হয়ে থাকতে হয়?' জনসন বললো, তবে সকালে আমি আমাদের লোক দিয়ে কেন্দ্রে খবর পাঠিয়ে দেবো। ওখান থেকে এক সময় কেউ এসে তোমাকে কর্ডোভা থেকে নিয়ে যাবে।'

'আমার আম্মুর কী খবর?'

'তোমার ভাই বদর তোমার মা ও তোমার বোন বালদীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। দুই দিন আমার এখানে ছিলো। ওদেরকে অনেক দূরে এক নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কর্ডোভা থেকে তুমি বের হলেই তুমি কোথাও না কোথাও এদের দেখা পেয়ে যাবে। আমাদের গুরু ইউগেলিস দু'চার দিন পর কর্ডোভা আসছেন। উনি এখানেই উঠবেন। তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে।'

'ইউগেলিস.... উহ ... ইউগেলিস' ফ্লোরা বাচ্চাদের মতো আনন্দে লাফিয়ে উঠলো প্রায়। 'আমার আম্মু ওর ব্যাপারে কত গল্প শুনিয়েছে আমাকে। নিজের যৌবন জীবন আবেগ ভালোবাসা সব ইসলামের ধ্বংস ও খ্রিষ্টবাদের বাদশাহী প্রতিষ্ঠায় ওয়াকফ করে দিয়েছেন তিনি।'

'ইউগেলিস তো খুবই সুদর্শন এক যুবক'। জনসন বললো, 'তিনি বিয়ে করবেন না বলে কসম করেছেন। ঈসা মাসীহের আসল দেওয়ানা তিনি। আমীরে আব্দুর রহমানের হেরেমের হীরা সুলতানা মালিকায়ে তরুব এবং শিল্পী যারিয়াব তো তার জন্য পাগল পারা।'

'এই দু'জন যদি সবসময় তার হাতে থাকে তাহলে তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি সফল হবো।' ফ্লোরা বললো।

'না,' জনসন তাকে বাঁধা দিয়ে বললো, 'এ দু'জনের ওপর আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। কারণ, যত কিছুই হোক ওরা মুসলমান! তাছাড়া একজন গায়ক আর আরেকজন সুলতানা কেবল একজন রক্ষিতা। এরা আসলে দরবারী চাটুকার। চরম স্বার্থপর। ওদের সাথে আমরা খুব সাবধানে কথা বলি।'

আমি তোমাকে বলছিলাম, সুলতানার রূপ যৌবন অতুলনীয়। এমন সুন্দরী এক মেয়ে তারই জায়গীরে ইউগেলিস একলা রাত কাটিয়েছে; কিন্তু সুলতানা এই পাথরকে মোমে পরিণত করতে পারেনি।

ফ্লোরার রূপও অতুলনীয়। কিন্তু একজন রূপবর্তী মেয়ে যেমন একজন রূপদর্শন পুরুষের স্বপ্ন বুকে নিয়ে রাত দিন কাটিয়ে দেয়, ফ্লোরার মধ্যে সেই স্বাভাবিক বোধটাই নেই। এ ধরণের মেয়েরা তো কোন প্রেম কাহিনীর নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়।

এক মুসলিম ঐতিহাসিক 'ইবরাতনামায়ে উন্দলুস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

'ফ্লোরা নিজেকে নিজে নারীই মনে করতো না।' খ্রিষ্টবাদ তার ওপর এক উন্মাদনা ও উম্মত্ততা হয়ে সাওয়ার হয়। কখনো মনে হতো কোন অদৃশ্য কিছু তাকে এক ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।'

পরদিন কর্ডোভায় এক হুলুস্থুল পড়ে গেলো। কয়েদী মেয়েটি নজরবন্দী থেকে পালিয়েছে। তার কামরায় এক প্রহরী মহিলার লাশ পাওয়া গেছে। বাড়ির ছাদের পিলারের সঙ্গে ঝুলন্ত একটি লম্বা রশি পাওয়া গেছে। সেটা লাগায়ো রাস্তা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

বাকি দুই প্রহরী মহিলাকে পুলিশী হেফাজতে নিয়ে নেয়া হলো। তাদের থেকে জানা গেলো, যে ধর্মীয় পন্ডিত ফ্লোরাকে দীক্ষা দিতে যেতেন তিনিই রশি নিয়ে আসেন। পন্ডিতকে গ্রেফতার করা হলো।

পন্ডিত তখনই বুঝতে পারলেন, ফ্লোরা যেমন সুন্দরী এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি চতুর। সে আসলে প্রেম-ভালোবাসার জাদু চালিয়ে তাকে বোকা বানিয়ে পালানোর পথ তৈরি করে নিয়েছে। বেচারার অনুতাপের আর শেষ রইলো না। অপরাধের উপলব্ধি তাকে এমন আঘাত করলো যে, তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন।

তাকে কাঠগড়ায় যখন দাঁড় করানো হলো তখন দেখা গেলো, তিনি কখনো নিজের কাপড় খামচে ছিড়ছেন, কখনো নিজের হাত কামড়াচ্ছেন। কখনো প্রহরীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন। আদালত তাকে পাগল সাব্যস্ত করলো এবং মুক্তি দিয়ে দিলো।

আর যে মেয়েকে সুপথে আনতে গিয়ে সরকারের একজন মহিলা প্রহরী হারাতে হয়েছে এবং এক ধর্মীয় পন্ডিতের পাগল হতে হয়েছে সে মেয়ের পেছনে ছুটে আর লাভ নেই। সে নিজেই তার ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে। ফ্লোর ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা সমস্ত মামলা আদালত খারিজ করে দিলো।

কয়েক দিনর পর উস্কখুস্ক চুলের এক পাগল দেখা গেলো কর্ডোভা শহরে। সে কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে, সূর্যের দিকে আঙ্গুল তাক করে বিড় বিড় করে কি যেন বলে। এদিক ওদিক মাথা নাড়িয়ে হতাশা প্রকাশ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে অনেক পথচারী তার আশে-পাশে জমা হয়ে যায়।

পাগলের কান্ড কারখানা দেখে তারা কৌতুক বোধ করে। কিন্তু পাগল ভিড় এড়িয়ে এক গলিতে ঢুকে পড়ে। তিন চারটা গলির মোড় ঘুরে ঘুর এক গলির একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয় কোন মানুষ আছে কিনা। না, গলিতে কেউ নেই। কোন শব্দ না করে দরজার ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং নিজেই ভেতর থেকে দরজার শিকাল চড়িয়ে দেয়।

ফ্লোরা এ বাড়িতেই থাকে।

বাড়ির মালিক জনসন দৌড়ে আসে এবং পাগলকে ব্যকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ইউগেলিস! আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

ইউগেলিসও তাকে আলিঙ্গন করে।

ইউগেলিস নিজের ছদ্মবেশ পাল্টালো। গোসল করে ধূলোবালি পরিস্কার করলো। জনসন তাকে ফ্লোরা ব্যাপারে জানালো। আদালতে বিচারকের সামনে ইসলামের বিরুদ্ধে সে যে নোংরা কটুক্তি করেছে সেটাও জনসন ইউগেলিসকে শোনালো।

'এখনই আমাকে ওর সামনে নিয়ে চলো। এ তো কুমারী মরিয়মের পবিত্র আত্মা মনে হচ্ছে।' ইউগেলিস ব্যকুল কণ্ঠে বললো।

ফ্লোরা ও ইউগেলিস দু'জন যখন মুখোমুখি হলো দু'জনই দু'জনের মনে ধাক্কার মতো খেলো। কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্লোরা ধীরে ধীর ইউগেলিসের দিকে এগিয়ে গেলো। তার হাটু চুমু খেতে ঝুলতে গেলো। ইউগেলিস তার অজান্তেই ফ্লোরাকে উঠিয়ে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো।

'তুমি এক নিষ্পাপ মেয়ে।' ইউগেলিস তাকে পৃথক করে তার মুখটি নিজের দু'হাতের করোটিতে রেখে বললো।

'মরিয়মও এমনই নিষ্পাপ ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)ও ছিলেন খুব সাধা সিধা। কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ছিলেন। তুমিও ক্রুশ বিদ্ধ হবে। শূলিতে ঝুলানো হবে তোমাকে।'

'আমি এ জন্যই জন্মগ্রহণ করেছি।' ফ্লোরা আবেগী গলায় বললো, 'আমার কুমারিত্বকে অটুট রেখেই আমি শূলিতে ঝুলবো। আপনি কি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারবেন যে, আমার প্রাণ আমার ধর্মের জন্য কোন কাজে লাগাবে? আরব থেকে আসা ঐ দুশমনদের শাহরগে কি আমার রক্ত মরণ বিষ হয়ে ঝড় তুলতে পারবে?

'ইচ্ছা, দৃঢ়তা, সংকল্প এবং একচ্ছত্র আবেগ থাকলে কোন কাজটা অসম্ভব'? ইউগেলিস ওকে তার কাছে বসাতে বসাতে বললো, 'তুমি বিচারকের সামনে ইসলাম ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালমন্দ করে আমার সামনে নতুন এক পথ খুলে দিয়েছো। আমি আমার আন্দোলনকে এপথেই চালাব। আমি এমন জানবায তৈরি করবো যারা জন সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইসলামকে গালমন্দ করবে। ওদেরকে পাকড়াও করা হবে। শাস্তি দেয়া হবে। সেদিনই এভাবে বিভিন্ন জায়গায় আরো কয়েজন একই কাজ করবে।'

'এতে কী লাভ হবে?' জনসন জিজ্ঞেস করলো।

'এদেরকে যখন ধর্মীয় কারণে শাস্তি দেয়া হবে তখন খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রতিশোধের এক নতুন স্পৃহা জেগে উঠবে।' ইউগেলিস বললো, 'আমরা গির্জাগুলো থেকে গুজব ছড়িয়ে দেবো, গ্রেফতারকৃত খ্রিষ্টানদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে যা কোন মানুষ সহ্য করতে পারবে না।

এভাবে আমরা খ্রিষ্টান জাতির মধ্যে এমন আগুনের অঙ্গার উস্কে দেবো যে, সেটা এক ঝড় আর মহাপ্লাবন হয়ে দেখা দেবে। এই প্লাবন মুসলিম মহল ও হুকুমতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে সব ধরনের ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে হবে।'

'তবে হুকুমতের বিরুদ্ধে লাগাটাও সহজ কাজ নয়।' ফ্লোর বললো, 'মারীদর লোকেরা বিদ্রোহ করে কি পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির স্বীকার হতে হয়েছে ওদের? অধিকাংশ খ্রিষ্টানদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমরা কি নিয়মিত ফৌজ বানিয়ে লড়তে পারি না?'

'এখনই নয়।' ইউগেলিস বললো, 'যদিও আমরা অনেক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি, তবুও বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখবো। আমরা যদি বিদ্রোহকে আমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্তে ভাববার সুযোগ দিই তাহলে এরা ফ্রান্সের ওপর হামলা করে আমাদের আসল শক্তি শেষ করে দেবে।'.......

তারপর সারা ইউরোপে ইসলামের বিজয় আর কেউ রুখতে পারবে না। উন্দলুসের ইতিহাস দেখো। কিছু দিন আগেও ফ্রান্সের ওপর হামলা হয়েছিলো। প্রথম আব্দুর রহমান ফ্রান্স প্রায় জয় করে নিয়েছিলো। দ্বিতীয়বার সেটা আর ঘটতে দেবো না।'

'ফ্রান্স কি এখন আমাদেরকে সাহাযয্য করছে?' ফ্লোরা জিজ্ঞেস করলো।

'ফ্রান্সের একক সাহায্যে সব ধরনের বিদ্রোহ সংঘটিত হচ্ছে।' ইউগেলিস বললো, 'বর্তমান আমীর যে নিজেকে শাহে উন্দলুস বলে থাকেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হচ্ছিলেন। আমরা মারীদায় বিদ্রোহ করে আমীর ও তার সালারদের বাধ্য করলাম রাস্তা থেকে যেন মারীদা চলে যায়। ফ্রান্সকে এভাবে আমরা বাঁচিয়ে নিলাম। ফ্রান্স আমাদের যুদ্ধশক্তি এবং ধর্মের কেন্দ্রী উৎস।'

'এখন আমাদের কাজ কী হবে?' জনসন জিজ্ঞেস করলো।

'এ উদ্দেশ্যেই আমি কর্ডোভা এসেছি।' ইউগেলিস বললো, 'কিছু লোকজন আছে, ওদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। এখন আমরা টলয়টায় বিদ্রোহ করাচ্ছি। বরং এখান থেকেই আমাদের বিদ্রোহাত্মক যুদ্ধ শরু হচ্ছে। আমাদের জানবাযরা কর্ডোভার ফৌজের কোন টহল দল বা ছোটখাট ইউনিট দেখলেই তাদের ওপর আচমকা গেরিলা হামলা চালিয়ে বন জঙ্গলে বা কোন উপত্যকায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওখানে এটা শুরু হয়ে গেছে'।

'ওখানকার গভর্ণর মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম। তিনি এসব গেরিলা হামলাকে এখন তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি হামলাকারীদেরকে ডাকাত বা লুটেরা মনে করছেন। আমাদের সামরিক দুর্বলতা হলো, টলয়টার শহরবাসী এখনো বিদ্রোহের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। এর কারণ হলো, মারীদার বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে তাদের অনেকেই টলয়টায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।'.....

'এরা ওখানকার লোকদেরকে খুবই ভয়ংকর কাহিনী শুনিয়েছে। মুসলিম ফৌজকে দৈত্য-দানবের সাথে তুলনা করে লোকদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কথাও বলেছে যে, কোন পাপ করতে চাও করে নাও, কিন্তু বিদ্রোহ করতে যেয়ো না। সাধারণ খ্রিষ্টানদের মানসিক এই দ্বিধা-দন্দ আমাদের জন্য একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ওখানে আমাদের কিছু লোক আছে যারা টহল ফৌজের ওপর নৈশ হামলা চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'...

'এখন প্রয়োজন হলো, মারীদার মতো টলয়টার সব লোক একবারে বিদ্রোহে জ্বলে উঠা। সবাই কর ইত্যাদি দিতে অস্বীকার করে বসা এবং গভর্ণর ইবনে ওসীমকে তার বাসভবনে হামলা করে গ্রেফতার করে নেয়া। শহরের শাসন

ক্ষমতা তখন সহজেই খ্রিষ্টানরা নিয়ে নিতে পারবে। এসব একবারে না ঘটলে আমাদের চক্রান্ত সফল হবে না।'....

'শাহলুই বলেছেন, তিনি তার ফৌজ শহরবাসীর ছদ্মবেশে টলয়টায় পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে, মারীদার মতো এখানকার লোকজন অস্ত্র ফেলে পালাবে না। আমার এখন বড় সমস্যা হলো, টলয়টার লোকদের ব্যাপারে শাহলুইকে আমি কোন জামানত দিতে পারছি না।'

'হাশিম কামার তো ওখানে চলে গেছে। সে কি লোকদেরকে বুঝাতে পারছে না? জনসন জিজ্ঞেস করলো।

'সে তার কাজ করে যাচ্ছে। গেরিলা বাহিনী তো সেই বানিয়েছে। সে বড় ধরনের কৃতিত্বের কাজ করছে' ইউগেলিস বললো, 'তার নামও আমরা পরিবর্তন করতে দেয়নি। তাকে বলে দেয়া হয়েছে যারা তাকে মুসলমান মনে করে তাদের কাছে যেন সে মুসলমানই থাকে। খ্রিষ্টানরা তো জেনেই ফেলেছে সে অনেক বড় খ্রিষ্টান এবং নামে মাত্র মুসলমান'।

'এখানে আমি এবার অন্য কোন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ফ্লোরা আমাকে নতুন এক পথ দেখালো। এটা আমি কাজে লাগাতে চাই। এতে সবচেয়ে বড় কাজ এটাই হবে যে, কর্ডোভার প্রশাসন তখন এখানে এটা নিয়েই পড়ে থাকবে। পুরোপুরি মনোযোগ তারা টলয়টায় দিতে পারবে না।'

সন্ধ্যার পর জনসনের এই বাড়িতে এক এক করে তিনজন ষান্ডা মার্কা লোক এলো। ইউগেলিসের সঙ্গে এরা দীর্ঘ সময় কথা বার্তা বলে চলে গেলো।

কয়েক দিনের মধ্যে এরা নতুন এক মিশন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

❋❋❋❋❋

জনসনের বাড়িটি মোটামুটি বড়। জনসন ইউগেলিসের জন্য এক কামরা এবং ফ্লোরার জন্য এক কামরা প্রস্তুত করে নিজে অন্য কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। ওরা দু'জনে বসে কথা বলতে লাগলো।

তাদের ধর্ম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ভায়াবহ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ইউগেলিস ও ফ্লোরা কথা বলতে লাগলো। এক পর্যায়ে দু'জনে দু'জনের ব্যক্তিগত কথাবার্তাও জিজ্ঞেস করলো।

ফ্লোরা ইউগেলিসের কাছে জানতে চাইলো, সে কি তার মিশনের কারণে বিয়ে করেনি, না তার পছন্দের মেয়ে এখনো সে পায়নি।'

'আমি একজন রক্ত-মাংসের মানুষই ফ্লোরা!' ইউগেলিস বললো, কোন মানুষ এটা দাবী করতে পারবে না যে, সে তার কামনা বাসনার উর্ধ্বের উঠে গেছে। তবে আমি এমন দাবী করে থাকি। কিন্তু আমার এই দাবি সত্য নয়। তুমি সদ্য যুবতী মেয়ে ফ্লোরা! এখনই হয়তো তুমি আমার সব কথা বুঝবে না। সবাই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু কামনা-বাসনা, রিপুর তাড়না খুব কম মানুষই বিসর্জন দিতে পারে।'....

'ধর্মের ব্যাপারে আমি এমন উন্মাদ আর আপোষহীন যে, আমার কাছে দুনিয়ার আর কিছু ভালো লাগে না। তিন সুন্দরী মেয়ে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু ওদের প্রস্তাব আমার কাছে মনে হয়েছে এক বন্দি জীবনের জন্য নিজের গলায় শিকল পরে নেয়া। একবার যদি এই শিকল উঠে তাহলে হয়তো আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো না।'

ফ্লোরা ইউগেলিসের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যার মধ্যে যেমন আস্থার প্রতিফলন আছে তেমন আছে সহানুভূতি এবং এমন উপলব্ধির ছায়াও ফ্লোরার চোখে মুখে দেখা গেলো যেন সে ইউগেলিসের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে।

যেন ওদের দেহ মন কোথাও গিয়ে একাকার হয়ে যাবে।

'আমি আমার ভেতরের কান্না শোনাচ্ছি না ফ্লোরা!' ইউগেলিস বললো, 'বাস্তব কথা হলো, বড় কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সফল করতে হলে এমন এমন ত্যাগ স্বীকার করতে হয় যেটা দেখলে তুমি বলবে কোন মানুষ এমন ত্যাগ দিতে পারে না। আগুনের অঙ্গার গলায় পুরতে হয়। বিষ পান করতে হয়। এবং নিজের হাতে নিজের গলা টিপে দিতে হয়।'...

'আমি এই সবক পেয়েছি মুসলমানদের থেকে এবং শিক্ষাও অর্জন করেছি তাদের থেকে। আমি খুব ভালো করে কুরআন পড়েছি এবং ওদের বিখ্যাত কয়েকটা তাফসীরও পড়েছি। এসব পড়ে আমি এতই ইসলামের প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়ি যে, মুসলমান হয়ে যাওয়ার ফায়সালা করে বসি। কিন্তু একটা বিষয় আমার মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেয় যে, যে আমাদের ইঞ্জীল কেন ওদের কুরআনের মতো এমন পূর্ণাঙ্গ আর এতো মনো মুগ্ধকর নয়?'

'আসলে খোদার ইচ্ছা আমার কাছ থেকে অন্য কোন কাজ নেয়া। তাই আমি ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যাই...। তোমাকে আমি একটা কথা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। যতদিন মুসলমানরা নিজেকের ধর্মের প্রতি পূর্ণ অনুগত ছিলো ততদিন তাদের ধর্ম চার দিকে বিজয়-কেতন উড়িয়েছে। ওরা যে দেশেই

গিয়েছে ওদের চরিত্র মাধুরী দেখে সেখানকার লোকেরা তাদের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাদের ধর্ম বুকে টেনে নিয়েছে।'.....

'কিন্তু কোন এক সময় সুযোগ বুঝে আমাদের পূর্বপুরুষরা মুসলমানদের মধ্যে নারীর রূপ-সৌন্দর্য, সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ খুব কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়। তখন থেকেই তাদের পতন শুরু হয়ে যায়। উন্দলুসের এখনো ইসলাম শুধু এ কারণে আছে যে, ইসলামের জন্য নিজের প্রাণ ও সবধরণের কামনা-বাসনা বিসর্জন দেয়ার মতো লোক এখনো এখানে আছে।'

যেমন কর্ডোভার ফৌজের সালাররা এবং আরব থেকে আসা কিছু নারী যারা নিজেদের ধর্মের জন্য নিজের জান বাজি রেখে বসে আছে।'....

'আর না হয়, সুলতান, আমীর উমারা এবং শাহী খান্দানের লোকেরা তো সেই কবেই ইসলামের শিকড় ছিবড়ে করে ফেলেছে। আমি ওদের থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, জান ও জযবা বিসর্জন দাও তো সফলতা তোমার পায়ে এসে চুমু খাবে।'......

'আমার কামনা-বাসনা ছিলো বড়ই তৃষ্ণার্ত। কারণ, শৈশবেই আমার মা বাবা মারা যায়। ভালোবাসার রূপ রঙ কী এর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই ফ্লোরা! আমি যখন কোথাও ক্লান্ত হয়ে একাকি থাকি তখন এক আশ্চর্য ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করি।......

'এটা সম্ভবত! আমার আত্মার তৃষ্ণা। তখন আমি এক ধর্মীয় পন্ডিত ও নেতা থেকে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসি এবং অস্থির হয়ে যাই যে, আমার এমন কোন জিনিসের প্রয়োজন যা আমি জানি না।'.....

'কখনো শুয়ে শুয়ে আমার অজান্তেই হাত দু'টো আমার বিছানার চার দিকে ঘুরে বেড়ায়। নিজের সঙ্গে ঝগড়া করি। নিজেকে গাল-মন্দ করি এবং এক সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। তখন ভাবতে থাকি, ইসলামের শিকড় কি করে উপড়ে ফেলা যায়। উহু ফ্লোরা! তোমার তো মনে হচ্ছে ঘুম আসছে। উঠো। তোমার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

ফ্লোরা কোন কথা না বলে উঠে পড়লো।

ইউগেলিস তার কামরায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ফ্লোরার ঘুম এলো না। তার মাথায় ক্ষণে ক্ষণে ইউগেলিসের কথাগুলো গুন গুন করতে লাগলো। নিজেই স্বগোতিক্তের মতো বলে উঠলো,

'আহা, লোকটি বড়ই তৃষ্ণার্ত। অথচ তৃষ্ণা মেটানোর সহজ সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগচ্ছে না। কত বড় ত্যাগ স্বীকার করছে। আহা প্রেম-ভালোবাসা কি তা জানে না। কত প্রেম নিবেদন ফিরিয়ে দিয়েছে।'

ফ্লোরা উঠে বসলো। অন্ধকারে ঘুরতে লাগলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে আসবে। এমন অনুভূতির সমুমখীন সে কখনো হয়নি।

সে ইউগেলিসের কামরার দিকে দ্রুত হাটতে লাগলো। দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেলো। চৌকাঠ পেরিয়ে পা ঘেষটাতে ঘেষটাতে সে সেদিকে এগিয়ে গেলো যেদিকে ইউগেলিসের খাট রয়েছে।

হঠাৎ সে খাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইউগেলিসের খাটের ওপর পড়ে গেলো। তার দেহের অর্ধেক পড়লো ইউগেলিসের ওপর। ইউগেলিস ধড়-মড় করে উঠে বসলো। ফ্লোরা ইউগেলিসের মুখটি হাতে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো।

'কে?' ফ্লোরা?' ইউগেলিস ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, ফ্লো।'

'কেন এসেছো।'

'তোমার কুরবানীর স্থলে নিজের কামনা বাসনা কুরবানী দিতে। ফ্লোরা ব্যকুল কণ্ঠে বললো, 'তোমাকে আমি এভাবে তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে মরতে দেবো না ইউগেলিস!

'আমি যেই হই তোমার প্রেম–ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ছটফট করবো না। তোমার পায়ের শিকল হবো না। নিজের গোলাম বানাবো না তোমাকে। আমাকে ক্ষণস্থায়ী এক মনযিল মনে করে একটু বিশ্রাম করে নাও।'

ইউগেলিস ওকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। তখনই সে অনুভব করলো, যে জিনিসের তৃষ্ণায় সে ছটফট করে, যার গোপন সন্ধানে সে ব্যকুল হয় এ সেই রক্ত মাংসের অপরূপ হীরক খন্ড।

'দাঁড়াও। ঘরে আগে আলো জ্বালাই। তোমাকে দু'চোখে দিয়ে ভালো করে দেখতে চাই।' ইউগেলিস বলে উঠে পড়লো।

কামরা প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো।

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক এসপিস্টাক দুই ঐতিহাসিক আরবাসী ও কুন্ড এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন,

'ইউগেলিস ও অপরূপা ফ্লোরার প্রথমবার সাক্ষাত হয় নির্জন এক ঘরে এবং প্রথম সাক্ষাতেই ফ্লোরা নিজেকে ইউগেলিসের কাছে সমর্পণ করে দেয়। সে বড়

এক ত্যাগের উদ্দেশ্যে ইউগেলিসের শয়ন কক্ষে ঢুকেছিলো। কিন্তু তার মনে ইউগেলিসের জন্য এমন প্রেমের ঝড় উঠলো যার উদাহরণ সে যুগে খুব একটা পাওয়া যায়নি। ওরা বিয়ে করেনি। কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্ব অনুভব করে ওরা বাঁচার মন্ত্রণা পেতো।'

ফ্লোরা নিজের প্রাণ, যৌবন এবং কুমারিত্ব এক ইউগেলিস ও খ্রিষ্টবাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলো।

ওরা তিন চার দিন সেই বাড়ির একই কামরায় রইলো। প্রতিদিনই নেতৃস্থানীয় কিছু খ্রিষ্টান ও পাদ্রী ইউগেলিসের কাছে আসলো। নতুন এক পরিকল্পনা যখন চূড়ান্ত তখন ওরা দু'জন একদিন ছদ্মবেশে কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে গেলো।

এর পরের রবিবারে খ্রিষ্টানরা যে গির্জাতেই গেলো পাদ্রীদের মুখে একই বক্তৃতা শুনলো। সব পাদ্রী একই কথা বললো। হযরত ঈসা (আ.) কে শূলিতে ঝুলানো হয়েছিলো এখন এখানে প্রত্যেক খ্রিষ্টানকে শূলিবিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এক খ্রিষ্টান মেয়ে ফ্লোরাকে বন্ধি করা হয়েছে। সে আদালতে ইসলামের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় তাকে কয়েদখানায় বন্দি না করে এক বাড়িতে বন্দি করে।

কারণ, সে অপরূপ সুন্দরী। তাকে ব্যবহার করছে মুসলিম নেতারা। এখন বিশ্বাস্ত সূত্রে জানা গেছে, এই মেয়ে নিখোঁজ। ওকে কোথাও গায়েব করে দেয়া হয়েছে। ওদের সব অপকর্ম ফাঁস করে দেবে এ আশংকায় মনে হয় ফ্লোরাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

গির্জায় যারাই উপাসনা করতে এলো এমন বিকৃত বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া হলো।

পাদ্রীরা এও বললো, প্রত্যেক খ্রিষ্টানের ওপর ফরজ হলো, ফ্লোরার পথে চলা এবং সে যে অপরাধ করে কয়েদির শাস্তি পেয়েছে প্রত্যেককে একই অপরাধ করে দেখিয়ে দেয়া যে, আমরা ওদের নির্যাতনকে ভয় পাই না। এটাই এখন একমাত্র প্রতিবাদের ভাষা।

গির্জার এসব গুজব সত্য খবরের মতো সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। ভয়ংকর একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, যে বাড়িতে ফ্লোরাকে রাখা হয়েছিলো সে বাড়িতে প্রতি রাতে বড় বড় হাকিমরা যাতায়াত করতো।

এ গুজবও ছড়ানো হয় যে, ফ্লোরাকে আমীরে উন্দলুস তার হেরেমে নিয়ে এখন ব্যবহার করছে।

অসত্য ও অবান্তর গুজব ছড়ানো খ্রিষ্টান সন্ত্রাসী দলের একটা মিশন ছিলো। কর্ডোভার প্রত্যেক খ্রিষ্টানদের ঘরে এসব গুজব পৌছে যায়।

এরপর আন্দোলকারীদের দ্বিতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করে পারফেকটিস নামক এক পাদ্রী। সে বাজারে কিছু একটা কিনতে যায়।

ফ্লোরার ব্যাপারে ছড়ানো গুজব এত দিনে মুসলমানদের কানেও পৌছেছে। কয়েকজন মুসলমান পাদ্রী পারফেকটিসের কাছে এসব গুজব সম্পর্কে জানতে চায়। তারা বলে, ইসলামে কোন নারীকে এমন শাস্তি দেয়ার বিধান নেই যে, তাকে পৃথক কোন বাড়িতে আটকে রেখে হাকিমরা তার কাছে যাবে।

পাদ্রী উত্তরে খ্রিষ্টবাদের ব্যাপারে প্রশংসা ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করলো। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তার কথাগুলো ছিলো এরকম,

'হযরত ঈসা আ. কে আমরা খোদা ও খোদার পুত্র মনে করি। হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, আমার পরে যত নবী আসবে তারা সবাই (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী হবে।'

পারফেকটিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পষ্টতই মিথ্যা নবী (নাউযুবিল্লাহ) বলে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

এমন কথা শোনার পর কোন মুসলমান তো সেটা সহ্য করতে পারে না। মুসলমানরা তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। কিন্তু বয়োজৌষ্ঠ কিছু মুসলমান এই বলে তাকে ছাড়িয়ে নেয় যে, এর অপরাধের বিচার করবে আইন। কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নেবে না।

তাকে প্রথকে কতোয়ালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে আদালতে।

আদালতে বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে নিজের পক্ষে কিছু বলতে চায় কিনা? সে মিথ্যা বললো, এ ধরনের কোন কথা সে বলেনি। অসংখ্য সাক্ষী তার অপরাধ প্রমান করে দিলো।

আদালত তাকে ৪০৯ ধারা মোতাবেক মৃত্যুদন্ড দিলো।

৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায়ের পর পাদ্রী পারফেকটিসের ফাঁসি দেয়া হলো।

এর একদিন পর জানইট নামের এক ব্যবসায়ী একই আচরণ করলো। সে বাজারে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের নামে কসম খাচ্ছিলো। মুসলমানরা তাকে বাঁধা দিয়ে বললো, সে যেহেতু মুসলমান নয় তাই তাদের রাসূল ও কুরআন নিয়ে সে কসম খেতে পারে না। জবাবে সে বললো,

'কুরআন ও তোমাদের রাসূল মিথ্যা। তাই আমি মিথ্যা ধর্মের কসম খাচ্ছি।'

তাকেও আদালতে পেশ করা হলো। আদালতের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তাই তাকে কয়েক মাসের কারাদন্ডের সাজা দেয়া হলো।

ইউগেলিস ছদ্মবেশে একদিন জান ইট এর সাথে সাক্ষাৎ করতে কয়েদ খানায় যায়। সেখানে এমন গুজব ছড়িয়ে দেয়, কয়েদখানায় জানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে এবং তাকে সারাক্ষণই মারপিট করছে।

প্রতিটি গির্জায়ও ইউগেলিস এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।

ইসহাক নামে আরেক পাদ্রী একই পথ ধরলো। সে আদালতের অনুমতি নিয়ে বিচারকের কাছে আবেদন করলো তাকে যদি প্রমাণাদি দ্বারা বুঝাতে পারে ইসলাম সত্যধর্ম তাহলে সে মুসলমান হয়ে যাবে। তবে সেও তার প্রমাণাদি পেশ করতে পারবে। আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করলো।

বিচারক তার সামনে অকাট্য এবং সর্বজন বিদিত প্রমাণাদি পেশ করতে লাগলেন। বিচারক বলা শেষ করতেই ইসহাক ইসলামের ব্যাপার উল্টা-পাল্টা বকতে লাগলো। এ উদ্দেশ্যেই সে আদালতে এসেছে।

বিচারক তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তি শোনালেন না। বিচারক আব্দুর রহমানের কাছে চলে গেলেন।

'খ্রিষ্টান পাদ্রী ও ধর্মগুরুরা তো ইসলামের অবমাননাকর নতুন পদ্ধতি চালু করেছে। এদের শাস্তি কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে কী হওয়া উচিত?'

'মৃত্যুদন্ড।' আব্দুর রহমান হুকুম দিলেন। 'এমন অপরাধ যেই করবে তাকে জন সম্মুখে ফাসি দেয়া হবে। আর তার লাশ কয়েকদিন ওখানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কারণ, এ শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননা নয়, পুরো জাতিকে বিপথগামী করে ইসলাম ও ইসলামী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কে

দেয়া। এজন্য তাদের লাশ তাদের পরিবারের কাছেও দেয়া হবে না। সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে।'

ইসহাককে ফাঁসি দেয়া হলো। কিন্তু ইসলামের অবমাননার নতুন এই ধারা বন্ধ করা গেলো না। একদিন দুই দিন পর পর কোন এক খ্রিষ্টান বাজারের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো আর তাকে জনসম্মুখে ফাঁসি দেয়া হতো। দুই মাসে এগারজন পাদ্রীকে এই অপরাধে শাস্তি দেয়া হলো।

সুলতানা মালিকায়ে তরুবের সন্তান ভূমিষ্ট হলো।

'শাহে উন্দলুসের আরেকটি সন্তানের জন্য মোবারকবাদ!' যারিয়াব আব্দুর রহমানকে মোবারকবাদ দিতে দিতে বললো,

'বাচ্চা আপনার চেহারা এবং মায়ের রূপ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। উৎসবের জন্য তো প্রস্তুতি নিতে হবে। আর উৎসব হতে হবে অতুলনীয়। মালিকায়ে তরূবেরও খাহেশ, তার প্রথম ছেলের জন্মের আনন্দ যেন উন্দলুসের মানুষ সারা জীবন মনে রাখে।'

'উৎসব হওয়া দরকার। তবে আমি কিছু চিন্তা ভাবনা করে নিই।' আব্দুর রহমান বললেন।

'আমি প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিচ্ছি।' যারিয়াব একথা বলে চলে গেলো।

মহলে খবর ছড়িয়ে পড়লো, সুলতানার ছেলের জন্মের উৎসব করা হবে। শাহী মহলের উৎসব তো শাহী মহলের মতোই হয়। বখশিশ আর উপহার-উপঢৌকনের ছড়াছড়ি।

সরকারি ধনভান্ডার থেকে কোটি কোটি টাকা শুধু নাচ-গান, গায়ক, শিল্পী, নর্তকী ও আনন্দ বিনোদানকারীদেরকে দেয়া হয় বখশিশ আর নজরানা হিসাবে। আর চলে মদ আর শরাব পানের প্রতিযোগিতা। দরবার ও রাষ্ট্রের কার্যক্রম কয়েক দিন বন্ধ থাকে।

মুদ্দাসসিরা তার মহলে সালারে আলা উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ও ওযীর হাজিব আব্দুল করীমকে দাওয়াত করলো।

'আমি নিজে যদি এ ব্যাপারে আমীরের সঙ্গে কথা বলি তাহলে তিনি মনে করবেন আমি হিংসা করে এসব বলছি।' মুদ্দাসসিরা তাদের দু'জনকে বললো, 'আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন সুলতানার ছেলের জন্মকে উপলক্ষ্য করে বিশাল উৎসব করা হচ্ছে। আমীরের সঙ্গে কথা বলে তাকে কি এ থেকে আপনারা বাঁধা দিবেন?

'আমরা নিজেরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি।' সিপাহসালার বললেন, 'আমাদের কেউ এই উৎসবের পক্ষে নয়।'

'আর এটা উৎসব পালনের সময়ও নয়।' হাজিব আব্দুল করিম বললেন, 'শহর জুড়ে অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। এক দুই দিন পর পর কোন না কোন খ্রিষ্টানের লাশ খোলা ময়দানে ঝুলন্ত দেখা যাচ্ছে।'

'আপনাদের যদি উনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা থাকে তাহলে আর এখানে কেন আমরা সময় নষ্ট করছি। আপনার এখনই আমীরে উন্দলুসের কাছে চলে যান।' মুদ্দাসসিরা বললো।

সিপাহলালার উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ও হাজিব আব্দুল করীম যখন আমীর আব্দুর রহমানের কামরায় প্রবেশ করলেন তখন যারিয়াবও সেখানে বসা। সে আব্দুর রহমানকে বলছিলো, শহরের পরিস্থিতি খুবই শান্ত ও নিরাপদ। অন্যান্য প্রদেশেও কোন সমস্যা নেই।

'আমীরে মুহতারাম!' সালারে আলা বললেন, 'এক জন্মোৎসবের আয়োজনের কথা শুনছি আমরা এ ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'ফৌজেও কি উৎসব পালনের প্রস্তুতি চলছে?' যারিয়াব জিজ্ঞেস করলো।

'ফৌজে প্রস্তুতি চলছে পরবর্তী অভিযানে যাওয়ার জন্য। হাজিব বললেন, 'শহরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গুজব চলছে ফৌজের নজর তার ওপর রয়েছে। বিদ্রোহের আগুন এখানেও উস্কে দেয়া হচ্ছে।'

'আমীরে মুহতারাম! উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমরা এ হুকুমও নিতে এসেছি যে, ফৌজ কি উৎসব পালনের প্রস্তুতি নিবে না টলয়টা যাওয়ার প্রস্তুতি নিবে? আজ না হয় কাল ওখান থেকে পয়গাম আসবেই যে, দ্রুত সেনাসাহায্য পাঠাও।'

'কিন্তু উৎসবে আর কয়দিন সময় লাগবে! কয়েক দিনের প্রস্তুতি আর এক রাতের উৎসব! যারিয়াব বললো।

'উড়ন্ত ঝান্ডা গড়িয়ে পড়তেও সময় লাগে না যারিয়াব!' উবাইদুল্লাহ তির্যক কণ্ঠে বললেন।

'আর সেই সালতানাতের ঝান্ডা গড়িয়ে পড়তে তো কোন সময়ই লাগে না যার শাসকের উপদেষ্টা হয় কোন দরবারী গায়ক! যারিয়াব! তোমার জানা নেই, শহরে কী হচ্ছে?' হাজিব যারিয়াবকে ধমকে উঠে বললেন।

যারিয়ার মাথা নিচু করে ফেললো।

আমীর আব্দুর রহমানের চোখে-মুখে বিদ্রুপের ছায়া ফুটে উঠলো। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন,

'আমাকে আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে না কেন? যারিয়াব তো আমাকে বলেছে পরিস্থিতি শান্তই আছে।' তিনি কিছুটা রাগত কণ্ঠে বললেন।

❋❋❋❋❋

'শহরে প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা খ্রিষ্টানের লাশ ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে।' হাজিব আব্দুল করীম বললেন, 'এসব আত্মহত্যাকারীরা যে ইসলামের অবমাননা করে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলছে এতো তাদের ব্যক্তি-বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এটা এক চক্রান্ত। যার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এটাই তো এক সময় বিদ্রোহের রূপ নেবে।'

'আমরা তো খুব দ্রুতই বিদ্রোহ দমন করে ফেলবো।' যারিয়াব বললো।

'বিদ্রোহ নাচ-গান আর অপ্রয়োজনীয় উৎসব দিয়ে দমন করা যায় না যারিয়াব।' সালার আলা উবাইদুল্লাহ বললেন, 'তোমার ভোগ প্রিয় মাথা হয়তো এটা বুঝবে না যে, বিদ্রোহ আর নাশকতামূলক কাজের পেছনে কি হয়? আমীরে মুহতারাম! উন্দলুসের মাটি এখন বিদ্রোহীদের পদভারে কাঁপছে।'

'আর এ ধরণের বিদ্রোহের উদ্দেশ্য তো শুধু এটাই যে, আমরা উন্দলুসের মধ্যে ব্যস্ত থাকি।' আব্দুর রহমান বললেন, এবং ফ্রান্স বড় ধরনের যুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। তারপর ওরা উন্দলুসের ওপর হামলা করে আমাদেরকে ধ্বংস করার চমৎকার সুযোগ পেয়ে যাবে। আমার মাথা থেকে এখনো এটা দূর হয়নি যে, ফ্রান্সের ওপর হামলা এবং সে দেশটাকে উন্দলুসের সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করা আমার ওপর একটা ঋণের মতো চেপে বসে আছে। এখন আমাকে তা পরিশোধ করতেই হবে।

'কিন্তু..... তিনি কিছুটা ভেবে নিয়ে বললেন, 'উৎসব পালন করলে কী এমন হবে?'

'কিছুই হবে না।' হাজিব বললেন, 'কোষাগারের কিছু অংশ খালি হয়ে যাবে। লোকদের ওপর উৎসবের উন্মাদনা কিছু দিন সওয়ার হয়ে থাকবে। এতো জানা কথাই। হরমে যেহেতু নারী আছে তাই ওদের থেকে বাচ্চা ভূমিষ্ট হবেই।

কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে একদিন উৎসব আর বখশিশের এ প্রথা আমাদেরকে ডুবাবে। সময় ও অর্থের প্রয়োজন এখন এমন হয়ে দেখা দিয়েছে, আর কখনো এতটা অনুভূত হয়নি।'

'এধরণের উৎসব পালন তো আমাদের জন্য কোনোভাবেই শোভনীয় নয়।' সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ বললেন। 'আমাদের চরিত্র ও ধর্মীয় অবস্থানের বিবেচনায়ও তো এ উৎসব পালন কোনো মতেই আমাদেরকে মানায় না। আমাদের অনাগত সন্তানদের জন্য তো আমাদের এমন ইতিহাস রেখে যেতে হবে যা উন্দলুসের সীমানাকে দূর দিগন্তে প্রসারিত করবে। কিন্তু আমরা কোন কীর্তি রেখে যাচ্ছি?'

'আমীরে মুহতারাম! এ বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়েছে সেই নারীর পেট থেকে যে আপনার বিবাহিতা নয়। হেরেমে যেহেতু অবিবাহিত নারীদের রাখার বিষয়টি প্রথায় পরিণত হয়েছে তাই এটা শহী মহলের বৈধ সংস্কৃতিতের অংশ হয়ে গেছে।

এটা যদি আমাদের ধর্মের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে ভেবে দেখুন বিধর্মীরা একে কী বলবে? এটাই বলবে যে, আমীরে উন্দলুস তার অবৈধ সন্তানের জন্মোৎসব করছেন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কী বলবে?'

'আমীরে মুহতারাম!' হাজিব বললেন, 'সঠিক পরিস্থিতি তো আমরাই বলতে পারি এবং আমারাই বলে থাকি। যদি আপনার পছন্দের এক গায়ক উপদেষ্টার কথা ও পরামর্শ ভালো লাগে তাহলে ওকেই আপনার কাছে বসিয়ে রাখুন। কিন্তু আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব স্বাধীনভাবেই পালন করতে দিন। আমরা এ ব্যাপারে কোন ত্রুটি করতে পারি না। আমাদের ঈমান থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না।'

'স্বাধীনতা আমাদেরকে অন্যরকম চেতনায় উজ্জীবিত করে।'

❋❋❋❋❋

সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ ও হাজিব আব্দুল করিমের মুখে এ ধরণের কথা শুনে আব্দুর রহমান খুট একটা বিচলিত হলেন না। কারণ, এসব কথা শোনা তার জন্য নতুন কিছু নয়। এদের দু'জনের চেয়ে তিনি অনেক অসম সাহসী, বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞও। কিন্তু সুলতানা ও যারিয়াব তার সব প্রতিভা-গুণকে এবং তার ভেতরের অসম সাহসী রণাঙ্গণীয় জযবাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

সিপাহসালার ও ওযীরসহ অন্যান্য সালাররাও জেনে গেছেন, এ ধরণের তিক্ত ও জোশেলা কথা বলেই আব্দুর রহমানকে জাগাতে হয়। এভাবেই তারা তার ভেতরের ঘুমন্ত নির্ভীক মুজাহিদকে অচেতনের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলতেন।

তারা কয়েকবার এটাও ভেবে দেখেছেন যে, যারিয়াব ও সুলতানাকে গুম করে ফেলবে। কিন্তু এ আশংকাও তাদেরকে ভাবিয়ে তুললো যে, ওদের ব্যাপারে আমীরের যে নেশা গড়ে উঠেছে সেটা যদি তিনি না পান তাহলে নেশাভঙ্গ মানুষের মতো বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। তখন তো তিনি কারো কথাই শুনবেন না। আর এটা উন্দলুসের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে।

আব্দুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন এবং এটা বলে কামরায় পায়চারী করতে লাগলেন, 'টলয়টার খবর কী?' যারিয়াব! তুমি যেতে পারো। উৎসব হবে না। সবাইকে বলে দাও।'

টলয়টার খবর মোটেও আশাপ্রদ নয়। কামার হাশিম ওখানে বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ করাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী দল দিয়ে। ওদের মাধ্যমেই গড়ে তুলছে বিদ্রোহী দল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগন্থগুলোতে হাশিমের ব্যাপারে লেখা হয়েছে,

'হাশিমের পেশায় কামার হলেও টলয়টায় হাজারো বিদ্রোহীর এমন নেতা বনে যায় যে, তার ইঙ্গিতে খ্রিষ্টানরা জান কুরবান করতো। তার মুখে ছিলো মধুর বর্ষণ। দু'কথাতেই মানুষকে তার ভক্ত করে তুলতো। সে ইউগেলিসের ডান হাত বনে গেলো।'

হাশিম কামারের সন্ত্রাসী দলের পান্ডারা মুসলিম সেনা ইউনিট যারা রাতে বিভিন্ন গ্রাম ও উপশহরে টহল দিয়ে থাকে তাদের ওপর প্রায়ই নৈশ হামলা চালায় এবং দু'একজনকে আহত করে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দিন নি এ সন্ত্রাসীদের দলীয় সদস্য সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এর কৃতিত্ব সব হাশিমের। সেই যুবকদের সংগঠিথ করছে। এসব যুবকদের অধিকাংশের বাপ-দাদারা ত্রিশ বছর আগের এক বিদ্রোহে জড়িত থাকায় বিদ্রোহ দমনকারীদের হাতে মারা পড়ে।

হাশিম কামার এসব যুবকের মনে সেসব স্মৃতি তাজা করে দিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলে তার দলে ভেড়াচ্ছে।

টলয়টায় একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, টলয়টায় করবস্থানে রাতে এক দরবেশকে দেখা যায়। সে সশব্দে ঘোষণা দেয়ার মতো করে বলতে থাকে,

'ঈসা মাসীহের পূজারীরা! জেগে উঠো তোমরা। তোমাদের ওপর কেয়ামত নেমে আসছে। টলয়টা রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে।'

লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এটা কোন মৃত পাদ্রীর আত্মা। নতুন এক পয়গাম দিচ্ছে। গির্জায় গির্জায় এ ব্যাপারে আলোচনা চলতে লাগলো। গির্জার পাদ্রীরা বলতে লাগলো, এ ধরনের আত্মাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এধরনের আত্মা নাজাতের নতুন পথ দেখিয়ে থাকে।'

কয়েকদিনে পর খবর ছড়িয়ে পড়লো। কবরস্থানে রাতের বেলায় প্রদীপের আলো বাতাসে উড়ে যায় এবং আওয়াজ আসে,

'তোমাদের নিদ্রা-বিশ্রাম বিসর্জন দাও। জেগে উঠো। সবাইকে জাগিয়ে তোলো। তোমাদের দিকে সে কেয়ামত ধেয়ে আসছে, সেটাকে প্রতিরোধ করো।'

একটু থেমে আবার আওয়াজ উঠে,

'না হলে ধ্বংস অনিবার্য।'

'মৃত্যুর নদী এগিয়ে আসছে।'

খ্রিষ্টানরা প্রেতাত্মা এবং মৃত মানুষের ভূত-প্রেত হয়ে যাওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে। ওদের বিশ্বাস, মন্দ আত্মা ক্ষতি করে এবং পূণ্য আত্মা ভালো কোন কথা বা মুক্তির ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

এজন্য খ্রিষ্টানরা দলে দলে রাতে কবরস্থানে যেতে লাগলো। কবরস্থানে বেশ বড়। এর কোথাও সমতল কোথায় অসমতল জায়গা রয়েছে। আবার টিলা টক্করও রয়েছে কিছু।

লোকেরা কবরস্থানের বাইরে দাঁড়িয়ে মৃত আত্মার কথা শুনে এবং এক ধরনের আলো বাতাসে উড়তে দেখে।

এক রাতে কবরস্থানের বাইরে অনেক লোকের সমাবেশ হলো। সেদিন গির্জাগুলো থেকে এ ঘোষণা মুখে মুখে খ্রিষ্টানদের কাছে পৌছে গেলো যে, আজ রাতে মৃত আত্মা নিশ্চয় কোন পয়গাম নিয়ে আসবে।

তাই লোকরো সে রাতে দলে দলে কবরস্থানে গিয়ে জমা হতে লাগলো।

টলয়টার ফৌজ তাদের ব্যারেকে তখন ঘুমুচ্ছে। আর গভর্ণর ইবনে ওসীম কোন এক সেনা ব্যারেক পরিদর্শনে সীমান্ত অঞ্চলে সফর করছেনেন।

খ্রিষ্টানদের এই ভেল্কি বাজি কোন সরকারি কর্মখর্তা দেখতে পেলো না।

পুরো কবরস্থান গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। লোকদের মধ্যে কবরস্থানের অজানা ভয় ছেয়ে আছে। পুরো পরিবেশটাই রহস্যময় এবং গা ছমছম করা।

লোকজন নীরব-নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

আচমকা কবরস্থান থেকে এক পুরুষালী ফ্যাসফ্যাসে গলা শোনা গেলো। সমবেত খ্রিস্টানরা ভয়ে কেঁপে উঠলো।

'নিজেদের প্রিয় ধর্মকে নিজেদের বুকে জাগ্রত করে নাও। কল্পনায় কুমারী মরিয়মের কথা চিন্তা করো এবং এদিকে দেখো।'

সমবেত লোকেরা এক ধর্মীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করলো। যেটা এক ছন্দায়িত গুঞ্জরণের মতো শোনাচ্ছে এবং গা ছমছম পরিবেশকে আরো গাঢ়তর করে তুলছে।

হঠাৎ কবরস্থানের মাঝখান থেকে একটা আগুনের শিখা ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। যেন কেউ আগুন জ্বালিয়েছে ওখানে। এর সঙ্গে সঙ্গে সাদাটে ধোঁয়ার এক বাদল সেখানটায় ছেয়ে গেলো। যেটা ক্রমেই ঘনীভূত হতে হতে আবার হালকা হতে শুরু করলো। আর এর সাথে সাথে এক মেয়ের দৈহিক আকৃতি স্পষ্ট হতে লাগলো। আগুনের শিখা এসময় আরো উজ্জল হয়ে উঠলো।

সমবেত ক্রুশের পূজারীরা দেখলো, যেখানে ধোঁয়ার মেঘ দেখা গিয়েছিলো ওখানে স্বর্গীয় রূপ নিয়ে এক যৌবনবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় রুমাল বাঁধা। চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো।

লোকেরা যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। অনেকেই হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে রইলো। আত্মা বলে উঠলো,

'পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করো। সবাই উঠো এবং খোদার পুত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করো। আর যদি তা না করো তাহলে আমি খোদার গজব হয়ে তোমাদেরকে ছারখার করে দেবো।'

এই 'কুমারী মরিয়মের আত্মা' ছিলো ফ্লোরা।

একটু পরই আগুন নিভে গেলো। কবরস্থান অন্ধকারে ছেয়ে গেলো।

পরদিন এঘটনাই টলয়টায় বিদ্রোহের আগুন হয়ে দেখা দিলো।

❋❋❋❋❋

৮২৯ খ্রিষ্ট সেপ্টেম্বরের এক রাত। আমীরে উন্দলুস তার খাস কামরায় আধো ঘুম আধো জাগরণ এ অবস্থায় আছেন। যারিয়াব মন মাতাল করা এক রাগ-সঙ্গীত ধরেছে। সুলতানা আব্দুর রহমানের কাছে এমনভাবে বসে আছে যেন সে আমীরে উন্দলুসকে তার কোলের গীভরে ঢুকিয়ে ফেলবে।

আমীরে উন্দলুস যখন সুলতানার দিকে তাকান সুলতানার হাসি আরো মাদকীয় হয়ে উঠে এবং তার চোখে দুটোকে নেশাকাতর করে তুলে। এক সন্তান ভুমিষ্ট করে সুলতানার রূপ-যৌবন যেন আরো বেড়ে গেছে।

দরজা হঠাৎ ধীর ধীরে খুলে গেলো। রেশমী পর্দা একটু দুলে উঠলো। সুলতানা কট কটে চোখে ওদিকে তাকালো। দারোয়ানকে দাঁড়ানো দেখতে পেলো। সুলতানা উঠে দরজা পর্যন্ত গেলো।

'কোন হ্যাঁয়?' আব্দুর রহমান নেশাকাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।'

'দারোয়ান!' সুলতানা বললো বিরক্তভরা কণ্ঠে, 'বলছে টলয়টা থেকে পয়গামবাহক এসেছে।'

গানের ছন্দে ছেদ পড়েছে। কামরায় নিঃস্তব্ধতা নেনে এলো। আব্দুর রহমান হাই তুললেন।

'আমীরে উন্দলুস!' যারিয়াব বললো, 'পয়গামবাহক সকালেও দেখা করতে পারবে। পয়গাম জরুরি হলেও ঘন্টা দু'ঘন্টা পরে এলেও সমস্যা নেই। আমীরে উন্দলুস তো কারো বন্দি নন।'

'বলে দাও সকালে আসতে।' আব্দুর রহমান ঢুলতে ঢুলতে বললেন।

'পয়গাম বাহককে বলে দাও, আমীরে উন্দলুস সকালে পয়গাম শুনবেন।' যারিয়াব বললো।

দারোয়ান চলে গেলো। পয়গামবাহকও চলে গেলো। যারিয়ার ও সুলতানা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালো। দু'জনের ঠোঁটে এক অর্থময় হাসি ফুটে উঠলো।

কামরা আবার সুরের ঝংকারে গম গম করে উঠলো।

এই পরিবেশ খুব বেশি সময় স্থায়ী হলো না। হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। এবার পর্দা দুলে উঠলো না, বরং এক দিকে স্যাঁৎ করে সরে গেলো। আমীরে উন্দলুস, যারিয়াব ও সুলতানা তিনজনই চমকে উঠে ওদিকে তাকালো।

এখন যারিয়াব ও সুলতানার ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম। দু'জনই থতমত খেয়ে গেছে। কারণ, এখন বিনা অনুমতিতে যে কামরায় এসেছে সে আমীরে উন্দলুসের ছেলে উমাইয়্যা। বিশ/একুশ বছরের এই যুবক নায়েবে সালার।

'আমি কি আপনাকে সম্মানিত পিতা বলবো, না আমীরে উন্দলুস বলবো?' উমাইয়া তীক্ষ্ম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'কী হয়ে গেলো তোমার উমাইয়্যা?' আব্দুর রহমান উঠতে উঠতে বললেন, 'এতো রেগে আছো কেন?'

'টলয়টার বিদ্রোহী সন্ত্রাসীদেরকে কি এই খরব পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওরা যেন কাল সকাল থেকে বিদ্রোহ আর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডা শুরু করে? কারণ, এখন আমীরে উন্দলুস গান আর রাগ-সঙ্গীতের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। টলয়টা থেকে পয়গামবাহক এসছে, তাকে বলা হয়েছে ওকে সকালে এসে পয়গাম শোনাতে?'

'আরবের পবিত্র ভূমি তো এমন বেয়াদব সন্তানকে জন্ম দেয় না। তুমি কি আদব কায়দা ভুলে গেছো?' আব্দুর রহমান উষ্মা প্রকাশ করলেন।

'আপনাকে আদব কায়দা দেখানোর সময় এটা নয়। আমার সামনে এখন সে আদব রয়েছে যা দুশমনকে দেখাতে হবে। যুদ্ধের ময়দানের আদব। মুহতারাম আব্বাজান! আমার এজন্য কোন অনুতাপ হচ্ছে না যে, আমি আপনার সামনে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলতে পারছি না'।........

'কিন্তু আমি অনাগত ইতিহাস ও আমার স্বাধীনতার পবিত্র চেতনার সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারবো না। আপনার মৃত্যুর পর মানুষ আমার দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বলবে, এই ছেলের বাপ সালতানাতে উন্দলুসের অস্তিত্বের শিকড়.... দুর্বল করে দিয়ে গেছে।'

'তুমি আসলে কী বলতে এসেছো?' উমাইয়াকে জিজ্ঞেস করলেন আব্দুর রহমান ঝাঝালো গলায়।

উমাইয়া কামরার বাইরে গেলো। পর মুহূর্তেই সঙ্গে এক লোক নিয়ে আসলো। তার কাপড় চোপড় ও চোখে মুখে ধূলোর আস্তরণ জমে আছে। তার মাথা মাঝে মধ্যে ঝুলে পড়ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ক্লান্তিতে সে দাঁড়াতে পারছে না।

'আপনারা এখান থেকে চলে যান।' উমাইয়্যা যারিয়াব ও সুলতানাকে বললো।

'মুহতারাম আব্বাজান! উমাইয়্যা এবার কিছুটা নরম গলায় বললো, 'এই পয়গাম বাহক টলয়টা থেকে এসেছে। এক্লান্তিতে এবং চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে আমার কাছে এসেছে। বলেছে, আমীরে উন্দলুস অতি জরুরি এক পয়গাম শুনতে চাচ্ছেন না। লোকটি এত দ্রুত এসেছে যে, রাতেও ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কাটিয়েছে।'.....

'নিজের অতি প্রয়োজনীয় বিশ্রামও সে বিসর্জন দিয়েছে। একটি ঘোড়া তো তাকে নিয়ে অবিরাম ছুটতে ছুটতে মরেই গেছে। এক মুসাফিরের ঘোড়া ধার করে নিয়েছে। চরম ক্ষুধা আর তৃষ্ণা নিয়ে সে এখানে পৌছেছে। অথচ এখানে এসে ... ওর পয়গাম আগে শুনুন।'

'সংক্ষেপে তোমার পয়গাম শোনাও।' আব্দুর রহমান পয়গাম বাহককে বললেন।

'টলয়টার খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহ করে বসেছে।' পয়গাম বাহক বললেন, ' একে তো আমাদের ফৌজ অতি কম। তারাও সেসব ফৌজি চৌকি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং যেগুলোতে সৈন্য সংখ্যাও নেহায়েত কম। সে গুলোর ওপর হঠাৎ খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীরা নৈশ হাশলা চালানো শুরু করে। ফৌজি রসদের কাফেলার ওপর হামলা হতে থাকে।'.....

'এমনকি দিনের বেলাও টহল সেনাদলের ওপর গেরিলা হামলা চালাতে থাকে খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীরা। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয় হয়। কিন্তু নৈশ হামলা ও ওদের লুটপাট বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাদের এসব নাশকতামূলক কর্মকান্ড চলতেই থাকে' ।.......

'কয়েকদিন আগে খ্রিষ্টানদের কবরস্থানে এক ভেল্কি বাজির খেলা দেখায় তারা। বোকা, মুর্খ খ্রিষ্টানরা এটাকে মনে করে কুমারী মরিয়ম তাদেরকে কিদ্রোহ করার পয়গাম দিয়ে গেছে।'

'এই ঘটনাই টলয়টার খ্রিষ্টানদেরকে আগুন উত্তপ্ত করে দেয়। পরিণামে সেখানে এখন সশস্ত্র বিদ্রোহ চলছে। কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে ওরা নৈশ হামলা ও গেরিলা হামলা। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব অভিজ্ঞ কোন সেনা কর্মকর্তার হাতে রয়েছে। মারীদার মতো পুরো শহরবাসী অন্ধের মতো বিদ্রোহ করে বসেনি। ওরা খুব সতর্ক ও ভেবে চিন্তো পা ফেলছে।'....

'এতটুকু জানা গেছে যে, হাশিম কামার নামে এক লোক আপাতত এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার নির্দেশেই বিদ্রোহীরা সামনের দিকে পা ফেলছে। তবে সে কেথায় আছে, কোথায় তার অবস্থান এটা জানা যায়নি। জানা গেছে ফ্লোরা নামের অতি সুন্দরী এক যুবতী খ্রিষ্টানদের রক্তে আগুন ধরিয়েছে' ।

'তাকে ওরা মরিয়ম ছানী বলে থাকে। শহরের খ্রিষ্টানরা রীতিমতো ফৌজ বনে গেছে। কারো কথাই ওরা শুনছে না। আমাদের ফৌজি দল দেখলে ওরা ঘরে চলে যায়। কিন্তু পেছন থেকে হামলা করে বসে। একাকি কোন ফৌজ পেলে তো ওরা তাকে শেষ করে দেয়।'

'বিদ্রোহীরা কি রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুট করার চেষ্টা করেছে? আব্দুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন।'

'না আমীরে উন্দলুস।'

'ওরা কি নিয়মিত ফৌজের মতো সুশংখল?'

'না আমীরে উন্দলুস!' সুশৃঙ্খল ডাকাতদল ও লুটেরা দলের মতো ওদের কৌশল?'

আব্দুর রহমান পয়গামবাহকে আরো কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে তাকে শাহী মেহমান খানায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর দারোয়ানকে ডেকে বললেন,

'এখনই সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ ও ওযীর হাজিব আব্দুল করীমকে আসতে বলো।'

দারোয়ান কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

❋❋❋❋❋

টলয়টা থেকে দুই তিন মাইল দূরের এক পাহাড়ি এলাকা। যেখানে ঘন ঘন জঙ্গল রয়েছে। কোথাও কোথাও চোরা ভূমিও রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ে ঘেরাও করা কিছু জায়গা রয়েছে। সেখানকার পথ-ঘাট অতি কঠিন। ওখানে বিশাল বিশাল পর্বতগুহাও রয়েছে।

একটি গুহা বেশ আলোকিত। প্রদীপ বা মশাল জ্বলছে ভেতরে। কামার হাশিমের হেড কোয়ার্টার। গুহায় এক লোক বাইরে থেকে এসে ঢুকলো। তাকে দেখে এদিক-ওদিক থেকে কয়েকজন একত্রিত হলো। ওদের মধ্যে একজন মেয়েও আছে। সে হলো ওদের কাছে মরিয়াম ছানী- ফ্লোরা।

'বিদ্রোহীদের মনোবল তুঙ্গে আছে তো? কী খবর নিয়ে এসেছো'?

'আমাকে শুনতে দাও আগে।' ফ্লোরা বললো।

'ফ্লোরা তাড়াহুড়া করো না। কামার হাশিম বললো, 'তুমি এখনো বয়সে অপরিণত। বিদ্রোহ ও লড়াইয়ে আবেগ কোন কাজে লাগে না?' সে আগন্তুক লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো কী খবর নিয়ে এসেছো?'

'সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছে।' লোকটি বললো, 'আপনার দিক নির্দেশনা প্রতিটি ঘরে পৌছে দেয়া হয়েছে। তাজা খবর হলো, মুসলমানদের এক পয়গামবাহক কর্ডোভা চলে গেছে। ওখান থেকে ফৌজ তো অবশ্যই আসবে। টলয়টায় যে সেনাদল আছে সেটা তো আমরা তাড়াতাড়িই শেষ করে দিতে পারবো। কিন্তু কর্ডোভার ফৌজ এলে তো মুশকিল হয়ে পড়বে।'

'আমাদেরকে ফৌজের মতো সুশৃংখল হতে হবে।' কামার হাশিম বললো, 'আমরা লোকদের কাছে এখনই পয়গাম পৌছে দিচ্ছি, সবাই যেন অস্ত্র নিয়ে

প্রস্তুত থাকে। হুকুম পেলেই যেন ফৌজের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।'

গুহায় হাশিমের আরো যেসব লোক ছিলো তাদেরকে বললো,

'টলয়টার বাইরে অনেক সশস্ত্র বিদ্রোহীকে প্রস্তুত রাখতে হবে, যাতে কর্ডোভার ফৌজকে টলয়টা থেকে অনেক দূরে থাকতেই বাঁধা দেয়া যায়।'

কয়েক দিনের মধ্যেই টলয়টার বাইরে এক ফৌজ তৈরি হলে গেলো।

টলয়টার গভর্ণর মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমেরই দায়িত্ব শহরের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নৈশ হামলা ও গেরিলা হামলাকারীদের পাকড়াও করানোও তার দায়িত্ব।

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমের হেড কোয়ার্টার শহরের কাছেই এক সুদৃশ্য জায়গায়। তার কাছে খবর পৌঁছেছে, টলয়টা থেকে দুই তিন মাইল দূরে খ্রিষ্টানরা রীতিমতো এক ফৌজ তৈরি করে নিয়েছে। সম্ভবত: এরা টলয়টার ওপর হামলা করে বসবে।

যদি ওরা হামলা করে তাহলে টলয়টার শহরবাসী ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভয়ংকর নাশকতার সৃষ্টি করবে। তখন পুরো টলয়টা বিদ্রোহীরা দখল করে বসবে।

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমের কাছে খুব স্বল্প সংখ্যক ফৌজ রয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি ইউনিট মাত্র। তিনি হুকুম দিলেন,

'এখনই ফৌজের পূর্ণ এক ইউনিট প্রস্তুত হয়ে যাও।'

সেনা ইউনিট প্রস্তুত হয়ে গেলো। ইবনে ওসীম নিজের হাতেই নিলেন ফৌজের নেতৃত্ব। খ্রিষ্টানরা যেখানে ফৌজ তৈরি করে বসে আছে সেদিকে কোচ করা হুকুম দিলেন।

ইবনে ওসীমকে খুব এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো না। কারণ, তিনি এই আত্মতুষ্টিতে রয়েছেন যে, তিনি সাধারণ বিদ্রোহীদের দমন করতে যাচ্ছেন।

তিনি যখন বিদ্রোহীদের দলের সামনে পড়লেন তখনো দেখলেন এর সংখ্যা অনেক কম। তিনি হুকুম দিলেন একটাও যেন জীবিত পালাতে না পারে।

তার ইউনিটের সৈন্যরা সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। বিদ্রোহীরা কিছুক্ষণ বেশ জমে লড়ে গেলো। তারপর পিছু হটতে লাগলো। মুসলিম ফৌজও তাদের পিছ ধাওয়া করলো। আচমকা মুসলিম সেনাদের ওপর এক পার্শ্ব থেকে এবং পেছন থেকে এক দল খ্রিষ্টান ফৌজ হামলে পড়লো। অর্থাৎ তারা এতক্ষণ লুকিয়ে

ছিলো। মুসলমানদেরকে পিছু হটার কৌশল নিয়ে লোভ দেখিয়ে তাদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম এ অবস্থা দেখে তার ফৌজকে পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। তার সৈন্যরা লড়তে লড়তে পিছু তো হটতে পারলো, কিন্তু অর্ধেকেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। তিনি বেশ কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারলেন।

এই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের আগেই তিনি কর্ডোভায় পয়গামবাহক পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজকের এই হঠাৎ লড়াইয়ে নেমে তিনি টের পেলেন, এখানে তার ও তার ফৌজের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে অনেক আগেই।

❋❋❋❋❋

এই লড়াই থেকে মুসলিম সেনা ইউনিটের দুই সিপাহী অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে পারলো। কিন্তু তাদের বেশ পেছন থেকে বিদ্রোহীদের কিছু সন্ত্রাসী পিছু নিয়েছে সেটা তারা প্রথমে টের পেলো না। পেছন থেকে ওরা তীর ছুড়তে শুরু করতেই ওরা টের পেলো কী ঘটতে যাচ্ছে।

কাছেই রয়েছে পাহাড়ি এলাকা। ওরা সেখানে খুব দ্রুত ঢুকে পড়লো। বিদ্রোহীদের ছোড়া তীরগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

মুসলিম সিপাহীরা পাহাড়ি এলাকার নিরাপদ আড়াল পেলেও ওদের সন্দেহ হলো, ওরা এই পাহাড়ি এলাকার গোলাক ধাঁধাপূর্ণ পরিবেষ্টন থেকে বের হতে পারবে কি না। লুকানোর সুবিধা ও নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্য ওরা ঘোড়া ছেড়ে দিলো এবং এদিক-ওদিক লুকোতে চেষ্টা করলো।

ওরা রয়েছে এখন ঘন গাছপালার আড়ালে। বিদ্রোহীরা যে দেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এটার আওয়াজ ওরা পেয়ে গেলো। ওরা পাহাড় বেয়ে ওপরে চলে গেলো। যাতে নিচে ভালো করে দেখতে পায়।

একটু পরই ওরা ওদের বেশ নিচের রাস্তায় দেখতে পেলো ওদেরকে যারা খুঁজছে তাদের চার জনের দলটিকে। ওরা থেমে থেমে চলছে। ওদের একজন বললো,

'বেটারদেরকে এখন খুঁজে পেয়ে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া দরকার। ওরা না আবার আমাদের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে যায়।'

'দেখো দেখো, আরেকজন বললো, ওরা না আবার আরো এগিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। ওরা যদি সে জায়গাটা দেখে ফেলে তাহলে কিন্তু পরিণাম ভয়াবহ হবে।'

দুই মুসলিম সিপাহী তো ওদের জান বাঁচানোর ফিকিরে আছে। কিন্তু ওরা যখন ওদের কথা শুনলো তখন একজন বললো,

'এরা সম্ভবত: সে জায়গার কথা বলছে যে জায়গার ব্যাপারে শোনা গিয়েছে, ওখানে ওদের নেতা রয়েছে। ওখান থেকেই সেই ব্যাটা বিদ্রাহ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডা পরিচালনা করে।"

'শুনেছি ওদের কুমারী মরিয়ম যাকে কবরস্থানে দেখা গিয়েছে সেও নাকি ওদরে ওখানেই থাকে।' দ্বিতীয় সিপাহী বললো।

'আমাদের কমান্ডারকে বলতে শুনেছি, বিদ্রোহের নেতৃত্ব কামার হাশিম নামে এক লোকের হাতে; প্রথম সিপাহী বললো,

'অবিশ্বাস্য এক সুন্দরী মেয়ে রয়েছে তার সঙ্গে। এই মেয়েকে ওরা পবিত্র সত্ত্বা মনে করে।'

'তাহলে বন্ধু আল্লাহর নাম নাও।' দ্বিতীয় সিপাহী বললো, 'সে জায়গাটা খুঁজে বের করো। যদি মরতে হয় কিছু একটা করে মরো। এরা নিজেদের মিথ্যা ধর্মের জন্য যদি প্রতারণা আর ধোকাবাজি করতে পারে তাহলে আমরা আমাদের সত্য ধর্মের জন্য সেই ধোকাবাজিকে ধ্বংসও করতে পারবো।' এদের একজন বলছিলো, আমরা যেন এগিয়ে যেতে না পারি। চলো, আরো আগে গিয়ে দেখি কি আছে?'

ওদের খুঁজে চার বিদ্রোহী এতক্ষণে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মুসিলম দুই সিপাহীর পালানোর রাস্তা একেবারে পরিস্কার ছিলো। কিন্তু ওরা পাহাড়ের ওপরে থেকেই লুকিয়ে ছাপিয়ে নি:শব্দ পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, যেদিকে বিদ্রোহী সাওয়াররা গিয়েছে। নিচ থেকে ওরা আবার কথার আওয়াজ পেলো, সিপাহীরা নিচের দিকে তাকালো। ঐ চার বিদ্রোহীর একজন বলছে,

'একজন একজন করে ছড়িয়ে পড়ো, ওদেরক খোঁজো।'

ওখান থেকেই ওরা এক এক করে কয়েক দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ওখানেই পাহাড়ি প্রান্তর আপাতত শেষ। যেদিকে সিপাহীরা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে পৌছেছে। বিদ্রোহী সাওয়াররা ওখান থেকে অদৃশ্য হতেই দু'জন ওখন থেকে নেমে গেলো এবং সামনের প্রান্তরে চড়তে লাগলো।

ওদের কোথাও নিচে নামতে হলো, কোথাও ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। এরপর ওরা এমন এক জায়গায়, পৌছে গেলো যেখান থেকে নিচের দিকে আর কোন রাস্তা নেই। সামনে উঁচু একটি পাহাড়।

ওরা এদিক-ওদিক তাকালো। ঘন ঝোপ ঝাড় নজরে পড়লো। এর নিচ দু'জন লোককে একটি গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো। এরপর পরই এক রূপসী মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখলো। এদের মনে হলো এর রূপে চারপাশ আলোকিত হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এরাই হবে।' এক সিপাহী বললো, এই দুর্গম বন জঙ্গলে আর কে হতে পারে!'

এসময় ঘোড়ার এক খুর ধ্বনি শোনা গেলো। এক সাওয়ার নজরে পড়লো। দূর থেকেই শ্লোগানের মতো বললো,

'মোবারকবাদ, মোবারকবা! দুশমকে চরম শিক্ষা দিয়ে এসেছি। মুসলমানদের অর্ধেক সৈন্য খতম করে দিয়ে এসেছি।'

গুহা থেকে আরো কিছু লোক বের হলো। সবাই খুশিতে নাচতে লাগলো। মুসলিম সিপাহী দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করলো। চোখে চোখে ওরা পরস্পরকে সমর্থন করলো, ওরা দুশমনের আসল আড্ডখানা পেয়ে গেছে।

সূর্যাস্ত হচ্ছে। ওরা খুব সন্তর্পনে ওখান থেকে সরে পড়লো। একটু দূরে গিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। অন্ধকার গভীর হয়ে গেলে ওরা রওয়ানা করবে। তখন ধরা পড়ার আশংকা অনেকটাই কমে যাবে।

❋❋❋❋❋

'কর্ডোভা থেকে এখনো কোন সেনাসাহয্য এলো না'। মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম তার মহলের হলরুমে ক্রোধে এদিক-ওদিক পায়চারী করছেন। এই পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তার সামনে কয়েকজন সেনা কমান্ডার বসে আছে। ওসীম বললেন,

'পয়গামবাহক বেটাও এখনো ফিরে এলো না। চরম ভোগ-বিলাসপ্রিয় আমীর আব্দুর রহমান তো নিশ্চয় যারিয়াবের গান শুনছেন আর ঐ সুলতানা ডাইনিকে বগলদাবা করে বসে আছেন।'

'কর্ডোভা থেকে সেনা সাহায্য আসার অপেক্ষা না করে আমরা কেন খ্রিষ্টান নেতাদেরকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি না?' এক কমান্ডার বললো, 'ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন, ওরা কী চায়?"

'ওরা যদি দাবী করে, টলয়টার পুরো প্রদেশ আমাদের হাতে তুলে দাও তাহলে এই দাবী কি আমরা মেনে নেবো?' ইবনে ওসীম উত্তেজিত কণ্ঠে

বললেন, 'তোমরা কি এটা বলতে চাচ্ছো যে, আমরা পরাজয় স্বীকার করার পর আমাদের দুশমনের সাথে সন্ধির জন্য ভিক্ষা চাইবো? পবিত্র কুরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধে চলবো?........

পবিত্র কুরআন কী বলেছে জানো? যে পর্যন্ত কাফেরদের ফেতনা ফাসাদ চলতে থাকবে সে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও। ঐ কাফের সন্ত্রাসীদেরকে আমি অনুমতি দিতে পারি না যে, কাফের সন্ত্রাসীরা তাদের সন্ত্রাস আমার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত বিস্তার করুক।'

'আমার উদ্দেশ্য এটা নয়, কামন্ডার বললো, 'বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমি কোন সন্ধি -সমঝোতা করতে বলছি না। আমরা কিছু সময় কালক্ষেপণ করতে চাচ্ছি। সেনা সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত এমন কোন চাল চালতে হবে যাতে বিদ্রোহীদের তৎপরতা কিছুটা বন্ধ রাখা যায়।'

'আমরা যদি সন্ধি-সমঝোতা এবং চুক্তি করার ব্যাপারে এক পা আগে বাড়াই, সেটা আমরা একটা চাল বা কৌশল হিসাবে করলেও আমাদের আমীর একেই নিজের রীতি বানিয়ে নেবে।' মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম বললেন,

'ভোগ বিলাস করে বাদশাহী করার উত্তম পদ্ধতি হলো, বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধ বলো এবং দেশবাসীকে ধোকার মধ্যে রাখো। আর নিজেকে এমন প্রতারণায় ডুবিয়ে রাখো যে, আমরা আল্লাহর সিপাহী এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।'

'এমন এক সময় আসবে যখন আমাদের মুসলমান জাতি দুশমনের সামান্য হুমকিতেই ভয়ে কুকড়ে যাবে। এ নিয়ে বেঁচে থাকতে আপ্রাণচেষ্টা করবে। আর জাতির শাসকরা ইসলামের বীরত্ব-গাঁথা ইতিহাস নিয়ে ম্যিথা গর্বে বুকে ফোলাবে।'

এ সময় দারোয়ান এসে জানালো, এক কমান্ডার সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

'এতে অনুমতির কী প্রয়োজন? ওসীম বললেন, 'কাউকেও বাঁধা দিয়ো না। যে কেউ আমার সাক্ষাতে আসবে সোজা ভেতরে পাঠিয়ে দেবে। আমি বাদশাহও নই। উন্দলুসের আমীরও নই।'

কমান্ডার ভেতরে এলো। তার কাপড় রক্তে লাল।

'তুমি কি যখমী?'

'আমি আমার যখম দেখাতে আসিনি।' কমান্ডার বললো, 'আমি এক শত সিপাহীর একটি দল নিয়ে এক চৌকির সাহায্যে যাচ্ছিলাম। পথে বিদ্রোহীরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। ওদের সংখ্যা এর চেয়ে কিছুটা বেশি ছিলো। আমার

সিপাহীরা যে বীরদর্পে লড়ে যায় তা স্বচক্ষ্যে না দেখলে শুধু বলে বোঝানো যাবে না। তবে আমি আমার সিপাহীদের বীরত্বগাঁথা শোনাতে আসিনি।'....

'এটা শোনাতে এসেছি যে, আমার এক শ থেকে প্রায় এক ষট্টিজন সিপাহী শহীদ হয়ে গিয়েছে। তবে ওরা প্রায় একশত জন দুশমনকে শেষ করে দিয়ে ওদের ঘেরাও ভেঙ্গে গেছে। আর বাকিরা তাদের সঙ্গীদের লাশ ফেলে রেখে, যখমীদেরকে উদ্ধার না করে নিকটস্থ চৌকিতে গিয়ে পৌঁছে।'

'সে চৌকিকে কি বাঁচানো গিয়েছে?'

'না,' কমান্ডার বললো, 'সে চৌকিতে অল্পসংখ্যক জোয়ান ছিলো। এর বিপরীতে বিদ্রোহীদের বিশাল একদল চৌকিকে অবরোধ করে। আমরা গিয়ে দেখি সে চৌকি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আমার যেটা বলা উদ্দেশ্য সেটা হলো, বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি। সে তুলনায় আমাদের সৈন্য সংখ্যা নেহাতই কম।'

'আরেকটা খবর হলে, টলয়টা থেকে কিছু দূরের পাহাড়ি এলাকায় কিছু একটা রয়েছে। বিদ্রোহীদের সাহায্য সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা ওখান থেকেই আসছে। হাশিম কামার ও রূপসী মেয়ে ফ্লোরা খ্রিষ্টানদের পবিত্র ব্যক্তিত্ব হিসাবে আভির্ভূত হয়েছে। এরা দু'জন সম্ভবত: ওই পাহড়ি অঞ্চলের কোথাও গোপন আস্তানা গেড়েছ। তাই এক জানাবায বাহিনী তৈরি করে খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের ঐ মহা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদেরকে ধরতে হবে এবং খতম করে দিতে হবে। এটা আমার শেষ আকুতি।'

'ঐ পাহাড়ি এলাকা সম্পর্কে আমার জানা আছে।' মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম বললেন, 'ওখানে কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। প্রথমে দু'জন গুপ্তচর পাঠিয়ে ওদের আস্তানাটা চিহ্নিত করতে হবে। তারপর জানবায বাহিনী পাঠাতে হবে।'

'আমি গোস্তাখী মাফ চাচ্ছি।' কমান্ডার এবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে কাঁপা কণ্ঠে বললো, 'আপনি এখনো সম্ভব অসম্ভবের ভাষায় কথা বলছেন। আমাদেরকে তো অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাতে হবে। কর্ডোভার প্রতীক্ষায় আর থাকা যাবে না। নিজেদের জযবার ওপর ভরসা রাখতে হবে। যে পর্যন্ত বিদ্রোহী দলের মূল হোতাদেরকে খতম করা না হবে সে পর্যন্ত বিদোহীদের দুর্বল করা যাবে না। আমাদেরকে জান কুরবান করতে হবে... আপনি অধিক প্রতীক্ষায় থাকলে...

কমান্ডার আর কিছু বলতে পারলো না। তার শরীর থর থর কেঁপে উঠলো এবং সে পড়ে গেলো। মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমসহ সবাই ছুটে গেলো তার দিকে।

দেখা গেলো তার পেট একাধিক কাপড়ে ভাজ করা অবস্থায় ফুলে ফেঁপে আছে। পুরোটায় রক্তে চপচপে। কাপড় সরানো হলো। দেখা গেলো, পুরো পেটের মাঝখানে গর্ত করা। কাপড়ের ভাজ দিয়ে নাড়ি-ভুড়ি এতক্ষণে আটকে রেখে ছিলো আল্লাহর এই মহা সৈনিক।

'এই জানবায এখানে যখন আসে তখনও জীবিত ছিলো না।' ওসীম বললেন, 'ওর রূহ ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। অনেক আগেই শহীদ হয়ে গেছে। আমাদেরকে মূল্যবান তথ্য দেয়ার জন্য ওর রূহ এতক্ষণ দুনিয়ার জগতে ছিলো। কিন্তু ইবনে ওসীম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

'জাতির এই আত্মত্যাগ আর পবিত্র আবেগ ভালোবাসা শাসকদের চৌকাঠে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। সেখানে এসব কথা অর্থহীন আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কর্ডোভা থেকে এখনো পয়গাম বাহক ফিরে এলো না। আমাদের আমীর তো বুঝতেই পারেননি এখানে কী অবস্থায় আমরা আছি।'.......

'তিনি না বুঝলেও আমরা তো বুঝি। তিনি সালতানাত আর নেতৃত্বের পূজারী। আমরা স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ। উন্দলুস তার বাপের তো পৈতৃক জায়গীর নয়। আমরা যতদিন বেঁচে আছি আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করে যাবো। মরলে তা পালন করেই মরবো। কিন্তু হাশিম কামারকে কে চিহ্নিত করবে?'

ইবনে ওসীম আকাশের দিকে হাত তুলে কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন, 'তোমার নামে, তোমার এক মাত্র সাহায্যেই আমাদেরকে ভুলে যেয়ো না রাব্বুল আলামীন।'

❋❋❋❋❋

আল্লাহ তাআলা মুক্তিকামী বান্দা স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগকারী মুক্তিযোদ্ধা আর মুজাহিদদেরকে ভুলেন না। তবে ভুলে গিয়েছে কর্ডোভার মসনদধারীরা যে, খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীরা ইসলামের জন্য কত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুফরের তুফান সবকিছু তছনছ করে কেমন ঝড়ো গতিতে এগিয়ে আসছে। যে আব্দুর রহমান ফ্রান্সের ওপর হামলার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন সেই তিনিই টলয়টার বিদ্রোহকে কোন গুরত্বই দিচ্ছেন না।

তার ছেলে সাময়িকের জন্য তাকে যারিয়াব ও সুলতানার মাদকীয়তা থেকে তো বের করে নিয়েছিলো। কিন্তু তাকেও পিতা আব্দুর রহমান ভুল বুঝেছেন।

আব্দুর রহমান তার প্রধান সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ও ওযীর হাজিব আব্দুল কারীমের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও তাদেরকে কথা বলার সুযোগ খুব কমই দিয়েছেন তিনি।

'ইবনে ওসীমকে আমি চিনি।' আব্দুর রহমান বললেন, 'খুব দ্রুত ঘাবড়ে যায়। টলয়টার খ্রিষ্টানদের তো এত বড় মাপের বিদ্রোহ করার সাহসই নেই। আমার ধারণা, এটা ডাকাত সরদারদের লুটেরা দল। যারা নৈশ হামলা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেনাসাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে আপনার কি আমাকে পরামর্শ দেবেন? এখানে কর্ডোভার পরিস্থিতিও যে আমাদের অনুকূলে নয় সেটাও তো আপনারা মমে মনে অনুভব করছেন।'

'সত্যিই যদি ওরা ডাকাত বা লুটেরা দল হয়ে থাকে তাহলে তো মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমের ঘাবড়ানো উচিত নয়। কিন্তু আমাদের কোন ঝুঁকিও নেয়া উচিত হবে না। ওখানকার প্রকৃত অবস্থা কী সেটাও আমাদের তদন্ত করে দেখা উচিত।' উবাইদুল্লাহ বললেন।

❋❋❋❋❋

ওদিকে মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমের কামরা থেকে শহীদ কমান্ডারদের লাশ উঠানো হয়েছে। তিনি তার স্বল্প সংখ্যক সৈন্যকেই অধিক কার্যকরী পদ্ধতিতে ব্যবহার করার কথা ভাবছেন। ইতিমধ্যে তার কাছে আরো তিন চারটি রিপোর্ট এসেছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর রিপোর্ট হলো, টলয়টা শহর এখন কার্যত বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে। এখন তো ইবনে ওসীমের জন্য টলয়টা বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

ইবনে ওসীম কামরায় পায়চারী করছেন। এ সময় কর্ডোভা থেকে কাসেদ ফিরে আসে। ঐতিহাসিকদের মতে আমীরে উন্দলুস জবাবী পয়গামে লিখেন,

'কী ব্যাপার! তোমার কাছে এতো ফৌজ থাকতে সাধারণ ডাকাত ও লুটেরাদের বিরুদ্ধে হিমশিম খাচ্ছো? এদের সঙ্গে যদি কয়েকশ বিদ্রোহীও মিশে যায় তাহলেও তোমার ফৌজের সাথে পেরে উঠার কতা নয়। তুমি এসব কাপুরুষ সিপাহীদেরকে ওদের বিরুদ্ধে পাঠাচ্ছো অথচ তারা ডাকাতদের বিরুদ্ধে পা জমিয়ে লড়তে পারছে না। নিজে বাইরে বের হও এবং ঐ বে আইনী কর্মকান্ডের হোতাদেরকে পায়ে পিষে মারো।'

ইবনে ওসীমের রক্ত যেন টগবগিয়ে উঠলো। তার সামনে পরিস্থিতি এতই ঘোলাটে হয়ে উঠেছে যে, তিনি যদি বিদ্রোহীদের সামনে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পন করতেন তবুও এটা আশ্চর্যজনক বিষয় হতো না। কিন্তু তিনি নিজের মধ্যে অন্যরকম এক জিদের আগুন অনুভব করলেন। তিনি জীবনের শেষ বাজিটা খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

এ সময় দুই সিপাহী ভেতরে এলো।

'তোমরা আবার কী খবর নিয়ে এসোছা' ওসীম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কতগুলো চৌকি ধ্বংস হয়েছে এবং বিদ্রোহীরা কি কি সাফল্য পেয়েছে এই খবর নিয়ে এসেছো?'

'এ ধরনের কোন সংবাদ আমাদের কাছে নেই।' দুই সিপাহীর একজন বললো, 'আমরা সেদিন লড়াইয়ের ময়দান থেকে বের হতেই বিদ্রোহীদের চার সাওয়ার আমাদের পিছু নেয়। আমরা দ্রুত সামনের পাহাড়ি এলাকায় চলে যাই এবং এক জায়গায় লুকিয়ে পড়ি। যে পাহাড়ে আমার লুকাই কিছুক্ষণ পর সে চারজন সে পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ায়। ওদের কথায় বুঝতে পারলাম এসব পাহাড়ের কোথাও বিশেষ কোন জায়গা আছে।

ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা ইচ্ছা করলে এ সুযোগে সেখান থেকে সরে পড়তে পারতাম। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের এই গোপন জায়গাটা দেখতে হবে আমাদের। এবং সেটা আমরা দেখেও এসেছি।'

'ওখানে কী দেখেছো?'

'ওখানে একটা পর্বতগুহা আছে যার ভেতর থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসে।' আরেক সিপাহী বললো, 'তারপর ভেতর থেকে অতি সুন্দরী এক মেয়ে বের হয়।'

'হ্যাঁ, সেটাই', মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'যা খুঁজছিলাম তাই। তোমরা জানো না কত বড় গোপন তথ্য তোমরা উদ্ধার করে এনেছো। এটাই বিদ্রোহীদের আত্মা- বুক বা প্রাণ। আমি সেই বুকে খঞ্জর বসিয়ে দেবো।'

তিনি তখনই তার কমন্ডারদের ডাকলেন।

'আমার মাত্র পনের জন এমন জানযাব আর আত্মত্যাগী সিপাহী প্রয়োজন, যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উম্মত্ততা আছে এবং আছে বিচক্ষণতাও। ওসীম তাদেরকে বললেন।

একটু পরই পনের জন জানবায নির্বাচন করে উপস্থিত করা হলো। ইবনে ওসীম তাদেরকে খুব ভালো করে যাচাই-বাছাই করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন,

'এই দুই সিপাহীর সাথে তোমরা পাহাড়ি এলাকায় যাবে। এক গুহায় নৈশ হামলা চালাতে হবে। ওখানে কাউকে পালাতে দেবে না এবং কাউকে জীবিত পাকড়াও করবে না। শুধু যুবতী একটি মেয়েকে জীবিত পাকড়াও করবে। খ্রিষ্টানদেরকে আমরা দেখিয়ে দেবো, এই যে তোমাদের কুমারী মরিয়াম। যে কবরস্থানে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।'

তিনি কমান্ডারদেরকে আরেকটি নির্দেশ দিলেন,

'আমাদের যত ফৌজ আছে সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করো। এর উদ্দেশ্য হলো, বিদ্রোহীরা মনে করবে টলায়টার ফৌজ পালাচ্ছে। তারপর বিদ্রোহীদের প্রস্তুত করা সৈন্যদের ওপর সুযোগ বুঝে চূড়ান্ত হামলা করা হবে।'

❃❃❃❃❃

রাতের অন্ধকারে দুই সিপাহীর পথ নির্দেশনায় পনের জানবায সেই পাহড়ি এলাকায় পৌছে গেলো যা এক দীর্ঘ এবং প্রশস্ত কেল্লার রূপ নিয়ে তাদের শত্রুদেরকেই সুরক্ষা দিচ্ছে। ওরা এক সঙ্গে পথ চলছে না। প্রত্যেকে একটু ব্যবধান রেখে পথ চলছে।

'আরে কে রে?' ওদের কানে আচমকা এই শব্দ পৌছলো।

সবাই নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যে আওয়াজ দিয়েছে সে এক জানবাযের সামনে এসে পড়লো। আচমকা তার পেছন থেকে জানাবায তার ঘার ধরে সজোরে মটকে দিলো এবং পরক্ষণেই তার বুকে আমুল খঞ্জর বিদ্ধ করে করে দিলো। নৈশ হামলাকারীদের তার লাশ একটা গর্তে ফেলে দিলো।

ওরা আবার আগের নিয়মে চলতে লাগলো। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় আবার কেউ একই ধরনের আওয়াজ করলো। অর্থাৎ এখানেও কেউ প্রহরা দিচ্ছে। সবাই নিঃশব্দে গাছ বা ঝোপ ঝাড়ের পেছনে চলে গেলো। শুধু দুই জানবায সামনে এগিয়ে গেলো।

'তুমি কে ভাই!' এক জানবায কণ্ঠ কাতর করে বললো, আমি তো যখমী, পানি খুঁজে ফিরছি।'

যে আওয়াজ দিয়েছিলো সেও এসে গেলো। তক্ষণে এক জানবায একটি গাছের আড়ালে কোনোকোনি ভাবে প্রস্তুত হয়ে গেছে। সে সামনে আসতেই তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তার বুকের নরম জায়গায় খঞ্জর বসিয়ে দিলো।

এ পর্যন্ত দু'জন বিদ্রোহী দলের প্রহরীকে খতম করা গিয়েছে।

এর অর্থ হলো, প্রহরার ব্যবস্থা ওরা বেশ নিচ্ছিদ্র রেখেছে। জানবাস দলের কমান্ডার বললো।

'আরেকটু সামনে গিয়ে আমরা এই পথ থেকে সরে পড়বো, সিপাহীদের একজন বললো, 'আমাদেরকে অতি দুর্গম রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। তোমাদের সবাইকে একেবারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। একটি পাতা মাড়ানোর শব্দও যেন কোথাও না হয়।'

জায়গাটি মজবুত কোন কেল্লার চেয়ে কম নায়। ওরা এক পাহাড়ের ওপর উঠলো। একটু দুরে আলো দেখা গেলো। দুই জানবায পা টিপে টিপে সামনে এগিয়ে গেলো। ওখানে দুই লোক একটি গর্তে আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে।

নৈশশ হামলাকারীরা ওদেরকেও চোখের পলকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলো।

তারপর ওদেরকে এই পাহাড় থেকে নেমে আরেক পাহাড়ে চড়তে হলো। সেই পাহাড় থেকে নেমে সবাই অনুভব করলো তাদের পা চোরা বালিতে দেবে যাচ্ছে। পথ নিদের্শক সিপাহীরা বললো, সম্ভবত: অন্য কোন পথ আছে। কিন্তু তরা এ রাস্তাই চিনে।

চোরা বালি গভীরতর হচ্ছে। জানবাযরা একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে চোরা বালির পথটুকু পার হয়ে গেলো। ঠান্ডায় ওদের পা জন্মে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু ওরা হাটা থামালো না।

একটু পর ওরা একাধিক কন্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলো। এক জানবায পা টেনে টেনে হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো।

❋❋❋❋❋

ফিরে এসে সেই জানবায জানালো। সে খুব কাছ থেকে ওদের কথা শুনে এসেছে। ওদের কথায় জানা গেছে, ফ্লোরা এখানে নেই। আজ সন্ধ্যার আগে শহরের কোন গির্জায় চলে গেছে। গুহায় ভেতরে বিশ জনের কম লোক হবে না।

ওগুলো সব সন্ত্রাসী। ভেতর থেকে মদের গন্ধ আসছে। গুহার ভেতরে আলো জ্বালানো আছে। গুহার মুখটি বেশ চওড়া।

কমান্ডারের কথায় জানবাজরা সবাই এগিয়ে গেলো। দেখা গেলো, গুহার মুখে তিনজন লোক বসা আছে তীর ধনুক নিয়ে। ওদেরকে ভেতরের লোকেরা দেখতে পাচ্ছে না।

ওরা বিদ্রোহ আর সন্ত্রাস নিয়ে বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে গল্প করছে। মদ ও পান করছে। তিনটি তীর আচমকা তিনজকে বিদ্ধ করলো এবং তিনজনের তীক্ষ্ম আর্তনাদ শোনা গেলো।

আরো তিনজন লোক গুহামুখে আসলো। ওদেরও একই পরিণত হলো। গুহার ভেতরে এখনো বিশজনের মতো লোক আছে। গুহার ভেতরটা অনেক বড় ও প্রশস্ত হলেও সমতল নয়।

গুহার দেয়ালের সাথে বড় বড় পাথর রয়েছে। এগুলোর পেছনে একজন করে লোক লুকিয়ে বসে থাকতে পারবে। গুহার লোকগুলো ঐ পাথরগুলোর দিকে ছুটে গেলো। কিন্তু গুহামুখ থেকে তিনটি তীর এসে আরো তিনজনকে ফেলে দিলো।

এবার ভেতর থেকে তীর ছুটে আসতে লাগলো। কিন্তু এদের এতটুকু হুশ নেই যে, ভেতরের আলো নিভিয়ে দিলে ওদের পজিশন বেশ মজবুত হয়ে যেতো। কিছুক্ষণ তীর বিনিময় হতে লাগলো।

নৈশ হামলাকারীরা এমন দুঃসাহস দেখালো যে, চার জানবায হামাগুড়ি গিয়ে গুহার ভেতরে চলে গেলো। ওদেরকে বাকি জানবাযরা কভার দিতে লাগলো।

পাথরের পেছন থেকে বিদ্রোহীরা এদের দিকে তীর ছুড়তেই গুহা মুখ থেকে বাইরের জানবাযরা তীর ছুড়ে জবাব দিয়ে দিলো যে, ওরা একা নয়, আরো অনেকেই আসছে তোমাদের যমদূত হয়ে।

একটু পর একে একে জানবাযদের সবাই গুহার ভেতর চলে গেলো। পাথারগুলোর পেছন থেকে বিদ্রোহী সন্ত্রাসীরা উঠে দাঁড়ালো। এবার তলোয়ার আর বর্শার সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। একটু পরই এ লড়াই খতম হয়ে গেলো।

ভেতরের সবাই মারা পড়লো। কয়েকজন গুরুতর যখমী হলো। তিন জানবায শহীদ হলো এবং দু'জন হলো যখমী। জানবাযদের কমান্ডার এক আহত বিদ্রোহীকে জিজ্ঞেস করলো,

'তোমাদের নেতা হাশিম কামার কোথায়?'

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলো একটি লাশের দিকে। তার দেহে দুটি তীর বিদ্ধ হয়েছে। তার লাশ টেনে বাইরে বের করা হলো।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। ইবনে ওসীম বেশ অস্থির হয়ে আছেন। তিনি বার বার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন। তার সামনে তিন কমান্ডার রয়েছে। বাইরে ফৌজ প্রস্তুত হয়ে বিশ্রাম করে নিচ্ছে।

অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হলো। ঘোড়ার খুর ধ্বনি শুনতে পেয়েই মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম ওদিকে দৌড়ে গেলেন। বাইরে দশজন নৈশহামলাকারী ও পথ নির্দেশক দুটি সিপাহী দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের সামনে শোয়ানো তিন শহীদের লাশ ও দুই যখমী। এদের একটু দূরে আরেকটি লাশ পড়ে আছে।

'এটাই কি হাশিম কামারের লাশ।' ইবনে ওসীম জিজ্ঞেষ করলেন।

'হ্যাঁ, টলয়টার সন্ত্রাসীদের হোতা ছিলো এই হাশিমই।'

'এর লাশ শহরের দরজার সঙ্গে ঝুলিয়ে দাও।' ইবনে ওসীম হুকুম দিলেন, 'যাতে সব খ্রিষ্টান ও ওদের সন্ত্রাসীরা দেখতে পায়। ভোরের আগেই এর লাশ ঝুলিয়ে দিয়ে আসো। তারপর আমরা ফ্লোরাকে দেখবো।'

হাশিমের লাশ একটি ঘোড়ায় উঠানো হলো। এক অভিজ্ঞ গুপ্তচর তার লাশ নিয়ে যাচ্ছে। সে খ্রিষ্টানদের ছদ্মবেশ নিয়েছে। সে বিদ্রোহীদেরকে বলবে, সেও বিদ্রোহীদের একজন। অনেক দূর থেকে এসেছে।

এই গুপ্তচরের দ্বিতীয় কাজ হলো, সে বিদ্রোহী ফৌজের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দেবে যে, কামার হাশিমের লাশ শহরের দরজায় ঝুলছে। রাতে কর্ডোভা থেকে বড় শক্তিশালী এক ফৌজ এসেছে। কিন্তু এরা কোথায় তাঁবু ফেলেছে এটা কারো জানা নেই।

❋❋❋❋❋

টলয়টায় সকাল হচ্ছে। এর মধ্যে বিদ্রোহীদের ঘরে এ খবর পৌছে গেছে যে, তাদের আধ্যাত্মিক নেতা ও বিদ্রোহের আসল প্রাণ কামার হাশিমের লাশ শহরের ফটকের সামনে একটি গাছে ঝুলে রয়েছে।

যে লোক লাশ ঝুলিয়েছে, তাকে বলা হয়েছিলো, শহরের ফটকে লাশ ঝুলাতে। কিন্তু সে এসে দেখে ফটকে প্রহরী রয়েছে। তাই সে লোক নিঃশব্দে গাছের মধ্যে লাশটি ঝুলিয়ে দেয়।

বিদ্রোহীদের মধ্যে এখন আর আগের সেই স্বতঃস্বফূর্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ফ্লোরার ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হলো, সে মরা গেছে। ফ্লোরার সাথে যার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে সে তার লাশ এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

এটাও ছড়িয়ে দেয়া হলো, ফ্লোরা আসলে একটা ধোকা ছিলো। সে বিয়ে ছাড়াই এক লোককে তার স্বামী বানিয়ে নিয়েছে। এর আগে তার সাথে আরেক পুরুষের সম্পর্ক ছিল। সেই হিংসার বশবর্তী হয়ে ফ্লোরাকে হত্যা করেছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম খ্রিষ্টানদের ছদ্মবেশে কিছু লোককে শহরে পাঠিয়ে দেন। সকাল হতেই তারা ইবনে ওসীমকে জানায়, তার এই পরিকল্পনাকে মহান আল্লাহ সফল করে দেখিয়েছেন।

শহরের বাইরে বিদ্রোহীদের অর্ধেক লশকর তাঁবু ফেলে অবস্থান করছিলো। এরা হাশিমের লাশ দেখতে চলে গেছে। শহরের দরজার বাইরে এরা লাশ দেখার জন্য বিশাল ভিড়েরর সৃষ্টি করেছে। কেউ এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম তার সামান্য সংখ্যক ফৌজ প্রস্তুত রেখেছেন। রাতে ইবনে ওসীম ফৌজের উদ্দেশ্যে বলেন,

'তোমরা আল্লাহর সিপাহী। নিজেদের ও দুশমনদের সংখ্যার দিকে তোমরা দৃষ্টি দিয়ো না। আল্লাহর রাসূল কখনো দেখেননি, মুসলমানদের চেয়ে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা কম না বেশি। কাফেরদের সংখ্যা সবসময়ই বেশি ছিলো আর জয় হয়েছে মুসলমানদেরই। আজ রাসূলে খোদার মহান রূহ নিজেদের বুকে জাগ্রত করে নাও।'....

'এটা মনে করো না খ্রিষ্টানরা তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করছে। বরং আসল ব্যাপার হলো, খ্রিষ্টানরা ইসলামের ওপর বিজয় লাভ করছে। এটা দেখছো না যে, কর্ডোভার মহলগুলো ভোগবিলাসে ডুবে আছে। শাসকরা কী করে বেড়াচ্ছে? এরা দুনিয়ার পূজারী। এই দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য ব্যকুল।'....

'তোমাদের প্রকৃত জীবন তো এই জীবনের পর শুরু হবে। বিদ্রোহীদের কাছে আমরা একবার পরাজিত হয়েছি। সে পরাজয়কে পরম বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হবে আমাদের। টলয়টা এখন ঐ কাফের সন্ত্রাসীদের দখলে। ওরা

মুসলমানদেরকে যে হিংস্রতার টার্গেটে পরিণত করেছে সেটা তোমরা আজ হারে হারে টের পাচ্ছো। তাই তোমরা কি এই চরম অপমানের প্রতিশোধ নেবে না?'

'আমরা প্রতিটি রক্তের ফোঁটার প্রতিশোধ নেবো। আমরা লড়বো, মরবো।' ফৌজ শ্লোগান দিয়ে উঠলো, 'কর্ডোভা থেকে সাহায্য না এলে কর্ডোভার সিংহাসন উল্টে দেবো। আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবো। আমাদের শহীদ ভাইদের রক্তের হিসাব চুকিয়ে দেবো।'

এরপর আর মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম কিছু বলতে পারলেন না। কারণ, খবর এসেছে! কামার হাশিমের লাশ দেখতে বিদ্রোহীরা লাশের কাছে ভিড় করছে।

তিনি ফৌজকে তৎক্ষণাৎ কোচ করার হুকুম দিলেন।

ব্যবধান বড় জোড় দুই মাইল। তিনি তার ফৌজকে ছড়িয়ে দিলেন। এখন ফৌজ এক মাইল লম্বা সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে এগুচ্ছে। ঘোড়ার গতি পদাতিক সিপাহীর সমান রাখা হলো। হামলার নেতৃত্ব রইলো মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমের হাতে।

পথে পড়লো বিদ্রোহী লশকরের তাবুর শিবির। শিবির পুরোটাই খালি। সকাল হওয়াতে নাস্তা তৈরির জন্য আগুন জ্বলছে। হুকুম পেয়ে সিপাহীরা পুরো শিবিরে আগুন লাগিয়ে দিলো। বিদ্রোহীর সৈন্যরা শহরের সামনে প্রচন্ড ভিড় করে আছে। এই ভিড় থেকে হৈ চৈ করে আওয়াজ উঠলো,

'আসছে... হামলা আসছে। ফৌজ আসছে। এতো কর্ডোভার ফৌজ, কর্ডোভার ফৌজ আসছে।'

লোকদের মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে গেলো। দিশেহারা হয়ে একে অপরকে মাড়িয়ে দিক-বিদিক হতে লাগলো।

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম হামলে পড়ার হুকুম দিলেন। ফৌজ ছড়ানো ছিটোনো বিন্যাস অক্ষুণ্ন রেখেই সপাটে ছুটে আসতে লাগলো। বিদ্রোহী সন্ত্রাসলীরা এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করলো। কিন্তু পালানোর সময় নেই, আর পালানোর পথও ফৌজ আটকে দিয়েছে। এটা খোলা এবং সমতল এক ময়দান।

যে সব বিদ্রোহীর কাছে অস্ত্র রয়েছে তারা লড়াইয়ে নেমে গেলো। আর যারা শহরের দরজা দিয়ে ভেতরে যেতে পারলো তারা ভেতরে চলে গেলো। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ভিড়ের চাপে পায়ের নিচে পড়ে পিষ্ট হয়ে গেলো।

বিদ্রোহী যারা লড়তে এলো তারা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই লড়লো। কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। সবগুলো মারা পড়লো। ইতোমধ্যে শহরের ভেতর

থেকে বিদ্রোহীরা শহরের ফটক লাগিয়ে দিলো। আর প্রাচীরের ওপর থেকে শুরু হয়ে গেলো তীর বৃষ্টি।

ইবনে ওসীমের এই ফৌজ যেমন চারদিকে ধুলো উড়িয়ে তুফানের মত আসছিলো তেমনি তুফানের মতোই পিছু হটে গেলো।

সন্ত্রাসীদের অর্ধেক সৈন্য মারা পড়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে ওসীমের কাছে এত বড় শহরকে অবরোধ করার মতো তো সৈন্যবল ছিলো না।

❋❋❋❋❋

মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম এক গাছতলায় বসে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা তার দুআ শুনলেন।

ইতিহাসে একে অলৌকিকতা বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দিনই সংবাদ এলো, আব্দুর রহমানের ছেলে উমাইয়্যার নেতৃত্বে সেনা সাহায্য আসছে। ইবনে ওসীম ঘোড়া সাওয়ার হয়ে তাকে সংবর্ধনা দিতে চলে গেলেন।

ইতিহাসে এটা উল্লিখিত হয়নি যে, উমাইয়্যা আব্দুর রহমানের কোন স্ত্রীর ছেলে। মুদ্দাসসিরা তখনো যুবতী। উমাইয়্যার বয়স তখন বিশ একুশ বছর।

উমাইয়্যা তার ফৌজ নিয়ে যথা সময়ে পৌছে গেলো। মুহাম্মদ ইবনে ওসীম তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অনেক সময় আলিঙ্গনাবদ্ধ রাখলেন। যেন হারানো সন্তানকে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়েই আকাশের দিকে হাত তুলে কান্নাভেজা কণ্ঠে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বললেন,

' রাব্বুল আলামীন! জানতাম, তোমার এই বান্দা পাপিষ্ঠ হলেও তাকে তুমি তোমার অফুরন্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবে না।'

'আব্বাজানকে বাধ্য করার পরই তিনি কিছু ফৌজ নিয়ে আমাকে টলয়টা পাঠিয়েছেন।' উমাইয়্যা জানালো ইবনে ওসীমকে।

ইবনে ওসীম এখানকার আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে উমাইয়্যা জানালেন। সে রাতেই টলয়টা অবরোধ করা হলো। শহরের দরজায় হামলা করা হলো। কিন্তু প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তীরান্দাজরা কোন চেষ্টাই সফল হতে দেয়নি। প্রাচীরের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়। এটাও ব্যর্থ হয়।

অবরোধ অনেক দিন রইলো। কিন্তু সফল হলো না। উমাইয়্যা অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার হুকুম দিয়ে দিলো। বিদ্রোহীরা এটা দেখে হয়রান হয়ে গেলো যে, কর্ডোভার ফৌজ শুধু অবরোধই উঠালোই না, ফৌজ ফিরে যাচ্ছে।

বিদ্রোহীদের নেতারা হৈ চৈ করে বলে উঠলো, 'এই ফৌজকে জীবিত ফিরে যেতে দেয়া হবে না। এদের পিছু ধাওয়া করো।'

শহরের ফটক খুলে দেয়া হলো। হাজারো অশ্বারোহী ও পদাতিক এমনভাবে বের হলো যেন নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

কর্ডোভার ফৌজ ততক্ষণে কালট্রাড নামক পাহাড়ি এলাকার কাছে পৌঁছে গেছে। পেছনে পেছনে বিদ্রোহী সন্ত্রাসীদের আসতে দেখে উমাইয়্যা তার ফৌজকে পালানোর হুকুম দিলো।

ফৌজ পালানোর জন্য দ্রুত ছুটতে শুরু করলো এবং পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। বিদ্রোহীরা তো এবার বাঘের মতো দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। তাদের সওয়াররাও সপাটে ছুটে পাহাড়ে ঢুকে পড়লো।

যখন দুশমনের পুরো বাহিনী পাহাড়ে ঢুকে পড়লো তখন তাদের ওপর পাহাড়গুলোর ওপর থেকে তীরের বর্ষণ শুরু হলো।

মায়সারা নামে এক নওমুসলিমের পরামর্শে উমাইয়্যা বিদ্রোহী সন্ত্রাসীদের জন্য এই মরণঘাতের জাল বিস্তার করে।

খ্রিষ্টানরা জয়ের নেশায় বড়ই বোকামি করে বসলো এবং কমান্ডার মায়সারা ও উমাইয়্যার জালে পা দিলো। মায়সারার তীরান্দাযরা তাদেরকে বেছে বেছে মারতে শুরু করলো।

এরা পেছন দিকে ভাগতে চাইলে উমাইয়্যার সৈন্যরা শুরু করলো তীর আর পাথর বর্ষণ।

ঐতিহাসিকরা লিখেন,

'কালট্রাডের পাহাড়ি এলাকায় খ্রিষ্টান বিদ্রোহী সন্ত্রাসীদের এত বেশি রক্ত ঝরেছে যে, ঘোড়ার খুরাঘাতে রক্তের ছাট উটতে লাগলো। হাতে গোনা দু'চারজন বিদ্রোহী ছাড়া আর কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেনি।

মায়সারা তখনো পাহাড়ের উচ্চতা থেকে তার ইউনিটের সেনাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলো। মায়সারা একজন প্রবীণ কমান্ডার হওয়ার পরও এত বেশি রক্ত ও লাশ দেখে এক পর্যায়ে অচেতন হয়ে পড়ে যায়। আর তিন দিন পর মারা যায়।

পরিকল্পনা মতো মুহাম্মাদ ইবনে ওসীম তার বিজয়ী ফৌজ নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। টলয়টা শহর এখন নীরব, শান্ত এবং সন্ত্রাসী ও জঙ্গিমুক্ত।

সুলতানা মালিকায়ে তরূবের বয়ষ এখন পঞ্চাশ ছুই ছুঁই। আব্দুর রহমানের বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। যারিয়াবেরও একই বয়স। সুলতানার একমাত্র ছেলে আব্দুল্লাহ উনিশ বিশ বছরের যুবক।

আব্দুর রহমানের চিন্তা-ভাবনা ও স্বভাবে কিছুটা পরিবর্তন এসেছ। যারিয়াবের মধ্যেও আগের সেই ধার ও তীক্ষ্মতা নেই।

আমীর আব্দুর রহমান হলেও কিছুদিন তো কার্যত: বাদশাহী করেছে যারিয়াব। তার মুখের জাদু আর সুরের মুগ্ধতা দিয়ে আমীর আব্দুর রহমানকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছে। তার মাথায় শাহেন শায়িতের ভূত সাওয়ার করে দিয়েছে।

উন্দলুসের ফৌজে ছিলো কিছু ইসলামী গণতন্ত্রকামী এবং স্বাধীনতাকামী সেনা কর্মকর্তা। যারা আব্দুর রহমানের মাথা থেকে কোন এক সময় 'বাদশাহী' এর ভূথ নামাতে সক্ষম হয়। আর না হয় আব্দুর রহমানের শাসনামলেই উন্দলুস খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যেতো।

যারিয়াবের তীক্ষ্ম মেধার প্রশংসা সব ঐতিহাসিকই করেছেন। সে বেশ কয়েক বছর পর এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, এখানে সালারে আলা উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ, হাজিব আব্দুল করীম, সালার আব্দুর রউফ, মুসা ইবনে মুসা, সালার ফারতুন এবং আব্দুর রহমানের ভাই মুহাম্মাদের মতো বিচক্ষণ মর্দে মুজাহিদদের সঙ্গে আর বেশি দিন পেরে উঠবে না। মহলে তার যে অবস্থান সেটা থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

সে তো তার অবস্থান এতো উচুঁতে নিয়ে গিয়েছিলো যে, যাকে সে চাইতো তাকে আমীরে উন্দলুসের চোখে আকাশে উঠিয়ে দিতো এবং যাকে খুশি তাকে আস্তকুড়ে নিক্ষেপ করতো।

কিন্তু তার উপলব্ধি হওয়ার পর নিজ থেকে সে তার অবস্থান কিছুটা নিচে নামিয়ে ফেলে। সে তার সুর সঙ্গীতে মগ্ন হয়ে যায়। তবে সুলতানার প্রেম সে তার মন-মস্তিষ্ক থেকে কখনো নামাতে পারেনি। সুলতানা তার জন্য ছিলো এক উম্মাদনার নাম।

'আমার সুর ছন্দে সেই প্রাণ ও সেই আয়েশ আমি খুঁজে পাই না যা তোমার রূপের মাধুরীতে আমি অনুভব করি।' যারিয়ার সুলতানাকে সবসময় বলতো। 'আমি এখনো তোমার হাসির জলতরঙ্গ আমার সুর তরঙ্গে সৃষ্টি করতে পারিনি।'

যারিয়াবের সামনে সুলতানা থাকলে তার চেতনার জগতই যেন লোপ পেয়ে যেতো। সুলতানা তখন তাকে বলতে শুরু করতো, তুমি এখন বিয়ে করে নাও।

'আমার মনে ও আমার জীবনে অন্য কোন মেয়ে আসতে পারবে না।' যারিয়াব একদিন তাকে শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়। এটা পচিশ বছর আগের কথা। সে তখন বলে, 'তুমি থাকলে আমার সবকিছু আছে।'

'কিন্তু আমি তো আমীরে উন্দলুসের।' সুলতানা তাকে বলতো, 'তুমি তো আমাকে হেরমের চার দেয়াল থেকে ছিনতাই করে নিতে পারবে না। তোমার সাথে আমি পালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়? কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়ার আগেই ধরা পড়ে যাবো আমরা। তখন আমাদের পরিণাম কী হবে সেটা তো তুমি ভালো করেই জানো।'...

'আমাকে নিয়ে ঘর-সংসার বাঁধার স্বপ্ন তাই তুমি মন থেকে দূর করে দাও। কিন্তু আমাকে সবসময় তোমারই মনে করো। আমি কি তোমাকে শত সহস্রবার আমার জায়গীরে নিয়ে যাইনি? দিনে কিংবা রাতের নির্জনতায় তোমার ও আমার দেহের মাঝখানে আর কাউকে আমি রেখেছি? না কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? তোমার কাছেই আমি আমার কাংখিত আনন্দ আর তৃপ্তি পাই। এটাই আমাকে বাঁচার প্রেরণা দেয়।'

এক সময় তো সবার জীবনেই পরিবর্তন আসে। সাবই বদলে যায়। পরিবর্তন আসে স্বভাবে চরিত্রে এবং চিন্তা-ভাবনাতেও। এর মধ্যে উন্দলুসের নদীগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বহু পানি। উন্দলুসের অলি-গলি, ময়দান ও উপত্যকায় ঝরে গেছে বহু রক্ত। কিন্তু সুলতানার স্বভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি।

তার জীবেন শুধু এতটুক পরিবর্তন এসেছে, সে এক সন্তানের মা হয়েছে। সে উন্দলুসের সম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তার এই স্বপ্ন এক মারিচিকা ছাড়া কিছুই প্রমাণিত হয়নি। এজন্য সে খ্রিষ্টান নেতাদের সাথে সবসময় সম্পর্ক রেখেছে। তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রে তার কালো হাত রয়েছে সবসময়।

আব্দুররহমানের সিংহাসন উল্টানোরও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। ভয়ংকর কালনাগিনীর চরিত্র কখনো বদলায়নি। পঞ্চাশে এসেও তার এই রূপ কখনো ধারবিহীন হয়নি।

আসলে সুলতানা তার বয়সকালকেই মেনে নেয়নি।

এখনো সুলতানা নিজেকে যুবতীই মনে করে। তার রাজকীয় জীবনে তো কোন দুশ্চিন্তা বা পিছুটান নেই। চোখ মুখের সজীবতা এতটুকু ম্লান হয়নি। কমেনি মাথার চুলের উজ্জলতা।

একদিন তার এক খাদেমা তার মাথা আচড়ে দিচ্ছিলো। খাদেমা চিরুনি রেখে একটি চুল মাথ থেকে উঠালো, সুলতানা, 'উফ' করে উঠলো। সে খাদেমাকে জিজ্ঞেস করলো,

'কী ব্যাপার? মাথায় কি করেছো?'

'একটা পাকা চুল মাথা থেকে উপড়ে ফেলেছি।'

'মিথ্যা কথা। এখনই পাকা চুল?' সুলতানা বললো।

বৃদ্ধা খাদেমা হেসে উঠলো এবং রূপালী বর্ণের চুলটি তার সামনে এনে রাখলো।

'একটাই নয় মালিকা!' খাদেমা বললো, 'আরো বেশ কয়েকটা আছে। আপনি তো স্বর্ণাকেশী। তাই পাকা চুলগুলো ভালো করে নজরে পড়ে না। এই তো এখানে কয়েকটা আছে।'

'কয়েকটা আছে?' সুলতানা এমনভাবে বললো যেন তাকে তার কোন প্রিয়জনের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে।

'হ্যাঁ, মালিকায়ে তরূব!' খাদেমা বললো, 'কয়েকটি পাকা চুলে এত বিস্ময়! আপনি এত ঘাবড়ে গেলেন কেন? চুল তো সাদা হবেই। একদিন মৃত্যুও হবে। যৌবন তো আমিও দেখেছি। আর এমন রূপ ছিলো আমার যে, আমীর, ওযীর, সালাররা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতো।'

'বর্তমান আমীরে উন্দলুসের বাপ আল হাকাম আমাকে দেখে তো তাঁর ব্যক্তিগত আস্তাবল থেকে আমার বাপকে একটি আরবী ঘোড়া যিনসহ এবং একটি তলোয়ারও দেন। যার বাটে ছিলো দু'টি জ্বলজ্বলে হিরা। তারপর আমার বাবাকে বিশেষ মর্যাদাও দান করেন। আর আমাকে তার জন্য নিশ্চিত করেন।'....

'আমিও মনে করতাম, রূপ যৌবনের কোন ক্ষয় নেই। আমার মাথার প্রথম পাকা চুলটি আমাকে ক্ষ্যাপিয়ে দিয়ে ছিলো। আমি চুলটি আক্রোশে ছুড়ে মারি। কিন্তু কিছু দিন পরই মানতে বাধ্য হই, যে চুল আমীরে উন্দলুসের শিকলের মতো পেচিয়ে ধরেছিলো সে চুল সাদা হয়ে এখন অর্থহীন হয়ে যাবে। এটা মেনে নিই যে, আমার রূপের চমক আর কোন দিন কাউকে আকর্ষিত করবে না।'....

'মালিকায়ে তরূব! তখন থেকে আমি মহলের বোঝা হয়ে গেলাম। হেরেমের আস্তকুড়ে আমাকে নিক্ষেপ করে। সে সব মেয়ের দিনও দেখেছি যাদের চারপাশে সখিরা ঘুরেছে। আমীর পুত্ররা তাদের পানি গ্রহণের জন্য তাদের কাছে ছুটে এসেছে। তাদের ইশারায় পুরো মহল নাচতো। সেই তারাও অচল মুদ্রা হয়ে গেছে। আমার বয়স পছাত্তর হয়ে গেছে। আমি হেরমের প্রতিটি মেয়ে, নর্তকী ও গায়িকাদের জন্য এক শিক্ষনীয় উদাহরণ।'

'মালিকা!' আপনি এই বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নিন যে, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমানও প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। এখন কোন রূপবতী যুবতী মেয়েই তার মধ্যে সেই আবেগ আর যৌবনের আমেজ জাগিয়ে তুলতে পারবে না।'

সুলতানা তার অতীতে হারিয়ে গেলো। উদাম চোখে ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর নিঃশব্দে উঠে কামরায় পায়চারী করতে লাগলো।

'মালিকায়ে তরূব!' খাদেমা বললো, 'আপনি এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন কেন? আপনি সৌভাগ্যবতী যে, আমীরে উন্দলুস আপনাকে এখনো আপনার সেই অবস্থান থেকে বঞ্চিত করেননি। আমি তো আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনি সবসময় আপনার মনের কথা আমাকে বলেছেন। এজন্য আমি আপনাকে বাস্তব কথাটা বলে দিয়েছি। আপনাকে আমি পেরেশান করতে চাইনি।'

'আমি জানি!' সুলতানা বললো, 'তোমার আন্তরিকতা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমীরে উন্দলুস আমাকে আমার অবস্থান থেকে ছুড়ে মারেননি। তবে বছর খানেক হয়ে গেলো তিনি আমাকে তার কাছে যেতে আর আগের মতো ডাকাডাকি করেন না। আমি নিজ থেকে কখনো উনার কাছে গেলে তিনি কোন ব্যস্ততার কথা তুলে আমাকে চলে আসতে বলেছেন। এখন আমার নিঃসঙ্গ জীবন কাটছে। যারিয়াব না থাকলে হয়তো আমি বেঁচে থাকতে পারতাম না।'

'আপনার ছেলে সদ্য যুবক। তাকে খোদা দীর্ঘজীবন দান করুন।' খাদেমা বললো, 'ওর জন্যই এখন আপনার বাকি জীবনটুকু বিলিয়ে দিন। তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে গড়ে তুলুন। আমীরে উন্দলুস বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন। যে কোন সময় তাঁর মৃত্যু হতে পারে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি তো গত বিশ বছর ধরে এ চেষ্টাই করে যাচ্ছি। কিন্তু আমীরে উন্দলুস এ ব্যাপারে কখনো কোন কথা বলেননি। এর অবশ্য কারণও আছে। আমার ছেলে স্বভাব-চরিত্রে বিগড়ে গেছে। আমি তো ওকে শাহজাদা বানিয়েছি। কিন্তু ও আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ওকে আমি শাহসাওয়ারী ও তীরান্দাজী শিখতে সেরা উস্তাদের কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে কোথাও চলে গেছে। টাকা-পয়সা উড়ানো ছাড়া আর কিছুই শিখেনি সে।'

'যে টাকা-পয়সা উড়াতে জানে না সে আবার কিসের শাহজাদা! আমীরে উন্দলুসের পয়তাল্লিশজন ছেলে রয়েছে। এর মধ্যে বিলাসী আর অপব্যয়কারী তো সবাই।'

সুলতানা আয়নার সামনে গিয়ে বসলো। আরেকটি পাকা চুল তার নজরে পড়লো। মুখটা যেন অভিমানে ফুলে উঠলো।

'তুমি যাও। যারিয়াব যদি ব্যস্ত না থাকে ওকে বলো সুলতানা ডেকেছে।' সুলতানা খাদেমাকে বলে আবার আয়নার দিকে মনোযোগ দিলো।

খাদেমা চলে যাওয়ার পর সুলতানা প্রথমে আয়ানার সামনে গেলো। নিজের চেহারা মনোযোগ দিয়ে দেখলো। তারপর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

একটু পর কামরায় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। যারিয়াব হাসি মুখে কামরায় ঢুকলো। কিন্তু সুলতানার মুখে সেই হাসি নেই।

'চিন্তিত মনে হচ্ছে সুলতানা! যারিয়াব বললো এবং তাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে টেনে এনে পালংকে বসিয়ে দিলো বললো, আমার মুখটা এভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখছো কেন?'

'গতকাল যখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে তখন তো তোমার চেহারায় এমন বার্ধক্যের ছাপ দেখিনি। আজ সেটা দেখা যাচ্ছে।' সুলতানা চিন্তিত মুখেই বললো।

তোমার খাদেমা আমাকে বলেছে তুমি আজ বেশ পেরেশান।' যারিয়াব বললো, 'সে এর কারণও বলেছে যে, তোমার মাথা থেকে আজ পাকা চুল উদ্ধার করেছে। এই পাকা চুল আবিস্কারের আগে তুমি তোমাকে এবং আমাকে যুবকই মনে করতে। নিজের বার্ধক্যের অনুভূতি-উপলব্ধি তোমার ভেতরটা এমনভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে যে, তোমার চোখে এখন আমাকেও বুড়ো লাগছে।'......

'আমরা সত্যিই বার্ধক্যের উপনীত। এতে তো দুশ্চিন্তার কোন কিছু নেই। বার্ধক্য মানুষের ব্যক্তিত্ববোধকে শুধু বাড়ায়ই না তীক্ষ্ণও করে। বার্ধক্য আসার আগে তো মানুষ পুর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে না। আমি কিন্তু বার্ধক্যে পৌছে নিজের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করছি।'

সুলতানা আরো পেরেশান আর অস্থির হয়ে গেলো। তার মাথা যারিয়াবের বাস্তব দর্শন গ্রহণ করছে না। সে যারিয়ারের কাছেই শুনতে চায়, সে বয়স্কা হয়নি। তার প্রয়োজন সান্ত্বনার।

'তুমি কি আমাকে একটু ভালো ভালো কথা শোনাতে পারো না?' সুলতানা কিছুটা চাপা অসন্তোষ নিয়ে বললো, 'তুমি তো আমার কাছে এসে এই জগৎ থেকে অন্য জগতে চলে যেতে। এখন কি আর আমার প্রতি সেই ভালোবাসা নেই?'

'আগের চেয়ে অনেক বেশি আছে।' যারিয়ার বললো, 'কিন্তু সে সময়টা আমরা অতীত করে এসেছি যে সময়তে আর ফিরে যেতে পারবো না। সে সময়ের জন্য আক্ষেপ করাটা অনেক বড় বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার এই ভয়াবহ দুশ্চিন্তার কারণ হলো, সময় এগিয়ে যাচ্ছে আর তুমি পেছন দিকে পালানোর পথ খুঁজছো। অধরা অতীতকে ভুল যাও সুলতানা! যে মুহর্তগুলো তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে তা থেকেই শান্তির পরশ খুঁজে নাও।'

'হ্যাঁ যারিয়াব!' সুলতানা বললো, 'তুমি হেয়ালি করলেও এটা ঠিক যে, আমি হারানো দিনে পালিয়ে যেতে যাচ্ছি। অতীতের মায়াজাল থেকে বেরোতে চাচ্ছি না আমি। আগের মতো রূপসী না থাকলেও রূপমা, স্মৃতি আর কল্পনা দিয়ে নিজেকে রূপবর্তী করে রাখবো।'...

'নিঃসঙ্গতা আমাকে দংশন করে যাচ্ছে। অজানা এক ভয় আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আগের রূপ নিয়ে আমার সাথে কথা বলো যারিয়াব। তোমার কাছে তো শব্দের ভান্ডার আছে। শব্দের ওপর বহন করে আমাকে অতীতে নিয়ে চলো।'....

'তোমার সুঠাম বাহুতে কি সেই শক্তি নেই যারিয়াব? আমাকে একটু শক্ত করে ধরছো না কেন? আমার মনের মধ্যে কমপক্ষে এটা ঢুকিয়ে দিয়ো না যে, আমি এক ঝরে যাওয়া শুকনো ফুল; গাছের ছায়ায়ও যার আশ্রয় নেই।'

'তোমার এই শরীর সর্বস্ব মনমাসকিতা থেকে কি তুমি মুক্ত হতে পারো না?' যারিয়াব বললো, 'নিজের ভেতরের আত্মাকে জাগিয়ে তোলো। দেহের বার্ধক্য আত্মার যৌবন নিয়ে আসে। আমি আমার দেহের শক্তিকে আত্মায় বহন করে নিয়েছি।'

সুলতানা ভীতু শিশুর মতো যারিয়াবের বুকে লুকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু যারিয়ার উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি মিথ্যা আশ্রয় খুঁজছো। গতকালের স্মৃতিকে আকড়ে ধরে আজকের বাস্তবতা থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছো। নিজের মেধা আর বুদ্ধিকে তার আসল ঠিকানায় প্রয়োগ করো। তারপর আমি তোমার সাথে অতীতের কথা বলবো।'

এক পেয়ালা শরাব পান করার পর সুলতানার যৌবন আবার যেন ফিরে এলো। তার অঙ্গ-ভঙ্গি আবার আবেদনময়ী হয়ে উঠলো। দু'হাতে যারিয়াবের গলা জড়িয়ে ধরলো।

'যারিয়াব! আমি তোমার দাসী! সুলতানা কাতর কণ্ঠে বললো। 'একমাত্র তুমিই আমাকে মন থেকে ভালোবেসেছো। আমি আমীরে উন্দলুসকে এতটুকু সন্দিহান হতে দেইনি যে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন ইউগেলিসের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর আমি তার সিংহাসন উল্টানোর চেষ্টা করেছি সব সময়। কিন্তু তোমর বিরুদ্ধে আমার সব সময় এ অভিযোগ ছিলো যে, এ কাজে তুমি আমাকে অতটা সঙ্গ দাওনি।'

'আমি সঙ্গ দিলেও তুমি ও ইউগেলিস কখনো সফল হতে না। আমি পঁচিশ বছর আগে আমার বিবেক আমি এজন্য পরিস্কার করে নিই যে, বার্ধক্যে পৌঁছে যেন আমি অনুতপ্ত ও লজ্জাবতন না হই। এর পরিণামেই আজ আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত এবং ভারমুক্ত।'

যারিয়াব সুলতানার হাত থেকে শরাব নিয়ে এক ঢোক পান করে পাত্রটি রেখে দিলো। তার মাথার চুলেও কোথাও কোথাও পাক ধরেছে। কিন্তু এই বয়সেও সে সুলতানাকে আগের মতোই ভালোবাসে।

❋❋❋❋❋

'পুরনো একটি কথা আমার মনে পড়েছে।' সুলতানা বাচ্চা মেয়েদের মতো কল কল করে বলে উঠলো, 'ফ্লোরার কথা তোমার মনে আছে না? আমি ওকে মাত্র একবারই দেখেছিলাম। অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। একদিন আমি আমীরে উন্দলুসকে বলেছিলাম, ফ্লোরাকে আপনি উঠিয়ে আনুন বা ওকে কিনে নিন এবং আপনার হেরেমে রেখে দিন। তোমাকে অবশ্য আমি কখনো একথা জানাইনি আমি।'.....

'ফ্লোরা আমীরে উন্দলুসের কাছে এলে তোমার অবস্থান আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতো। ফ্লোরা বয়সে তোমার চেয়ে কম ছিলো এবং রূপসীও ছিলো এমন, যে কাউকে হতভম্ব করে দেয়ার মতো। আমীরে উন্দলুস ওকে পেলে তো পাগল হয়ে যেতেন। তুমি আমীরে উন্দলুসকে এ ধরনের কথা কেন চলেছিলে! তাঁকে খুশি করার জন্য?'

'না' সুলতানা বললো। 'তাকে পাগল বানানোর জন্য। আমার পরিকল্পনা ছিলো ফ্লোরা হেরেমে এসে গেলে আমরা দু'জন মিলে আমীরে উন্দলুসকে আমাদের জালে জড়িয়ে ফেলতাম। এভাবেই আমার উদ্দেশ্য পূরণ হতো।'.....

এক রাতে আমি ইউগেলিসকে আমার জায়গীরের ডেকে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমীরে উন্দলুস আবার ময়দানের এক লড়াকু মুজাহিদ হয়ে যাচ্ছেন।'......

'তাঁর সবচেয়ে ছোট স্ত্রী মুদ্দাসসিরার কথায় তিনি এখন সবকিছু করেন। ফ্লোরা হেরেমে এসে গেলে আমরা দু'জনে মিলে আমীরকে আবার আমাদের জাদুর জালে জড়িয়ে ফেলবো। ইউগেলিস আমার কথা মানলো না। সে ফ্লোরাকে অতি পবিত্র মেয়ে মনে করে।'......

'সে বললো, হেরেমে গিয়ে সে শুধু অপবিত্রই হবে না, সেখানকার ভোগবিলাসী জীবন পেয়ে সে তার কুরবানী দেয়ার জীবনের কথা ভুলে যাবে। তারপর আমার তোমার সব গোপন কথা আমীরে উন্দলুসের কাছে ফাঁস করে দেবে।'

'তুমি তো জানোই, সে আমার সাথে ওয়াদা করেছিলো, আমাকে ও তোমাকে কোন বিশাল প্রদেশের সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবে। তার ইশারাতেই তো আমি নাচতাম। কিন্তু সে তার মিশনকে এতই পবিত্র মনে করতো যে, আমার কথার কোন গুরুত্ব দিলো না।'

'আমি রেগে গেলাম। ইউগেলিসের ওপর মদের প্রভাব ছিলো তখন। আমার ক্ষুদ্ধতাও তাকে বেশ নাড়া দিয়েছিলো। তার মিশন সফল করার জন্য আমি অনেক কিছুই করতে পারতাম এবং করেছিও। তাই সে আমাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইলো না।'....

'সে বললো, 'তোমাকে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি না সুলতানা। আমার এই মিশনের কারণে তোমার প্রতি আমার অন্যরকম একটা ভালোবাসা আছে। আমি বিয়ে করিনি শুধু এ কারণে যে, তখন আমি শিকলে বাঁধা পড়ে যাবো। আমার মিশনের জন্য আমি বেকার হয়ে যাবে।'

'তারপর ফ্লোরা আমার মিশনে এক ধ্রুব তারার মতো এসে যোগ দিলো। এক রাতে আমরা এক ঘরে কাটিয়েছি। এক পাদ্রী আমাদেরকে ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলো। ফ্লোরা যখন জানতে পারে, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নিজেকে আমি নারী বঞ্চিত রেখেছি তখন সে আমার সাথে অনেক কথা বলে। আমি আশা করিনি এমন সুন্দরী একটি মেয়ে এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলতে পারে। ওর কথায় আমি নতুন জীবনের স্বাদ অনুভব করি।'

'ইউগেলিস আমাকে জানালো!, ফ্লোরার ব্যাপারে তার মনে এমন তীব্র এক ভালোবাসা জন্মায় যে, সে তার আর নিয়ন্ত্র করতে পারেনি। দু'জন দু'জনের কাছে পরস্পরকে সমর্পন করে দেয়। তাদের দুই দেহ এক দেহে পরিণত হয়।'

'তুমি সম্ভবত জানো না ইউগেলিস ও তার মিশনের পরিণাম কি হয়েছিলো?' যারিয়াব বললো।

'জানি। সবই জানি।'

'তুমি হয়তো ওদের দু'জনের মৃত্যুর ব্যাপারে জানো, 'যারিয়ার বললো, 'কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, ওরা ওদের মিশন কিভাবে চালিয়েছিলো। আর নিজের ওপর এক মেয়ের ছায়া নিয়ে ইউগেলিস ধীরে ধীরে কিভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছিলো?'

❋❋❋❋❋

যারিয়াব অতীতের একটি পর্দা সরালো। বললো,

'ঈসা মাসীহের বাদশাহী প্রতিষ্ঠা ও উন্দলুস থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাতের জন্য ফ্লোরা তার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো। সে তার রূপ যৌবনের আবেগ ভালোবাসা এই মিশনের জন্য বিসর্জন দিয়েছিলো।

সে পাদ্রী বা নান হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা তাকে মরিয়ম ছানী বলে ডাকতে থাকে। খ্রিষ্টানদের পাদ্রীরা রাতে কবরস্থানে ধোঁয়ার ভেতর থেকে ফ্লোরাকে বের করে সাধারণ মানুষের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দেয়।'

'এভাবে তাকে খ্রিষ্টানরা মরিয়ম ছানী বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। খ্রিষ্টানরা এসব ধোঁকাবাজি করে টলয়টা ও মারীদায় দু'বার বিদ্রোহ করায় এবং এতে হাজার হাজার খ্রিষ্টান মারা যায়। অগণিত লাশ ছাড়া ওদের আর কোন অর্জন কি হয়েছে? হয়নি!'

'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল জব্বারের মতো মুসলমানদেরকে ওরা ধোঁকা দিয়ে ওদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। আর এদিকে তুমি আমীরে উন্দলুসকে যে কোন অভিযানে যাতে না যায় এজন্য সব রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হও। কখনো কখনো আমাকেও তোমার সঙ্গ দিতে হয়। কিন্তু'.....

'কিন্তু মুদ্দাসসিরা আমীরে উন্দলুসের ওপর যাদু চালিয়ে তাকে' সুলতানা বললো।

'শুধু মুদ্দাসসিরা নয়।' যারিযাব সুলতানাকে থামিয়ে দিয়েবসলো,' আব্দুর রহমানকে তার সালাররাই মরণ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। আর মুদ্দাসসিরা

তোমার বিছানো ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে। সেই জাগরণকে মর্দে মুজাহিদে পরিণত করে। মুদ্দাসসিরা সত্যিই ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে নিয়েছে।'.....

'আর সালারদের ঈমান সময় দৃঢ় ছিলো বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাদের ঈমান এজন্য মজবুত ছিলো যে, উন্দলুসের মাটিতে শহীদ হওয়া পূণ্যত্মাকে সবসময় তাদের স্মৃতিতে প্রাণময় রেখেছে তারা। যারা উন্দলুসকে জয় করেছে। যারা নিজেদের রক্ত ঢেলে কাফেরদের বুকে ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়েছে। তুমি তো জানোই, সালাররা কিভাবে আমীরে উন্দলুসকে তোমার কজা থেকে মুক্ত করে!'

'তুমিও কি ফ্লোরাকে আমার চেয়ে বেশি সুন্দরী মনে করো?' সুলতানা যেন নেশার ঘোরে কথা বলে উঠলো।

'আমি কাকে কি চোখে দেখি সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।' যারিয়াব বললো, 'তুমি আমার কাছে অতীতের কথা শুনতে চেয়েছো যখন তোমার রূপ ও তার যাদুতে যৌবনের তীব্রতা ছিলো। আমাকে অতীতের পর্দাগুলো তাই একটু একটু করে সরাতে দাও।'.......

'আমি নিজেই তো তোমার ভালোবাসায় বন্দি হয়ে খ্রিষ্টানদের হাতে খেলতে শুরু করি। তুমি তোমার জায়গীরে যার বাগানও তোমার মতোই সুন্দর ছিলো ওখানে ইউগেলিসের সাথে আমার সাক্ষাৎ করাও।'....

'ওতো কোনো দরবেশের ছদ্মবেশে এসেছিলো সেদিন। তোমার প্রেম আমাকে অন্ধ করে রেখেছিলো বলে আমি বুঝে উঠতে পারিনি কি করতে যাচ্ছি। ইউগেলিস আমাকে বলে, আরব থেকে আসা ঐ মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি বদলে দাও। আর তোমাকে বলে উন্দলুসের সিংহাসন উল্টে দিলে তোমাকে বিশাল এক রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবে। আমি হবো তার বাদশাহ।'....

'তোমার প্রেম আর আমার সুর ছন্দ যা তোমার প্রেমের ফসল ছিলো সেটা আমাকে এক ঘোরলাগা জীবনে নিয়ে যায়। এই স্বপ্নও আমার বোধ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তুমি হবে সম্রাজ্ঞী আর আমি হবো তোমার স্বামী।'....

'আমি আমার মেধা, মুখের ভাষা ও বিষয়জ্ঞানের যাদু দিয়ে শাহী দরবারে প্রভাবশালী এক পদ অধিকার করে নিই। সবার জন্য আমি এক দৃষ্টান্ত হয়ে যাই। আরবীয় শাসক শ্রেণীর জীবন-যাপন, আবাস ভবন, পোশাক-আশাক এমন

কি চুলের মধ্যেও বিধর্মী ইউরোপীয়ানদের সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিই। মুসলিম উমারাদের মেয়েদেরকে এমন পোশাকে সুসজ্জিত করি যে, ওদের পর্দা ব্যবস্থা নামমাত্র রয়ে যায়।'.......

'ইউগেলিস বলতো সৈন্য আরও অস্ত্র দিয়ে বিজয় অর্জিত হয় না।' সুলতানা বললো, সুনিপুন কৌশলে এবং মায়াজাল বিস্তার করে কোন জাতির আবাস-ভবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, সামাজিকতা ইত্যাদি তোমার মতো করে বদলে দাও। দেখবে সে জাতিকে খুব সহজেই তুমি জয় করে নিতে পারবে।'

❋❋❋❋❋

'আমি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারি। আমার প্রতি তোমার কোন ভালোবাসা নেই।' যারিয়াব বললো, 'বুঝতে পারি সুলতানা! তুমি আমাকে নিয়ে একটি খেলা খেলছো। কিন্তু আমার পুরো সত্বা তোমার ভালোবাসায় এমন বন্দি ছিলো যে, এ থেকে আমি মুক্ত হতে পারিনি এবং আমি আমার ধর্ম ও জাতির রগ রেশায় ক্রুশের বিষ ছড়াতে থাকি।'

'আমি স্বীকার করছি, প্রেমের নামে তোমাকে আমি ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে গেছি।' সুলতানা বললো, 'কিন্তু আমার ভালোবাসায় তোমাকে দেওয়ানা হতে দেখে আমি নিজেই নিজের ধোকার শিকার হয়ে গেছি। কিছুদিন পরই জীবনের প্রথমবার সেই ভালোবাসার পরম স্বাদ আমি অনুভব করি যা আমার আত্মার গভীর পর্যন্ত শিকড় গেড়ে বসে।'....

'আমি ইউগেলিসকে বলে দিয়েছিলাম, 'যারিয়াবকে আমি আর ধোকা দিতে পারবো না। ভালোবাসাকে এক খেলা মনে করে ওর নিষ্পাপ আবেগের সাথে আমি আর খেলতে যাবো না।'

'সুলতানা! আমার ভালোবাসার আর আবেগের চেতনায় এখনো সেই উষ্ণতা আছে যা তোমার যৌবন কালে ছিলো।' যারিয়াব বললো, 'আজো তুমি তোমার জন্য যত বড় ত্যাগ চাইবে আমি স্বীকার করতে পারবো। ভালোবাসার গভীরতা থাকা সত্বেও তুমি যেমন আমাকে অনেক কথা বলোনি তেমন আমারও এমন অনেক কথা আছে যা তোমাকে আমি বলিনি। আজ সেটা শুনে নাও।'....

'আমি যখন ফ্লোরার কথা শুনি এবং জানতে পারি সেও এক মুসলমানদের মেয়ে হয়েও খ্রিষ্টানদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে তখন ওকে দেখার জন্য আমার মনে বেশ কৌতুহল জন্মালো। কিছু গোয়েন্দা দল আছে প্রশাসনের! কিছু আছে ফৌজের এবং আমারও ব্যক্তিগত ছোট একটা গোয়েন্দা

দল ছিলো। এতে হেরেমের দুই সুন্দরী এবং তীক্ষ্ম মেধার দুটি মেয়েও ছিলো।'....

'ফ্লোরা কোথায় আছে এবং ওকে কিভাবে আমি দেখতে পাবো এটা আমি জেনে নিলাম। একদিন আমাকে জানানো হলো, ফ্লোরা ও ইউগেলিস একটি গ্রামে রয়েছে। কর্ডোভা থেকে সেটা একদিনের পথ। আমি সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।'

'সেই গ্রামে গিয়ে আমার এক বিশেষ লোক দিয়ে গোপনে ইউগেলিসের কাছে খবর পাঠালাম যে, যারিয়াব ফ্লোরা ও তার সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছে। গ্রামের অনেকেই আমাকে দেখেছে। কিন্তু কারো এতটুকু সন্দেহ হলো না যে, এই অপরিচিত মুসাফির কর্ডোভার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী- যার সঙ্গীত খ্রিষ্টানদের সঙ্গীতকেও সমৃদ্ধ করেছে।'

সুলতানা যারিয়াবের কথা বড় মনোযোগদিয়ে শুনছে। এখন আর সে শরাব পানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না। যারিয়াব বলে যাচ্ছে,

'আমাকে এক পোড়া বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন কামরায় নিয়ে দাঁড় করানো হলো যার ছাদ থেকে মাকড়সার অগণিত জাল ঝুলছে। চার দিকের দেয়ালগুলো ঝুর ঝুরে অবস্থা। আমি ভাবছিলাম এটা কি কোন চাল কিনা। কিন্তু তখনই ইউগেলিস এসে গেলো। বলতে লাগলো,

'কর্ডোভার মহান সঙ্গীত শিল্পী কি বলতে পারবেন এত দূরে সফরের কষ্ট কেন স্বীকার করতে গেলেন?'

'আমার আসাটা সে সন্দেহের চোখে দেখলো। আমি বললাম, 'তোমার বিস্ময়টা অমূলক কিছু নয় ইউগেলিস! এক কৌতুহল আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ। আমি কি আজ পর্যন্ত তোমাকে কখনো ধোঁকা দিয়েছি? আর ধোকা দিতে হলে তো তোমার এখানে আসার আগে অন্য কেউ এসে তোমাকে ও ফ্লোরাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতো। আমি তোমাদের সাথী।'

'সে জিজ্ঞেস করলো,

'বন্ধু! কোন কৌতুল আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে?'

'আমি বললাম, আমি ফ্লোরাকে দেখতে এসেছি। ফ্লোরা যারিয়াবের সুর ছন্দের চেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধতায় আচ্ছন্নকারী এবং তার সংকল্প কঠিন শিলা

পাথরের চেয়েও মজবুত। ইউগেলিস আমার সাথে আরো কিছু কথা বললো। যখন সে নিশ্চিত হয়ে গেলো ওকে আমি ধোকা দিতে আসিনি আমাকে তখন আরেকটি বাড়িতে নিয়ে গেলো এবং একটি কামরায় বসিয়ে দিলো।'

'একটু পরই এক যুবতী মেয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। ওর রূপ আমাকে বিস্ময়বিস্ট করে ফেললো। সুলতানা! তুমিও যৌবনকালে বিস্ময়কর সুন্দরী ছিলে। সম্ভবত: ফ্লোরার চেয়ে সুন্দরী ছিলে....; কিন্তু ঐ মেয়ের মধ্যে তীব্র এক আকর্ষণই নয়, এক ধরনের সম্মোহন করার মতো যাদুমুগ্ধতা ছিলো। ওর দৈহিক অবকাঠামোটাই প্রেমের জগতে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়ার মতো। ওর চোখের উজ্জলতার সামনে খুব কম মানুষই টিকতে পারবে।'

'ইউগেলিস ফ্লোরাকে বললো, 'ফ্লোরা! এই সেই মহান ব্যক্তিত্ব, শাহী মহলে যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব রয়েছে। ইনি আমাদের জন্য ওখানকার মাটি সমতল করে দিচ্ছেন।'

'ফ্লোরা এগিয়ে এসে আমার ডান হাতটি তার দু'হাতের করোটিতে রেখে চুমু খেলো। তারপর তার বুকে রাখলো এবং তার মুখে যে হাসির ঝলক এলো সেটা আমাকে কাঁপিয়ে দিলো। আমার সন্দেহ হলো, এ কোন দেহ নয়, এ কেবল এক আত্মার প্রতিকৃতি সুলতানা! ফ্লোরা ফুল নয়, ছিলো কলি।'

'আমি ওকে বললাম, তুমি এত সুন্দরী আর যৌবনবতী কিন্তু তুমি কি করতে পারবে ফ্লোরা! তুমি কি তোমার যৌবন নষ্ট করছো না?'

'ফ্লো বলে উঠলো, 'শুনেছি, আপনি এক মহান জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব! কিন্তু আপনার তো এটাও জানা নেই, কিছু করার জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নেই। মানুষ তার বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনায় দৃঢ় হলে তার আত্মার শক্তি জেগে উঠে।'

'ও যখন তার ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো তখন এই মেয়ে যাকে আমি অন্য দৃষ্টিতে দেখছিলাম আমার চোখে সে পবিত্র এক সত্বা হয়ে ধরা দিলো। ইউগেলিস এও জানালো, মারীদা ও টলয়টার বিদ্রোহের আগুন ফ্লোরাই জ্বালিয়ে দিয়েছিলো।'.....

'পথে-ঘাটে, বাজারে বিচারকের আদালতে ইসলামের অবমাননার যে ফেতনা খ্রিষ্টানরা শুরু করেছিলো সে পথের পথ প্রদর্শক ছিলো এই ফ্লোরাই। রূপের ঐশ্বরিক শক্তি থাকা সত্বেও একটি মেয়ে যখন তার রূপ, যৌবন, জীবনের সব চাহিদাকে বাতিল এক ধর্মের জন্য বিসর্জন দিতে দেখলাম, আমার মধ্যে এ উপলব্ধি জেগে উঠলো যে, আমি কী করছি?'

'আমি একজন পুরুষ। লোকে আমাকে জ্ঞানী বুদ্ধিমান বলে। অথচ আমিই ওদের হাতের খেলানার পুতুল। আমার ধর্ম বিশ্বাসের কথা মনে পড়লো। লজ্জার তীক্ষ্ণ ফলা আমাকে জর্জরিত করতে লাগলো। তখনই আমার চিন্তা-ভাবনায় এক বিপ্লব অনুভব করলাম।'.....

'আমি মুখে মুখে ফ্লোরা ও ইউগেলিসকে নিশ্চয়তা দিলাম যে, আমি ওদের সাথেই আছি। কিন্তু মনে মনে কসম খেলাম, আর এক মুহূর্তও ওদের সঙ্গে নয়। আমি ফিরে এলাম। বেশ কয়েকবার ভাবলাম, তোমাকে বলি ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও।'...

'কিন্তু ইউগেলিসকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন-সাধ তোমার মনে তুমি লালন করে যাচ্ছো সেই অলীক জগৎ থেকে তোমাকে যে বাস্তবতার জগতে ফিরিয়ে আনতে পারবো না এটাও তখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম। আমি নীরব রইলাম আর তুমি স্বপ্ন দেখতে লাগলে। ফ্লোরা তার মিশন নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো।......

আমার কাছেও ওর সব তৎপরতার খবর নিয়মিত বিরতিতে আসতে লাগলো। তোমার হয়তো মনে আছে এর মধ্যে কতগুলো বিদ্রোহ হয়েছে এবং সবগুলোই দমন করা হয়েছে। খ্রিষ্টানরা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাসীদের পাইকারি দরে হত্যা করা হয়েছে।'.....

'অল্প বয়স্কা সুন্দরী মেয়ে মরিয়ম। সে গির্জার 'নান' হয়ে যায়। ফ্লোরা সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। মরিয়মের এক ভাই পথে ঘাটেপ জন সম্মুখে ইসলাম ও মুসলমানদের গালিগালাজ করতে থাকে। তাকে ধরে বিচারকের আদালতে পেশ করা হয়। বিচারে তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।'...

❋❋❋❋❋

'মরিয়ম তখন ডাকিনীর বেশে গির্জা থেকে বের হয়ে ইসলাম ও উন্দলুসের প্রশাসনের বিরুদ্ধে নতুন করে তৎপরতা শুরু করে। আদালত তখন ফ্লোরা ও মরিয়মকে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করে।

ওদরেকে খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা ও সরকারি সোর্সদেরকে জরুরি নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ওদেরকে খুঁজে পাওয়া এত সহজ ছিলো না। বারবারই গোয়েন্দাদের বিছানো জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ওরা বেরিয়ে যায়।'

সুলতানা নির্বাক হয়ে শুনছে। আর যারিয়াব অবিরত বলে যাচ্ছে।'

'একদিন এক লোক আমার সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করলো। সে আমাকে ইউগেলিসের পয়গাম দিলো। ইউগেলিস কাছেরই একটি গ্রামে আমার অপেক্ষায়

আছে। রাতে আমি ওখানে চলে গেলাম। ইউগেলিস সাক্ষাতে বললো, ওদের বিদ্রোহগুলো একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

ফ্রান্স থেকেও জঙ্গি সাহায্য পাচ্ছে না ওরা। কারণ, আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমান সীমান্ত এলাকায় সৈন্যদেরকে খুবই তৎপর রেখেছেন। আর ছোট ছোট গেরিলা দল রাত দিন ঘোড়ায় চরে সীমান্ত এলাকা উত্তপ্ত করে রাখছে।'...

'আমি ওক জিজ্ঞেস করলাম, এখন সে কী চাচ্ছে? আমাকে ডেকেছে কেন?' সে বললো,

'আমি এবার কর্ডোভায় বিদ্রোহ করাতে চাচ্ছি। কিন্তু এর সূচনা হবে এভাবে যে, বিদ্রোহ একেবারে শাহী মহল থেকে শুরু হবে। আমীরকে বন্দি করা হবে এবং সব সালারকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে দেয়া হবে। আমি আমার মতো করে চেষ্টা করে গেছি ফৌজের মধ্যে আমার কোন সহযোগি তৈরি করা যায় কিনা। কিন্তু সালাররা প্রত্যেকটা সৈন্যকে এমন ধর্মভীরু বানিয়ে রেখেছে যে, কেউ তার ধর্ম ও দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে বা শুনতে রাজি নয়।'.....

'সে আমাকে তখনো তার বন্ধুই মনে করছিলো। আমিও ওকে বন্ধুত্বের ধোকা দিয়ে গেছি এবং জিজ্ঞেস করেছি এখন আমাকে কী করতে হবে? ইউগেলিস বললো, সালারদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিবেন। ওদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে দিবেন।'......

'নায়েবে সালার ও কমান্ডারদের মধ্যে এমন কিছু লোককে হাত করে নিবেন যাদেরকে দিয়ে গৃহযুদ্ধ করানো যাবে। ওদেরকে আমরা এত বেশি সোনা ও টাকা পয়সা দেবো যে, ওরা জীবনেও তা দেখেনি। আপনার ও সুলতানার সাথে আমাদের কৃত প্রতিশ্রুতি অক্ষুণ্নই আছে। আপনাদেরকে পৃথক এক রাজ্য উপহার দেয়া হবে। যেখানে চলবে একমাত্র আপনার ও সুলতানার রাজত্ব।'.....

'আমি তাকে বললাম, উন্দলুস থেকে ইসলামের অস্তিত্ব বিনাশে তোমরা সফল হয়ে গেলে তখন তো আমাকে এক পৃথক রাজত্ব দান করবে। কিন্তু সেটাও তো হবে ইসলামী রাজত্ব। সেটার অস্তিত্ব তোমরা কি করে সহ্য করবে? সে বললো,

'পুরস্কার স্বরূপ দেয়া ভুখন্ডে যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে সেটার ব্যাপারে আর কোন আপত্তি আমাদের থাকবে না। আমি জানি, আপনি ও সুলতানা যে ভূখন্ডের শাসক হবেন সেটা কেবল নামে ইসলামী রাষ্ট্র হবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা দু'জন ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত হয়ে যাবেন।'....

'তবে এসব অনেক পরের কথা। আপনি যা চাইবেন তাই হবে। সবার আগে আপনি আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাকে আমাদের স্বার্থে প্রয়োগ করুন। বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধের জন্য আমাদের ষড়যন্ত্রের জাল কর্ডোভায় বিস্তার করে দিন। যে পরিমাণ সম্পদ আপনার প্রয়োজন হবে আমরা সেটা যোগান দিয়ে যাবো।'

'ইউগেলিস কথা বলছিলো আর মদ পান করছিলো। কিন্তু আমি মদ একটুও ছুঁয়ে দেখিনি। কারণ, আমার হুশ জ্ঞান আমি ঠিক রাখতে চাচ্ছিলাম। ওখানে তখন ফ্লোরা ও মরিয়মও ছিলো। এই দুই মেয়ের রূপ যৌবনও আমাকে অনেক খানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তবে নিজেকে আমি এক সময় এ থেকে মুক্ত করে নিই। ওদের কাজ করে দেবো বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।'

'ইউগেলিস বললো, 'যারিয়াব! আমি আশা করবো আপনি আমাদেরকে ধোকা দেবেন না। আর ধোকা দিলেও সেটা আপনার জন্য ভালো হবে না।'

'আমি রেগে গেলাম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা আমার জন্য ভালো না হলে কী হবে আমার?'

'সে বললো, আপনি এই দুনিয়ায় থাকবেন না।'

'আমি বললাম, আমার একটা শর্ত আছে। সেটা পূর্ণ করে দিলে মহলে আমি বিদ্রোহ করিয়ে দেবো। চার সালারকে ঘুমন্ত অবস্থায় শেষ করে দেবো। ইউগেলিস আমাকে শর্ত জিজ্ঞেস করলো। আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম। ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকালো।'...

'ফ্লোরা ও মরিয়মের চেহারায় আমি ক্ষুব্ধতা বা আনন্দ কোনোটারই ছায়া দেখলাম না। তবে ওদের ঠোঁটে যে হৃদয় কাড়া হাসি ছিলো সেটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। ইউগেলিস আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে দু'জনকে নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেলো। একটু পর সে একা ফিরে এলো।

আমাকে বললো, ঐ মেয়েদের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে এমন ঘৃণা জমে আছে যে, ওরা কোন মুসলমানের দৈহিক স্পর্শ সহ্য করতে পারবে না।'....

'আমাকে মনে হয় বাচ্চা মনে করছিলো ইউগেলিস। ইউগেলিসের কথার ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝে গেছি সে কী বলতে চাচ্ছে। ফ্লোরাকে তো ওরা মরিয়ম ছানী বানিয়ে রেখেছিলো। আর মরিয়ম নিজেই ছিলো গির্জার নান। যাদের ওপর বিয়ে হারাম। ভুলেও যদি কোন পুরুষের সঙ্গে ওদের দৈহিক স্পর্শ ঘটে ওরা সঙ্গে

সঙ্গে গোসল করে গির্জায় গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু আমি এও জানতাম, এ দু'জনের দেহ ইউগেলিসের জন্য বৈধ ছিলো।'.....

❋❋❋❋❋

যারিয়াবের এসব কথা সুলতানার জন্য একেবারেই নতুন। তাই সুলতানা ফ্লোরা ও মরিয়মের ব্যাপারে যারিয়াবের এধরনের প্রস্তাবের কথা শুনে চমকে উঠলো।

'তুমি কি একেবারে হৃদয়-মন থেকে চাচ্ছিলে ঐ দুই মেয়ে তোমার কাছে আসুক? তুমি তো আমার ভালোবাসার দাবী করো।" সুলতানা জিজ্ঞেস করলো।

'না,' যারিয়াবের হেসে বললো, 'মুসলিম জাতির আত্মমর্যাদাবোধ আমার মধ্যে তো আগহেই জেগে উঠেছে। এখন ইউগেলিস যখন আমাকে হত্যার হুমকি দেলো তখন ওর ধর্মীয় আত্মমর্যাদাকে নিয়ে একটু খেলার ইচ্ছা জাগলো। ইউগেলিস যখন বললো, ফ্লোরা ও মরিয়মের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে ঘৃণায় পূর্ন তখন ও দেরজপাতে আমারমনে যতটুকু সম্মানছিলো সেটাও আমারমন থেকে বেরিয়ে গেলো। ইউযালিস আমাকে পরের রাতে আসতে বলোল।'........

'ইউগেলিস যখন আমাকে পরের রাতে আসতে বললো তখনই ওর হাবভাব আমি পড়তে পেরেছি। পরের রাতে ও আমার সাথে অন্য কোন খেলা খেলতে চায়। এটা আমার সন্দেহ ছিলো। হতে পারে মেয়ে, দুজন দেহ দানে রাজি হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, ওদের চরিত্র তো আমি জানি।'......

'ইহুদী খ্রিষ্টানদের মেয়েরা নিজেদের জাত ধর্মের জন্য নিজেদের সতীত্ব ও দেহ অনায়াসে আরেকজনের হাতে তুলে দিতে পারে। কিন্তু আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। ইউগেলিসকে আমি বললাম, আগামীকাল রাতে আমি এসে বিদ্রোহের সব পরিকল্পনা করে ফেলবো। বোকার মতো আমি ওর জালে ফেঁসে গেছি এমন একটা বিশ্বাস ওর মধ্যে সঞ্চারিত করে চলে এলাম।'.......

'সকাল হতেই পুলিশ চীফ মনসুর ইবনে মুহাম্মদের কাছে গেলাম। তাকে বললাম, ইউগেলিস, ফ্লোরা ও মরিয়ম অমুক গ্রামের অমুক বাড়িতে আছে। আজ রাতেই ওদেরকে গ্রেফতার করা যায়। আমি ওখানে গিয়েছিলাম একথা মনসুরকে বললাম না। শুধু বললাম, বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি। ওরা তিনজন আজ রাতে ওখানে থাকবে।'.....

'মনসুর ইবনে মুহাম্মাদ অতি দূরদর্শী পুলিশ চীফ। সে তখনই তার এক সোর্সকে ভিখারীর ছদ্মবেশে সেখানে পাঠিয়ে দিলো। বলে দিলো, ওখানে গিয়ে ভিক্ষা করবে এবং একজন পুরুষের সাথে দুটি মেয়েকে দেখলে তাদের পিছু নিবে এমনভাবে যে, ওদের যেন কোন সন্দেহ না হয়। ফিরে এসে আমাকে জানাবে ওরা কোথায় গিয়েছে। রাতে মনসুর সে গ্রামে পুলিশের একটা দল পাঠিয়ে দিলো।'

'পরদিন সকালে খবর আসে, ফ্লোরা ও মরিয়মকে গ্রফতার করা হয়েছে। কিন্তু ইউগেলিস বেরিয়ে গেছে। পুলিশের ঝটিকা বাহিনীর সাথে এমন দু'জন লোক ছিলো যারা ইউগেলিস ও মরিয়মকে চিনতো। পুলিশের লোকেরা যখন সে বাড়িতে গিয়ে উঠে সেখানে তখন ইউগেলিস লুকিয়ে ছিলো। পুলিশকে দেখে ঘরের লোকেরা এমনকি অন্যান্য মেয়েরাও পুলিশের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং চিৎকার চেচামেচি জুড়ে দিলো।'...

'গ্রামের খ্রিষ্টানরা ঘুম থেকে উঠে এদিকে দৌড়ে এলো। দলের সাথে যে ইনস্পেক্টর ছিলো সে সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলো, তারা কে? এবং কী জন্য এসেছে। কেউ যদি ওদের সাথে লড়তে আসে তাহলে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হবে।

কিন্তু ফ্লোরা ও মরিয়ম চিৎকার করে করে গ্রামের লোকদেরকে উত্তেজিত করছিলো, ওরা যাতে ওদেরকে মুসলিম সিপাহীদের হাত থেকে মুক্ত করে। কিন্তু কেউ ওদের কাছে আসার সাহস পায়নি।'....

'ওদের দু'জনকে যখন টেনে হেচড়ে বের করা হলো, ফ্লোরা তখন উচু আওয়াজে বলছিলো, 'ক্রুশের পূজারীরা! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় গেলো? এই মরিয়ম 'নান কে দেখে কি তোমাদের অন্তর কেঁদে উঠছে না? তোমরা কি করে সহ্য করছো? মুসলমানরা তাকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। খোদার পুত্রের আত্মার কাছে কী জবাব দেবে?'

❋❋❋❋❋

'মনসুর ইবনে মুহাম্মাদের জানা ছিলো, যারা অসংখ্যবার বিদ্রোহ করেছে তারা পুলিশ দেখলেই লড়াইয়ে নেমে পড়বে। মনসুর তাই পুরো এক ব্যটালিয়ন পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিলো। গ্রামের মাঝখানে কিছু ফাঁকা জায়গা ছিলো। ফ্লোরা

ও মরিয়মকে সেখানে আনা হলো। কয়েকটি মশাল জালানো হলো। ইনস্পেক্টর কিছু পুলিশ গ্রামের বাইরেও রেখে এসেছিলো। যাদেরকে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো যেতো'।.....

'ফাঁকা জায়গা থেকে ঘোষণা করা হলো, কেউ ঝামেলা করতে এলে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হবে। লোকেরা এটা শুনে পিছিয়ে গেলো। কিন্তু সাত আটজন খ্রিষ্টান অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত পুলিশের দিকে ধেয়ে আসতে শুরু করলো। অসংখ্য তীর ওদের দিকে ছুটে গেলো। ওরা মাঝখানেই যমদূরেত সাক্ষাৎ পেয়ে গেলো।'....

'আরেক দলে খ্রিষ্টান আরেক দিক থেকে তেড়ে আসতে লাগলো। এ সময় গ্রামের বাইরে থেকে ঘোড় সাওয়ার পুলিশরা ঘোড়া নিয়ে গ্রামে ঢুকেই ওদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো ঘোড়া নিয়ে। এতে কিছু খ্রিষ্টান ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষ্ট হলো। আর বাকিরা পালিয়ে গেলো। পুলিশ বাহিনী ফ্লোরা ও মরিয়মকে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো।'

'আমি নিশ্চিত দু'জনে পথে ইনস্পেক্টররকে ওদের রূপের লোভ দেখিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিলো।' সুলতানা বললো, 'ধন সম্পদ এবং নিজেদের দেহেরও লোভ দেখিয়েছিলো ওরা।'

'না, সুলতানা!' যারিয়ার বললো, 'তুমি হলে হয়তো এই নারীত্ব ব্যবহার করার চেষ্টা করতে। কিন্তু কোন কোন মেয়ের মানসিক শক্তি পুরুষের চেয়ে বেশি থাকে।...

' এ ধরনের মেয়েকে সে নারীই বুঝতে পারবে যার চরিত্র ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা আছে। ওরা দু'জন পথে কাউকেই কোন ধরনের লোভ-লালসা দেখায়নি। বরং ওরা দু'জনই ইসলামকে গালমন্দ করতে থাকে এবং চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। ওরা উন্দলুসে মুসলমানদের কখনোই নিশ্চিন্ত ও সুস্থিরভাবে থাকতে দেবে না।'

'তুমি বিস্মিত হচ্ছো সুলতানা! কারণ, তোমার কোন ধর্ম বিশ্বাস নেই। নিজের বিলাসমত্ত প্রবৃত্তিকেই তুমি ধর্ম বানিয়ে রেখেছো। এমন নারীও ছিলো যারা তারিক ইবনে যিয়াদ ও সেসব মুজাহিদদেরকে জন্ম দিয়ে ছিলো যারা উন্দলুসকে জয় করে ছিলো....।'

'আরেক ধরনের নারী আছে যারা সেঁসব উমারাদেরকে জন্ম দিয়েছে যাদের কাছে বাদশাহী আর ক্ষমতাই সবচেয়ে প্রিয়। তাদের বংশে যে নারীই সন্তান জন্ম দেয় তার একমাত্র চাওয়া পাওয়া হয় তার ছেলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে।

তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য তুমি হয়রান হচ্ছে, ওরা দু'জন কেন মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেদের দেহের লালসা দেখায়নি। ওদের সাথে তোমার অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে।'...

'সারা রাস্তায় ওরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করেছে। পরের দিন ওদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিচারক ফ্লোরাকে বলেন,

'তোমার শাস্তির ব্যাপারে আমি এজন্য নমনীয় হচ্ছি যে, তুমি এক মুসলমান পিতার কন্যা। আশা করি তুমি বন্দিত্ব দশা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সরল পথে ফিরে আসবে।'

'তবুও ফ্লোরা তার উগ্রতা ছাড়লো না। দু'জনকে কয়েদ খানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। একদিন এক শুভ্রকেশী পাদ্রী ওদের সাক্ষাতের জন্য কয়েদ খানায় হাজির হলো। তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু কয়েদখানার প্রধান কর্তা সেই পাদ্রীকে কয়েদকানা থেকে বের করে দিলো। কারণ, সে ফ্লোরা ও মরিয়ামকে বলছিলো, দৃঢ় থাকবে। কারণ, পরে তোমাদেরকে মহলের হেরেম ঢুকানো হবে।'

'অনেক পর আমি এক সূত্রে জানতে প্যারি, সেই শুভ্রকেশী পাদ্রী ছিলো ধূর্ত ইউগেলিস। ফ্লোরা ও মারিয়মকে কয়েদখানায়ও ইসলামের নামে অনবতর কুটুক্তি করতে থাকে। তাদেরকে আরেকবার বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিচারক যখন দেখলেন, এদের মনোভাব আগের চেয়ে আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তখন তিনি আইনের সঠিক ব্যবহার করলেন এবং দু'জনকেই মৃত্যুদন্ড দিলেন।'

'দু'জনকে মরণ ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হলো। ইউগেলিস ফ্লোরা ও মরিয়মের শোকে আরো হিংস্র হয়ে উঠলো। প্রতিশোধের আগুন তাকে পোড়াতে লাগলো। সে তার জঙ্গি তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দিলো। খ্রিষ্টানরা এবার প্রকাশ্যে ইসলাম ও প্রশাসনকে গালমন্দ করতে লাগলো। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডা আরো বাড়িয়ে দিলো।'...........

'আমীরে উন্দলুস হুকুম দিলেন, যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করবে তাদের শাস্তি সোজা মৃতুদন্ত। এ হুকুমের পর কয়েখ মাসের ব্যবধানে আট হাজার খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হলো। ইউগেলিস তার মিশনের ব্যর্থতা ও ফ্লোরার শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেলো। এ অবস্থাতেই সে ধরা পড়লো এবং জন সম্মুখে তাকে ফাঁসি দেয়া হলো।'

সুলতানা উদাস কণ্ঠে বললো,

'যারিয়াব! তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের সেই সোনালী অতীতের কথা শোনাও। যা আমাকে আবার যৌবনে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আমার মন আরো উদাস করে দিলে।'

সুলতানা মদের সুরাহী নিয়ে মদ ঢালতে উদ্যত হলো। যারিয়াব তার হাত থেকে মদের সুরাহীটা নিয়ে নিলো। তারপর সেটা দূরে রেখে দিলো।

'সুলতানা! জীবনের এই শেষ দিকে এসে আমারও ইচ্ছে করে কেউ আমার সাথে আমার যৌবনকাল নিয়ে যদি কথা বলতো। তুমিও এটা চাও। কিন্তু তোমার ও আমার চাওয়ার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তুমি এই বার্ধক্যে এসে যৌবনবতী হতে চাচ্ছো। এজন্য তুমি যৌবনের স্মৃতির আশ্রয় নিচ্ছো। এটা আসলে নিজের জীবন থেকে পালানো।'.....

'বার্ধক্যকে গ্রহণ করে নাও। তাকে অভিবাদন জানাও। কারণ, তুমি অতীতে এক ব্যর্থ জীবন রেখে এসেছো। এখন বাস্তব জীবনের ফিরে এসো।'....

'আমার যৌবনকালে তুমি তো কমপক্ষে এতটুকু বলতে যে, আমাকে তুমি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসো।'

'তা তো এখনও বলি।' যারিয়াব বললো, 'এখন তো অনুভব করি, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এত অধিক হয়ে উঠেছে যে, আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে বললেও আগুনে ঝাপিয়ে পড়বো নির্দ্বিধায়। কিন্তু আজ রাতে অতীতের সেসব কথা শুনে নাও যা আমি শোনাতে চাই।'

'মনে হচ্ছে তুমি পাক্কা মুসলমান বনে গেছো।' সুলতানা হাসতে হাসতে বললো, 'আমীরে উন্দলুস মনে হয় তোমাকে একটু বেশিই এনআম আর বখশিষ দিয়েছেন।'

'আমীর আব্দুর রহমান আমাকে সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই দিয়েছেন যে, আমি আসল মুসলমান হয়ে গেছি।'

'আমার মতে তুমি কখনোই এই চেষ্টা করোনি যে, তিনি খাঁটি মুসলমান হয়ে যান।' সুলতানা বললো, 'তুমি তো তাকে নারী ও মদে ডুবিয়ে রাখতে চাইতে।'

'হ্যাঁ, সুলতানা! যারিয়াব বললো, 'আমি আমীরে উন্দলুসকে ভোগ-বিলাসে মত্ত রাখতে চেয়েছি। আমার যৌবন তো তোমার সামনেই রয়েছে। এসব আমার পাপ ছিলো এবং আমি এসব থেকে তাওবা করে নিয়েছি।

আজ আমি সেসব কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা তুমি শুনতে চাও না। হ্যাঁ, সুলতানা! একটা পাপ আমি করে যাচ্ছি, এ থেকে হয়তো আমি তাওবা করবো না। এটা হলো, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা। এটা ছাড়া আমি টিকতে পারবো না।'

'ভালোবাসাকে তুমি পাপ মনে করো?' সুলতানা বললো।

'এটা এর ওপর নির্ভর করে তুমি কাকে ভালোবাসছো এবং কিভাবে ভালোবাসছো। তুমি তো জানোই আমাদের ভালোবাসা কোন ধরণের? আমীর আব্দুর রহমান তোমাকে হেরেমের হীরা বলে এবং আমিও তোমাকে আমার হীরা বলি।' যারিয়াব বললো।

'অন্য কোন কথা বলো যারিয়াব!'

'না সুলতানা' যারিয়াব দুঃখভরা গলায় বললো, 'তুমি অতীতের পর্দা উঠিয়ে দিয়েছো। তাই তুমি শুনতে না চাইলেও আমার না বলা কথা তোমায় শুনতে হবে। তারপর আমি তোমার কথা শুনবো।'

'আমার এখন একটি কথাই রয়ে গেছে। আমার ছেলে আব্দুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হবে। প্রভাবশালী তিন চারজন উমারাকে আমার হাতে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আমীর আব্দুর রহমানের মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। তার তো এখন মরে যাওয়া উচিত। তুমি কি আমার ছেলের পক্ষে নেই?'

'আগে সময় আসুক।' যারিয়ার বললো, 'আমীর আব্দুর রহমানের পয়তাল্লিশ জন পুত্র। এর মধ্যে কিছু তো তার বিবাহিতা স্ত্রীদের সন্তান। অধিকাংশই হেরেমের মেয়েদের পেটের সন্তান। এর মধ্যে এক সন্তান তোমার। আমি চাই আব্দুর রহমান মৃত্যুর আগে যেন তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করে যান। আর তা না করে গেলে তার মৃত্যুর সময় পুরো মহলে রক্তের বন্যা বইবে।'....

'আর এমন ঘটলে ধর্মদ্রোহী সন্ত্রাসী খ্রিষ্টান দলগুলোর ওপর সবার দৃষ্টি অন্যদিকে সরে যাবে। সালতানাতে উন্দলুস তখন ভয়াবহ অবস্থায় পড়বে। ভেবে দেখো সুলতানা! এক্ষেত্রে মুদ্দাসসিরার মতামতকেও আমীর গুরুত্ব দিবেন। মুদ্দাসসিরার মতো প্রভাব কিন্তু তোমার নেই। সে চাইলে তোমাকে মহল থেকেও বের করে দিতে পারবে।'

সুলতানা গভীর চিন্তায় হারিয়ে গেলো।

'তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমীরে উন্দলুসকে পাক্কা মুসলমান কে বানিয়েছে?' যারিয়ার বললো, 'আমাকে তুমি বিদ্রুপও করেছিলে। তবে পাক্কা

মুসলমান আমি নই মুদ্দাসসিরাই এ অবদানের সবচেয়ে বড় দাবীদার। ইসলামের খাঁটি প্রেম রয়েছে ওর মধ্যে। আর আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমানের মধ্যেও আত্মমর্যাদাবোধ কিছুটা অবশিষ্ট ছিলো।'...

'তিনি ভোগ বিলাসের জীবন থেকে মুক্ত হওয়াতে ইসলাম উন্দলুস কিছুটা হলেও মজবুত শিকড় গাড়তে পেরেছে। তার শাসনামলের শুরুতে মনে হচ্ছিলো খ্রিষ্টানরা উন্দলুসের শিকড়ে দাঁত বসাতে যাচ্ছে।'......

কারণ, এ লোক তোমার মতো সুন্দরীদের বেহেশতে হারিয়ে গিয়েছিলো। তোমার কি মনে নেই, তোমার রূপ যৌবন এবং আমার সুর সঙ্গীত আমীর আব্দুর রহমানকে সালতানাতের সব ধরনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বেপরোয়া করে দিয়েছিলো।'......

❋❋❋❋❋

'কোন শাসক যখন অযোগ্য হয়, নির্বোধ বা ভোগ বিলাসপ্রিয় হয় তখন সে চাটুকার ও তার দেশের শত্রুদের জন্য বেশ কার্যকর শাসক বনে যায়। সে সব উপদেষ্টা আর পরামর্শই তার কাছে ভালো লাগে যারা তাকে এই উপলব্ধি দেয় যে, সে নির্বোধ ও অযোগ্য নয়।' যারিয়াব অক্লান্ত বলে যাচ্ছে।

'তাহলে আমি আমীরে উন্দলুসের চাটুকার!' সুলতানা গাল ফুলিয়ে বললো।

'আমি ও তুমিও। দু'জনই আমরা তাকে ধ্বংশের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলাম। এর ফলেই তার শাসনকালেই উন্দলুসের ইতিহাসে খ্রিষ্টানরা সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহ করেছে। ধর্মদ্রোহীদের আন্দোলন তার যুগেই সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছে। সুলতানা! মনে করে দেখো! সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ও রক্ত তার আমলেই ঝরেছে।'....

'আবার তার যুগেই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও প্রতিভাবানরা সবচেয়ে বেশি সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতাও। আবার তার কালেই দুশমন মাত্রাতিরিক্ত দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে। তবে এটা আমীরে আব্দুর রহমানের প্রবল ব্যক্তিত্ব দীপ্ত ঈমানের পরিচায়ক যে, তিনি এক সময় শরাবের পেয়ালা ছুড়ে ফেলেছেন। আমার প্রিয় গিটারের তার ছিড়ে দিয়েছেন। আর তোমার রূপের জাদুর জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছেন।'...

'এসবের পেছনে অবশ্যই এক নারী ও কয়েকজন বীর পুরুষের অবদান আছে। ইচ্ছে করে নির্জনে বসে যাই এবং উন্দলুসের সেসব ইতিহাস নিজের

চোখের সামনে হাজির করি যা আমীর আব্দুর রহমানের কর্মজীবনে রচনা করেছেন। খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের মরণ বিষ এ লোক যেভাবে অকার্যকর করে দিয়েছে, অতীতের কোন আমীর তা পারেনি।'.......

'তুমি জানা সুলতানা! এই আব্দুর রহমানের কাছেই তার দুশমনরা বন্ধুত্ব ও সাহায্যের ভিক্ষা চাইতে এসেছিলো। বার্য নাটাইনি, মোকয়েলি এসেছিলে, থিয়োক্লাস এসেছিলো। এমনকি উন্দলুসের সবচেয়ে বড় দুশমন ফ্রান্সের শাহলুই যখন তারই ছেলের বিদ্রোহে ঘাবড়ে গিয়ে ছিলেন তখন তিনি তার এক দূত গোপনে আমীরের কাছে এই আবেদন প্রার্থনা করে পাঠান যে,

'উন্দলুসে যে খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহ করছে এদের আমি কোন সাহায্য করবো না। এর বিনিময়ে আপনি ফ্রান্সের ওপর হামলা করবেন না। এই অনুগ্রহের জন্য বিনিময় হিসাবে যদি আপনি কিছু চান এবং যা কিছুই চাইবেন আপনার দরবারে সেটা পৌছে যাবে।'

'আমীরে উন্দলুস এই জবাব পাঠান যে, ঠিক আছে। তোমার দেশে হামলা করবো না। এর বিনিময়ে শুধু এতটুকু চাই যে, কখনো উন্দলুসের সীমান্তে এলাকার দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাবে না। যদি উন্দলুসের কোন বিদ্রোহী তোমার এলাকায় চলে যায় তাহলে তাকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে এদিকে তাড়িয়ে দিবে। ব্যাস, আর কিছু চাই না।'....

'আর সুলতানা! এই আমীর আব্দুর রহমানই যিনি সমুদ্রে রাজত্ব করেছেন। সেখানেও তার তলোয়ার ঝলক দেখিয়েছেন। তুমি তো ছিলে এক রহস্যময় দুনিয়ার নারী। তুমি সবসময় চেষ্টা করেছো, আমীর আব্দুর রহমান যেন যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে নেতৃত্ব না দেন।'....

'কারণ, আমি এটা কখনো চাইতে পারি না যে, যাকে আমি ভালোবাসি সে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে মারা পড়ুক।" সুলতানা বললো।

'সুলতানা!' যারিয়াব আক্ষেপের সুরে বললো, 'এই বয়সে এসেও যদি তুমি মিথ্যা বলা থেকে তাওবা করে নাও, তবুও তুমি দেখবে দারুণ আত্মিক শান্তি অনুভব করছো। তোমাকে তো উন্দলুসের দুশমনরা নির্দেশ দিয়েছিলো, ওদেরকে এ সাহায্য করতে হবে যে, আব্দুর রহমানকে যুদ্ধের ময়দানে কিংবা কোথাও বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে যেতে দেবে না। কারণ, আব্দুর রহমানের রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দেয়ার যে জাদুকরী যোগ্যতা রয়েছে এর সামনে দুনিয়ার কোন যুদ্ধ শক্তিই টিকতে পারবে না।'....

'এ ছাড়াও আমীরে উন্দলুস যখন নিজে ফৌজের সাথে থাকেন তখন তো সালার থেকে নিয়ে সাধারণ সিপাহীরা পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়ে লড়াই করে। কিন্তু তুমি তাকে বেশি দিন আটকে রাখতে পারোনি। মুদ্দাসসিরা পবিত্র কুরআনের আয়াত পড়ে একটি তলোয়ারে ফুঁক দিয়ে তার হাতে তলোয়ার তুলে দেয় এবং বলে, যাও আমার মাথার মুকুট! আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে আছেন। বিজয় তোমারই হবে।'

যারিয়াব সুলতানার সামনে অজানা আরেক কাহিনীর দ্বার উন্মোচন করলো। বললো,

'আমীরে উন্দলুস নারী ও ভোগ বিলাসপ্রিয় এটা জেনে অগ্নিপূজক ডাকাত ও লুটেরা দলও আব্দুর রহমানের আত্মমর্যাদাবোধকে চ্যালেঞ্জ করে। উন্দলুসের পূর্ববর্তী আমীরদের ব্যাপারেও অগ্নিপূজকরা সমুদ্র পথে কেয়ামতের বিভিষিকা নামিয়ে দিয়েছিলো। ওদেরকে সামুদ্রিক ফৌজ বললেও সঠিক হবে। শক্তিশালী এবং বিশাল এক ব্যটালিয়ান ছিলো ওদের।'...

'ওরা অন্যান্য অনেক দেশের শক্তিশালী নৌ বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরা মূলত: জার্মানীর লুটেরা দল। যারা খোদ জার্মানিতেই বিতাড়িত। সমুদ্রে পছন্দ মতো শিকার না পেলে উপকূলে এসে বসতিগুলোতে লুটপাট চালায়। 'সাকেন্ড নিওয়া' নামক উপকূলে ওদের আড্ডা। ওখানে সমুদ্র এতই বিপদজনক ও ভয়ংকর হয়ে থাকে যে, কোন নাবিকই সেদিকে জাহাজ নিয়ে যেতে দুঃসাহস দেখায় না।'...

'অগ্নিপূজকদের এই জলদস্যুরা এতই হিংস্র ও রক্ত পিপাসু যে, সমুদ্রের উত্তাল ঝড়ও যেন ওদেরকে সমীহ করে চলে। যে কোন ধরনের নৌযান চালনায় ওদের দক্ষতা অতুলনীয়। সাধারণ ডিঙ্গি নৌকা নিয়েও ওরা বিক্ষুদ্ধ সাগরে বেরিয়ে পড়ে।'

'কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমীর আব্দুর রহমান কিছুটা ক্লান্ত হয়ে কামরায় আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। আমাকে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাওয়ার হুকুম পাঠালেন। আমাকে দেখে বললেন,

'যারিয়াব! ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বুড়ো হয়ে গেছি না? কিছু একটা শোনাও যারিয়াব! বড় উদাস সুরে।'

'আমি গিটার বাজাতে শুরু করলাম, গুন গুন করে গান ধরছিলাম। এ সময় দারোয়ান এসে জানালো, 'সালারে আলা উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ কিছু মুসাফির পাঠিয়েছেন। এরা মনে হচ্ছে বড় মাজলুম। এদের সাথে কয়েকজন নারীও আছে।'....

'আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আমীর এ সময় কারো সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। কিন্তু আমীর সোজা হয়ে বসলেন এবং আমাকে বললেন, বাদ্যযন্ত্র দূরে সরিয়ে রাখো। এরা যদি মজলুম মুসাফির হয় তাহলে এদের কাছে বাদ্যযন্ত্রেতর আওয়াজ ভালো লাগবে না।'

'তিনজন লোক ভেতরে এলো। এদের সাথে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ও দুইজন যুবতী মেয়ে ছিলো। ধূলো মলিন কাপড় চোপড়েও মেয়ে দু'জনকে বেশ সুন্দরী লাগছিলো। মহিলা ও মেয়ে দু'জনের চোখ অশ্রু ভেঝা। এরা সবাই মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো এবং হাত জোড়ে রইলো। বুঝাই যাচ্ছিলো এরা মুসলমান নয়।'.....

'আমীর আব্দুর রহমান ওদেরকে আরাম করে বসতে বললেন এবং দারোয়ানকে ডেকে ওদের জন্য সেই শরবত নিয়ে আসার জন্য বললেন যা তিনি নিজে পান করে থাকেন।

ওদের সামনে ফল ফ্রুটের স্তুপ্ত এনে রাখা হলো। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, ওরা কি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে?' মধ্য বয়স্কা মহিলা গ্রাম্য ভাষায় বললো,

'আমাদেরকে সেসব হিংস্র-জঙ্গলীদের অনুগ্রহের ওপর এজন্যই কি আপনি ছুড়ে ফেলে ছেন যে, আমরা মুসলমান নই? আমরা কি মানুষ নই?'

তার সাথে বসে থাকা এক লোক তাকে কনুই দিয়ে গুতো মেরে বললো, 'আরে ভদ্রভাবে কথা বলো। ইনি তো বাদশাহ।'

'আব্দুর রহমান গর্জে উঠে বললেন,

'আরো ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলো। এখানে কেউ বাদশাহ নয়। আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহয্য করবো। সেই হিংস্র আর রক্তলুলুপ জঙ্গী কারা?'

'সেই মহিলা বললো, 'ওরা জার্মানি দস্যুদল। এদেরকে নারমানও বলা হয়। ওরা আমাদের বসতিগুলো উজাড় করে দিয়েছে। ফসল ছাড়া আমাদের কাছে কিই বা আছে? ওরা ফসল, গবাদি পশু নিজেদের সাথে করে নিয়ে যায়। সুন্দরী মেয়ে ও শিশুদেরকেও ওরা উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারপর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলোতে বেঁচে দেয়।'....

'আমরা যাবোই বা কোথা? ওদের চামড়ার ডিঙ্গি নৌকাগুলো আমাদের উপকূলে একবার নোঙ্গর করার পর আমাদের লোকেরা সব পালিয়ে যায়। এই মেয়ে দু'জন আমারই মেয়ে। ওদের নিয়েই সবচেয়ে দুশ্চিন্তা ছিলো।......

'ওদেরকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকাই। সাথে ছিলো ছোট একটি বাচ্চা। রাতে এমন ভয়ংকর ঠান্ডা পড়ে যে, বাচ্চাটি তাতেই মারা যায়। আমি তো পাগল হয়ে যাই। আমার স্বামী বলে, চলো আমরা কর্ডোভায় যাই।'

'জানি না ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরতে মরতে পড়তে পড়তে কতদিনে এখানে এসে পৌঁছেছি আমরা। আপনার তলোওয়ার যদি ওই জলদস্যুদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত না হয় তাহলে কমপক্ষে আমাদের মেয়ে দুটোকে আশ্রয় দিন। আমরা শুনেছি, নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় মুসলমানরা প্রাণপর্যন্ত দিয়ে দেয়।'....

'সুলতানা! আমীর আব্দুর রহমানের চেহারায় তখন যে রঙ ধারণ করেছিলো আজো আমার সেটা মনে আছে। তিনি দারোয়ানকে ডেকে বললেন,

'এদের সবাইকে শাহী মেহমানখানায় নিয়ে রাখো। এদেরকে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় দাও। শাহী খাবার খাইয়ে এদেরকে সুস্থ করে তোলো। আর সালারে আলাকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'আমি দেখলাম আব্দুর রহমানের বৃদ্ধ চেহারায় যৌবনের ঝলক ভেসে উঠলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার ওপর এই ফরজ দায়িত্বও আরোপ পরেছেন। এ দায়িত্ব আমি অবশ্যই পালন করবো।' তাঁর উদাস ভাব ও বয়সের ভার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তখন।'

❋❋❋❋❋

রাত বাড়ছে। যারিয়ারের কথা বলায়ও যেন স্পৃহা বেড়ে যাচ্ছে। সে বলে যাচ্ছে,

'সালারে আলা উবাইদুল্লাহ এলে আব্দুর রহমান তাকে বললেন,

'আপনার পাঠানো মজলুম ও মজলুমা নারী পুরুষরা আমার কাছে এসেছিলো। আমাদের কাছে অগ্নিপূজক জার্মান দস্যুদের মতো মজবুত জলযান নেই। কিন্তু আমি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে হলেও ওদেরকে খতম করতে চাই।'

'সালারে আলা বললেন, 'আমাদের কাছে বড় বড় কিছু নৌকা ও ছোট ছোট কিছু জাহাজ আছে। এসব দিয়ে আমরা সামুদ্রিক লড়াইয়ে টিকতে পারবো না।

আপনি হুকুম দিলে বড় জাহাজ বেশ কয়েকটা বানানো যাবে। এ সময়ের মধ্যে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য সেই উপকূল অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হবে। যেখানে জলদস্যুরা এসে লুটপাট চালায়।'

'তৎক্ষণাৎ ফৌজকে কোচ করার হুকুম দেয়া হলো। জলদস্যুদের দুঃসাহস এত বেড়ে গেলো যে, এরা ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে নদীতে এসেও আশে পাশের গ্রামে লুটপাট চালাতে শুরু করে।

কর্ডোভার পাঠানো ফৌজের প্রথম সংঘর্ষ হয় 'ওয়াদিল কাবীর' নামক এক উপত্যকা দিয়ে নদী অতিক্রম করার সময়। জলদস্যুরা লড়াই নদী থেকে উপকূল পর্যন্ত নিয়ে আসে। তারা নৌযান থেকে এমন শিলা বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ করে যে, ফৌজের পিছু হটতে হয়।'.....

খুব দ্রুত নৌযান জাহাজ প্রস্তুত হতে লাগলো। কিছু প্রস্তুতকৃত জাহাজও পাওয়া গেলো। উপকূল এলাকার অনেক জায়গাতেই ফৌজ মোতায়েন করা হলো। লুটেরাদের সাথে বেশ কয়েক জায়গায় তাদের লড়াই হয়। এতে উপকূল অঞ্চলে লুট কমে গেলো। এরা সমুদ্রে চলে গেলো। অন্যান্য দেশের জাহাজের ওপর এবার হামলা চালাতে শুরু করলো।'.......

'আমীর আব্দুর রহমান ওদেরকে চির দিনের জন্য খতম করে দেয়ার অঙ্গিকার করলেন। তিনি ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করালেন। বড় জাহাজ পনেরটি। এর সঙ্গে ছোট জাহাজ ও বড় পাল তোলা নৌকাও আছে অনেক গুলো। নৌপথে লড়াইয়ের জন্য ফৌজ তৈরি করা হলো।

বেশ কয়েক মাস তাদেরকে সমুদ্রে রেখে সামুদ্রিক আবহাওয়ায় অভ্যস্ত করানো হলো। তারপর উপকূলের পাশ ঘেষে বড় বড় বুরুজ নির্মাণ করানো হলো। ওখানে সব সময় প্রহরা নিয়োজিত থাকতো।'......

'ওরা দূর থেকে জাহাজ বা নৌযানগুলোকে দেখতে পেতো। কোন জাহাজ উপকূলের দিকে আসতে থাকলে এবং সন্দেহজনক হলে বুরুজের ঘোড়সাওয়ার পয়গাম বাহক নৌবাহিনীকে সংবাদ দিয়ে আসতো।'....

'নারমান জলদস্যুরা একবার তাদের সব যুদ্ধ নৌযানগুলোকে সমুদ্রে একত্রিত করে তাদের যুদ্ধশক্তির প্রদর্শন করলো। আমীর আব্দুর রহমান এ সংবাদ পেয়েই তিনি উপকূলে পৌছে যুদ্ধ জাহাজাগুলোর নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তারপর খোলা সাগরে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি তার বাহিনীকে এর আগে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।'...

'জলদস্যুদের কখনো কারো সঙ্গে বড় ধরণের লড়াই হয়নি। এখন লড়াই এক নিয়মিত ফৌজের সঙ্গে। লড়াইয়ের কয়েক মিনিটের মধ্যেই জার্মান জলদস্যু বাহিনীর টনক নড়লো যে, তারা আজ নিশ্চিত মরণ ফাঁদে পড়েছে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাদেতর নৌযানগুলো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে সমুদ্রে মিশে গেলো। কয়েকটি জাহাজ মাত্র ওরা অক্ষত রাখতে পারলা। এরপর অগ্নিপূজক জলদস্যুদের কেবল নামই রয়ে গেলো। উন্দলুসের উপত্যাকা এবং দূর দূরান্ত পর্যন্ত সাগর নিরাপদ হয়ে গেলো।'

সুলতানা যারিয়াবের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌছে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হলো। সে ভেবেছিলো, যারিয়াব এসে তার পাকা চুল দেখে বলবে, সে এখনো পচিশ বছরের যুবতীর মতো রূপসী এবং সতেজ। কিন্তু যারিয়াব তাকে বাস্তবতার নিরেট আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

নিজের আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত না হলে যে কোথাও সে দু'দন্ড শস্তি পাবে না এটা তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

সুলতানা আরো ভেবেছিলো, তার ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য সিংহাসনের পথ পরিস্কার করতে যারিয়াবের প্রভাবকে কাজে লাগাবে। যারিয়াব তার সেই আশায় সোজা পানি ঢেলে দিয়েছে। তাই যারিয়াব চলে যেতেই সুলতানা ঘৃণাভরে বলে উঠলো,

'শালা বুড়ো অকর্মা!' এখন যখন কোন নারীর যোগ্য তো দূরের কথা নিজের জন্যও যখন অযোগ্য হয়ে পড়েছে তখন বেটা ওয়ালিআল্লাহ বনে গেছে। এখন আমীরে উন্দলুসের মুরিদ হয়ে গেছে। এই বুড়োর চেয়ে আমার ক্ষমতা এখন অনেক বেশি।

পুরো প্রশাসনে ঝড় বয়ে দিতে পারে এমন লোকও আমার হাতে আছে। আমি এক দিক থেকে শুরু করবো, প্রথম আব্দুর রহমানই। তারপর মুদ্দাসসিরা। তারপর...

তার রগ-রেশায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। তার ভেতরের সব শয়তানী শক্তি জেগে উঠলো।

আমীর আব্দুর রহমানের এক মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস 'নসর'। এর উল্লেখ দেখা যায় ইতিহাসে। সে খুব তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলো। আব্দুর রহমান তাকে শুদু গোলামি থেকে মুক্তই করেননি দরবারেও তাকে এক উচুঁ পদ দান করেন। নসরের এক দিক ছিলো শয়তানিতে পূর্ণ। সুলতানা এটা বুঝতে পেরে শুরু থেকেই নসরকে তার গোলাম বানিয়ে নেয়।

সুলতানা আব্দুর রহমানের কাছে সব সময় তার অনেক প্রশংসা করতো। সুলতানা তাকে অনেক ধন-সম্পদও দান করে। নসর এখন যারিয়াবের মতো প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গেছে। এখনো সে সুলতানার অনুগত।

পর দিন সূর্য মাথার ওপর উঠে আসার পর সুলতানার চোখ খুললো। ঘুম ভাঙ্গতেই সে খাদেমাকে ডেকে বললো,

'নসরকে ডেকে নিয়ে আসো। আসার সময় যেন কারো নজরে না পড়ে।'

নসর আসতেই তাকে পালংকের ওপর বসালো। নিজে তার সঙ্গে লেগে বসলো। কিছুক্ষণ অতীতের কথাবার্তা বলে তরল ধরণের রসিকতা শুরু করলো।

বুড়ো নসর যখন গরম হয়ে উঠলো তখন তার কানের সাথে নিজের মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বললো। নসরের দু'চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো।

'এই পাপও আমার হাতে করাবেন?' নসর হয়রান হয়ে বললো।

'হ্যাঁ, নসর! এই পাপও তোমার হাতে করাবো।' সুলতানা নাগিনীর মূর্তি ধারণ করে বললো, 'সেই সুন্দর সুন্দর পাপগুলোর কথা স্মরণ করো যা আমার বখশিশের লোভে তুমি করে এসেছো। এর মধ্যে কিছু পাপ তো এমন আছে যা আজো তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে পারে।'.......

তুমি কি জানো না, জল্লাদের তলোয়ার আমার ইশারায় চলবে? আমার এ কাজটি করে দাও। তাহলে আমার ছেলে হবে আমীরে উন্দলুস। আর তোমার ছেলে হবে ফৌজের প্রভাবশালী সালার।'

নসর যেন শিকলে বাঁধা পড়লো। সে জানে, সুলতানা নাগিনী। যাকে ছোবল দেবে সে শেষ হয়ে যাবে। তার সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্পনার চেয়ে উজ্জল। সে হেসে বললো,

'আমি না করলে এ কাজ আর কে করবে?'

অনেক্ষণপর নসর সুলতানার ঘর থেকে বের হয়ে শাহী ডাক্তার হুররানীর কাছে গেলো। হুররানী এখন অশীতপর বৃদ্ধ। নসরের কথা শুনে হুররানীর আপদমস্তক কেঁপে উঠলো।

'আপনার জন্য দুটি পথ খোলা রয়েছে।' নসর হুররানীকে বললো, 'একটা হলো, এই বয়সে কয়েদখানার সেসব ভয়ংকর নির্যাতন ভোগ করা যা সদ্য যুবক কোন লোকও সহ্য করতে পারবে না।'.........

'আপনি জানেন, আমার মুখ থেকে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগই বের হতে তা কোন প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। তখন আপনার বাকি জীবনটা কয়েদখানায় কাটাতে হবে। আরেকটা পথ হলো, এই দুনিয়াতেই

আপনি বেহেশত দেখতে পাবেন। হীরা জহরতের স্তুপ থাকবে আপনার সামনে , আপনি ভেবে দেখুন।'

হুররানী ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। নিজের পরিণাম সম্পর্কে এমনভাবে ঘাবড়ে গেলেন যে, কাঁপা হাতে বিষের একটা ট্যাবলেট নসরের হাতে তুলে দিলেন। ইতিহাসে এর নাম লেখা হয়েছে, 'লিবয়ানুল মানুক।'

এ বিষ মুহূর্তের মধ্যেই প্রাণ নাশ করে দেয়। নসর তাকে এটা বলেনি যে, বিষ কার ইঙ্গিতে নিয়ে যাচ্ছে।

আব্দুর রহমানের স্ত্রী মুদ্দাসসিরার বয়স সুলতানার চেয়ে কম। তবুও প্রৌঢ়ত্বের প্রচ্ছন্ন ছায়া তার মধ্যেও পড়তে শুরু করেছে।

একদিন সন্ধ্যায়, ডাক্তার হুররানীর পক্ষ থেকে এক মহিলার মাধ্যমে মৌখিক পয়গাম পেলো মুদ্দাসসিরা যে, যে কোন অসুস্থতার অজুহাত ধরে আমাকে ডেকে পাঠান। একটু পর মুদ্দাসসিরা খাদেমাকে ডেকে বললো,

'আমার পুরো শরীরে ব্যথা ছাড়িয়ে পড়েছে। এখনই শাহী হাকিমকে ডেকে আনো।'

খাদেমা ছুটে গেলো এবং হুররানী এসে গেলো।

'মালিকায়ে আলিয়া!' হুররানী মুদ্দাসসিরাকে বললো, 'আজ আমার সে দিনের কথা মনে পড়ছে যেদিন সুলতানা আমার কাছ থেকে বিষ নিয়েছিলো আপনাকে হত্যা করার জন্য এবং আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, সুলতানার পক্ষ থেকে কোন খাদেমা আপনাকে কোন দুধ বা শরবত দিলে সেটা আপনি পান করবেন না। কারণ, তাতে থাকবে বিষ।'

'হ্যাঁ, মুহতারাম!' মুদ্দাসরিা বললো, 'কত বছর আগের কথা। অথচ মনে হচ্ছে গত কালের ঘটনা। আমারও মনে আছে, মানসিকভাবে আপনি এতই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছিলেন। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি যাবেন না। হতে পারে, একদিন আমীরে উন্দলুসকে দেয়ার জন্যও আপনার কাছ থেকে বিষের পুরিয়া নিতে পারে কেউ।

'তখন আপনি তাকে সতর্ক করে দেবেন। জানি না তখন কেন এ কথা বলেছিলাম... সেই ঘটনা এখন কেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন? আপনি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছেন?'

'আপনি যেহেতু পুণ্যবতী এক নারী তাই আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার অজান্তে অনাগতগ কোন কোন ঘটনার ইঙ্গিত আগেই দিয়ে দেন।' হুররানী বললেন, 'আজ আমীরে উন্দলুসের সেই গোলাম যাকে তিনি দরবারে উচ্চ পদে

সমাসীন করেছিলেন, সেই নসর আমার কাছ থেকে বিষ নিয়ে গেছে। সে এটা আমীরে উন্দলুসের ওপর প্রয়োগ করবে।'

হুররানী মুদ্দাসসিরাকে বিস্তারিত জানালো। নসর তাকে কিভাবে হুমকি দিয়েছে এবং কি কি লোভ লালসা দেখিয়েছে।'

'আপনি কি আমার অপারগতা বুঝতে পারছেন?'

'কেন বুঝবো না! কিন্তু নসর কি এটা বলেনি কার ইঙ্গিতে সে এত বড় অপরাধ করতে যাচ্ছে'? মুদ্দাসসিরা জিজ্ঞেস করলো।

'না, আমি বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেসও করেছি। কিন্তু সে বলেনি। আপনি আমীরে উন্দলুসকে সতর্ক করে দিন। নসর বা কোন খাদেমার হাতে তিনি কোন কিছু যেন না খান। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি যথাসম্ভব আমার দায়িত্ব পালন করেছি।'

'ঠিক আছে আপনিও বিষয়টা গোপন রাখবেন।'

'অবশ্যই। অবশ্যই।'

অবিরাম-বিশ্রামহীন যুদ্ধের ময়দানে কাটানোর কারণে এবং সর্বশেষ নৌপথের যুদ্ধে দীর্ঘসময় অসম্ভব খাটুঁনির কারণে আমীর আব্দুর রহমানের শরীর অনেক খানিই ভেঙ্গে পড়েছে। তার ওপর বার্ধক্যের চাপ তো আছেই। তাই নিয়মিতই তাঁর কোন না কোন ঔষধ সেবন করতে হয়।

একদিন তাঁর অতি বিশ্বস্ত পরামর্শক নসর তাঁর কাছে এলো। তার হাতের একটা কৌটা দেখিয়ে বললো, এতে এমন এক আশ্চর্য জীবন সঞ্জীবনী আছে যে, তা সেবন করলে যৌবনের শক্তি শরীরে ফিরে আসে। দূর দেশের এক হাকিম থেকে আমি এটা আনিয়েছি।

'তুমিও তো অনেক বুড়ো হয়ে গেলো নসর!' আব্দুর রহমান কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'বার্ধক্যকে যৌবনের রূপান্তর করে দেয়ার মতো সঞ্জিবনী তোমার বরং অধিক প্রয়োজন। আমি তো অনেক ঔষধই খাচ্ছি। এটা তুমি খেয়ে নাও।'

'না, না, এটা তো আমি আপনার জন্য নিয়ে এসছি।' নসর জোর হেসে বললো।

'নসর।' আব্দুর রহমান বাদশাহী গাম্ভীর্যভরা গলায় গর্জে উঠলেন।

'আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এ ঔষধটুকু এখনই তুমি তোমার মুখে পুরে নাও।'

ঘামে নসর প্রায় গোসল করে ফেললো। এ হুকুম পালন না করা ছাড়া তার উপায় নেই। সে বিষের পুরিয়াটি মুখে পুরে নিলো। আব্দুর রহমান তখনই তাকে চলে যেতে বললেন।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, নসর দৌড়ে বাইরে বের হয়ে হুররানীর কাছে ছুটে গেলো। তাকে বললো, যে বিষ সে আমীরে উন্দলুসকে খাওয়াতে গিয়েছিলো সেটা তাকে খাইয়ে দেয়া হয়েছে। খোদার দিকে চেয়ে কিছু একটা করুন।

'তাড়াতাড়ি গিয়ে বকরির দুধ পান করে নাও।' হুররানী তাড়া দিলেন।

নসর দৌড়াতে শুরু করলো। কিন্তু বিষ তার যা কাজ করার সেটা করে ফেলেছে। পথেই সে আধোমুখো হয়ে পড়ে গেলো।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, আমীর আব্দুর রহমান মরণ বিষ থেকে তো বেঁচে গেলেন এবং বিষ প্রয়োগকারীও সে বিষ খেয়ে শেষ হয়ে গেলো।

কিন্তু যে গোলামকে তিনি স্নেহ করে এত বড় পদ দিয়েছেন যাকে এত বিশ্বাস করেছেন সে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিলো, এই চিন্তা তাঁকে এমনভাবে আহত করলো যে, সাত আট দিন পর পুরো উন্দলুসবাসীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ো চলে গেলেন।

সেটা ছিলো ২২ সেপ্টেম্বর ৮৫২ খ্রি.।

বহুদিনপর এ তথ্য ফাঁস হয় যে, সুলতানা মালিকায়ে তরুবের কথায় নসর আমীর আব্দুর রহমানকে বিষ পান করাতে চেয়েছিলো।

আমীর আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আর উন্দলুসের কালনাগিনী সুলতানা ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইতিহাসের অন্ধকার পাতায় হারিয়ে যায়।

'আর নান্দনিকতায় অমর ইতিহাস হয়ে থাকে দেহ-মন সর্ব দিক দিয়ে রূপসী মুদ্দাসসিরা।"

সমাপ্ত

১৩-৫-২০১০

রাত ২টা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

কাল নাগিনী

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

design : najmul haider shaj creation
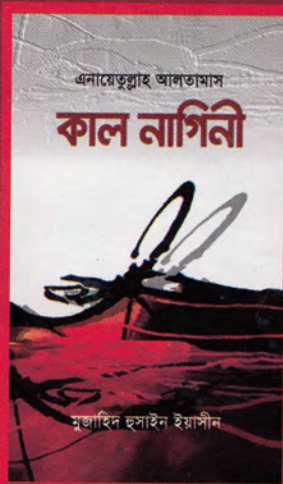
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

ISBN-984-839-084-03